দময়ন্তীর মুখ

দময়ন্তীর মুখ

জিজ্ঞাসা

কলকাতা ৯ ॥ কলকাতা ২৯

দময়ন্তীর মুখ

আজকের সকালটি সোনার মতন উজ্জ্বল। কুয়াশা নেই, মেঘ নেই। বরফমাখা পাহাড় শৃঙ্গগুলিতে রোদ ঠিকরে পড়ছে, সেদিকে চোখ রাখা যায় না। বাতাসের তরঙ্গ একমুখী নয়, কেমন যেন এলোমেলো, যেন বাতাস আপন মনে কোনও খেলায় মেতে আছে। একটা কাঠঠোকরা পাখি উড়ে এসে বসলো খুব কাছে। এখানে কাছাকাছি বড় গাছ নেই, তবু পাখিটা কোথা থেকে যেন আসে মাঝে মাঝে। পাখিটা রাজকুমারের মতন রূপবান। মাথায় মুকুটের মতন চূড়া, অঙ্গে চিত্রিত মখমলের মতন পোশাক, গর্বিত পা ফেলে সে আস্তে আস্তে হাঁটে। তার দিকে মুগ্ধভাবে তাকিয়ে রইলেন অর্চিষ্মান। পাখিটাকে যতবার দেখেন, ততবারই তাঁর বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

গুহা থেকে বাইরে এসে এই সুন্দর সকালটি দেখে অর্চিষ্মানের মন প্রসন্ন হয়ে উঠলো। যদিও শরীরটা ভাল নেই, সারা রাত ভাল করে ঘুম হয়নি, মাঝে মাঝে শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। উঠে বসে বুকে হাত বুলিয়েছেন। ওষুধ খাওয়ার প্রশ্ন নেই, গত প্রায় চল্লিশ বছর তিনি ওষুধ কাকে বলে জানেন না। এই পাহাড়ের রাত্রির বিশাল নিস্তব্ধতার মধ্যে তিনি নিজের প্রাণবায়ুকে ফিসফিস করে বলেছেন, শান্ত হও, শান্ত হও। যদি চলে যেতে হয়, শান্ত ভাবে যাও।

আজ সকালেও বুক ভার হয়ে আছে, পা দুটি দুর্বল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার ঊর্ধ্বে উঠে গেল তাঁর মন, দৃশ্য সৌন্দর্যের মহিমা তাঁকে আপ্লুত করে দিল। কাঠঠোকরা পাখিটির চরণ-ছন্দের দিকে চেয়ে রইলেন

এক দৃষ্টিতে। কম্বলটা গায়ে ভাল করে জড়িয় বসলেন গড়ুর সিংহাসনে। সেটি আসলে একটি বড় পাথরের চাঁই। এখানকার প্রত্যেকটি পাথরের তিনি নিজস্ব নাম দিয়েছেন। আর দুটি পাথরের নাম মহাকূর্ম এবং থিরবিজুরি। কোনও রহস্যময় কারণে থিরবিজুরি পাথরটিকে তাঁর মনে হয় নারী, সে জন্য তিনি ওই পাথরটির ওপরে কখনো বসেন না।

এরপর এল দুটি প্রজাপতি। এরকম রৌদ্র ঝলমল সকালেই ওরা আসে। কুয়াশা, বৃষ্টি, তুষারপাত আর হিমেল হাওয়ার দিনে ওরা কোথায় থাকে কে জানে! প্রজাপতি দুটি একটুক্ষণ ওড়াউড়ি করে বসলো ঘাস ফুলে। কী অপূর্ব ওদের ডানার রঙের বিন্যাস। এতগুলি বছরেও প্রজাপতি সম্পর্কে অর্চিষ্মানের বিস্ময়বোধ কাটেনি। কেন ওরা এত সুন্দর, উত্তর পাননি সে প্রশ্নের। ওদের শরীরের বুঝি ওজন নেই, ছোট্ট একটা ফুলের ওপরেও সাবলীল ডানা মেলে বসে, বাতাসের সঙ্গে দোল খায়।

চোখ মুখ ধুতে যেতে হবে নদীতে। বেশি দূর নয়। এই গুহামুখ থেকেই শোনা যায় নদীর কলকল ধ্বনি, সেই শব্দ ঢেকে দেবার মতন আর কোনও শব্দ এখানে নেই। ওইটুকু হেঁটে যেতেই অর্চিষ্মান আজ আলস্য বোধ করছেন। তবু একটু পরে উঠে দাঁড়ালেন, কোমরে একটা ব্যথার মোচড় দিয়ে গেল। আগে কখনো এরকম ব্যথা অনুভব করেননি। বয়েসের থাবা! এবার বুঝি সত্যি বার্ধক্য এলো। অর্চিষ্মান আবার প্রজাপতি দুটির দিকে চোখ ফেরালেন, নিজেকে ভুলে ওদের দিকে মনোযোগ দিলেন, অস্ফুট স্বরে বললেন, সুন্দর, সুন্দর!

নদীর পথটা ঢালু, নামা সহজ, তবু যাতে হোঁচট খেয়ে না পড়ে যান, সেই জন্য অর্চিষ্মান একদিকের পাথর ধরে ধরে এগোতে লাগলেন। প্রতিদিন সকালে নদীটিকে প্রথম দর্শনে তাঁর ভাল লাগে। অর্চিষ্মানের নিজস্ব সম্পত্তি বলতে কিছুই নেই, তবু নদীটিকে দেখলেই তাঁর বলতে ইচ্ছে করে, আমার, আমার।

পাহাড়ের বরফ গলা জল থেকে নেমে এসেছে খুবই ছোট নদী, একটু দূরেই গিয়ে মিশেছে অন্য নদীতে। এ নদীর কোনও নাম ছিল না, অর্চিষ্মান নাম দিয়েছেন খরসা। খরস্রোতা থেকে খরসা। মুখে মুখে নামটা চালু হয়ে গেছে। অর্চিষ্মান যখন থাকবেন না, তখন তাঁর দেওয়া নামটা থেকে যাবে।

যেমন স্রোত, তেমনই ঠাণ্ডা জল। এতগুলো বছর কেটে গেল, তবু এখনো জলে হাত দেবার আগে কিছুক্ষণ বসে থাকতে হয়। ছেলেবেলায় শীতকালে পুকুরে স্নান করতে গেলে যেমন জলে নামতে ইচ্ছে করতো না, একসময় গামছাটা ছুঁড়ে দিয়ে, সেটা ডুবে যাওয়ার শেষ মুহূর্তে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে হতো, এখানেও সেরকম ইচ্ছে হয়। কিন্তু অর্চিষ্মানের গামছা নেই, স্নানের পর গায়েই জল শুকোয়।

জলে অর্চিষ্মান নিজের মুখের ছায়া দেখলেন। মুখের দাড়ি গোঁফের জঙ্গল ভেদ করে সামান্য অংশই দেখা যায়, আজ যেন অনেকদিন পর নিজেকে দেখলেন, কেমন যেন অচেনা লাগলো। চক্ষু দুটির জ্যোতি কমে এসেছে, এটাও অসুস্থতার লক্ষণ। কিছুতেই শরীরকে গুরুত্ব দেবেন না বলে অর্চিষ্মান আকাশের দিকে তাকালেন। এমন ঝকঝকে নীলাকাশ বুঝি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। মেঘশূন্য এমন নীলিমা এখানেও খুব দুর্লভ, কখন যে মেঘ এসে যাবে, চতুর্দিক অন্ধকার করে ঝড় বইবে তার ঠিক নেই। এই তো গত পূর্ণিমায় এমন ঝড় উঠেছিল যে তিনদিন টানা চলেছে, এক মুহূর্তের জন্যও থামেনি।

অর্চিষ্মান সেই নিবিড় নীলের দিকে তাকিয়ে শরীরের কষ্টের কথা ভুলে গেলেন। তাঁর মনে হল, কালস্রোত প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে, তবু আকাশে তার কোনও রেখা পড়ে না। আকাশ চিরতরুণ।

নমস্তে বাংগালিবাবা!

নদীর ওপার দিয়ে একটা ভেড়ার বাচ্চা কোলে করে নিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে একজন মাঝ বয়েসী মানুষ। ভেড়াটা কোনও ভাবে আহত হয়েছে। খুব সম্ভবত শীর্ষিবাবার আশ্রমে নিয়ে যাচ্ছে। শীর্ষিবাবা গায়ে হাত বুলিয়ে দিলে অনেক রুগ্ণ মানুষ, এমনকি পশু-পাখিও সুস্থ হয়ে ওঠে।

অর্চিষ্মান হাত তুলে বললেন, জিতা রহো। লোকটির অবশ্য আর কথা বলার সময় নেই। সে ছুটছে।

এত বছরেও বাংগালিবাবা নামটা ঘুচলো না। তাঁর গুরু যোগত্রয়ানন্দ অর্থাৎ যোগীবাবা অর্চিষ্মানের একটা অন্য নাম দিয়েছিলেন। তাঁর অঙ্গে গেরুয়া জড়িয়ে দিয়ে নাম দিয়েছিলেন বসভেশ্বরস্বামী, কিন্তু সে নাম চলেনি। অর্চিষ্মান হিন্দী ভালই শিখেছেন, এই হিমালয়ে সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে হিন্দী ভাষাই লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা, কিন্তু তাঁর উচ্চারণে বাংলা টান যায়নি। দু'তিনটি বাক্য শুনলেই অন্যরা বুঝে যায়, বাংগালি।

অর্চিষ্মানের পূর্বাশ্রমের নামটাও একেবারে ঘুচে যায়নি। কেউ কেউ যে মনে রেখেছে, সেটাই আশ্চর্যের ব্যাপার। এই তো গতবছরই ডিসেম্বর মাসে দু'জন যুবক খুঁজে খুঁজে পাহাড়ের এতদূরে পৌঁছে গিয়েছিল। তারা একটা লিট্‌ল ম্যাগাজিন চালায়, তারা অর্চিষ্মান গুহঠাকুরতার সাক্ষাৎকার ছাপাতে আগ্রহী। অর্চিষ্মান খুব হেসেছিলেন। লোকালয় থেকে বহুকাল বিচ্যুত, গুহানিবাসী এক সাধুর সাক্ষাৎকার পাঠ করে কার কী লাভ হবে? মানুষকে জানাবার মতন তো তাঁর কিছু নেই। নিজেই এখনো অনুসন্ধানী।

ছেলে দুটি এত কষ্ট করে, প্রচুর উৎসাহ নিয়ে এসেছে বলে মায়া হয়েছিল অর্চিষ্মানের, তিনি ওদের কোনও প্রশ্নেরই উত্তর না দিলেও আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন।

ওরা ওদের পত্রিকার দুটি সংখ্যা প্রায় জোর করেই রেখে গেছে। অর্চিষ্মান পড়ে দেখতে চান না। কত বছর যে ছাপার অক্ষর পড়েননি, তার হিসেব নেই। এখানে সাল-তারিখের খেয়াল রাখারও প্রয়োজন হয় না। ওই পত্রিকার মলাটে লেখা আছে, ইংরেজি পঁচানব্বই সাল। তাতেই অর্চিষ্মানের খেয়াল হল যে, এই পাহাড়ে কেটে গেল ছত্রিশ বছর!

ছেলে দুটি বলেছিল, কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরির ইনডেক্স কার্ডে এখনো অর্চিষ্মান গুহঠাকুরতার নাম আছে। সেখানে তাঁর কবিতার বইটি এখনো পাওয়া যায়। একজন সাহিত্যিক সম্প্রতি আত্মজীবনী লিখেছেন, তাতে আড়াই পৃষ্ঠা জুড়ে আছে অর্চিষ্মান গুহঠাকুরতার কথা, সেই অংশটি পড়েই যুবাদুটি ছুটে এসেছে। এসব শুনেও অর্চিষ্মান শুধু হেসেছিলেন। তাঁর মনে কোনও কৌতূহল জাগেনি।

আপনি কেন সব ছেড়েছুড়ে চলে এলেন এই পাহাড়ে? ওদের বারবার এই প্রশ্নের উত্তরে অর্চিষ্মান বলেছিলেন, নিয়তি!

মানুষের নিয়তি কি মানুষ নিজেই নির্ধারণ করে? অথবা মনের অনেক গভীরে, অতলান্ত প্রদেশে এমন কিছু প্রক্রিয়া চলে, যেখানে মানুষের যুক্তিগ্রাহ্য জীবনের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই।

উনিশশো উনষাট সালে চন্দননগর থেকে এগারোজনের একটি অভিযাত্রী দল এসেছিল সুন্দরডুঙ্গা হিমবাহ অভিযানে। সেই দলের ম্যানেজার ছিল এক তরুণ কবি। পাহাড়ে চড়া কিংবা ট্রেকিং-এর পূর্ব

অভিজ্ঞতা ছিল না, সে অনেকটা জোর করেই দলে ঢুকে পড়েছিল। লোকে বলে, পাহাড় নাকি মানুষকে টানে। অর্চিষ্মানকেও টেনে এনেছিল নগাধিরাজ হিমালয়? ঠিক তা নয়।

বেস ক্যাম্প ছিল উমলায়। রোমান্টিক তরুণ কবিটি কাহিল হয়ে গিয়েছিল শীতে, বা হাঁটুতে খানিকটা চোটও লেগেছিল, উমলা থেকে আর সে এগোতে পারেনি। সুন্দরডুঙ্গা ও পিণ্ডারি অভিযান সার্থক করে দলটি ফিরে এলো, এক রাত সহর্ষে নাচ-গান করে কাটালো, তারপর নিচে নেমে আসার উদ্যোগ করতেই তরুণ কবিটি জানালো, সে ওখানে আরও কিছুদিন থেকে যেতে চায় একা একা। বন্ধুদের অনেক অনুরোধ ও পেড়াপিড়িতেও সে ফিরতে সম্মত হল না।

প্রথমে ভেবেছিল, সেই সৌন্দর্যমণ্ডিত পাহাড় প্রকৃতির মধ্যে অন্তত মাসখানেক থাকবে, কিন্তু কেটে গেল মাসের পর, বছর, যুগ, এই তিনযুগ পেরিয়ে গেছে।

কলকাতা ছেড়ে আসার আগে এরকম কোনও বাসনা বা সিদ্ধান্ত তার মনের কোণেও ছিল না। কোনওরকম আধ্যাত্মিক টানও আগে কখনও অনুভব করেনি অর্চিষ্মান। কবিদের সাহচর্য, শহুরে জীবনের উত্তেজনাই তার পছন্দ ছিল, প্রকৃতির রূপের আকর্ষণ তার চেয়ে বেশি হল কী করে?

কারুর প্রতি অভিমান? নারী?

সে রকম একটা গৌণ কারণ ছিল বটে। খুব গৌণই বলা উচিত।

ছত্রিশ বছর আগে, অভিযাত্রী দলের সঙ্গে জুটে যাবার সময়, দময়ন্তী আর তার স্বামী এসে বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল অর্চিষ্মানদের বাড়ির খুব কাছাকাছি। জানলা খুললে এ বাড়ি ও বাড়ি দেখা যায়। দময়ন্তীদের বাড়ির দোতলায় প্রশস্ত, ঢাকা বারান্দা, সেখানে চায়ের টেবিল পাতা, অর্চিষ্মানের ঘর থেকে স্পষ্ট দেখা যেত, ওরা স্বামী-স্ত্রী সকালে সেখানে চায়ের ট্রে নিয়ে বসেছে। এই দৃশ্য অর্চিষ্মানের অসহ্য বোধ হতো।

সেই জন্যই সে আর ফিরলো না? এটা একেবারে ছেলেমানুষীর পর্যায়ে পড়ে। তখন কৃষ্ণনগর কলেজে চাকরি পেয়েছে অর্চিষ্মান, বাড়ি থেকে রোজ ট্রেনে যাতায়াতের ক্লান্তি কম নয়, সে তো কৃষ্ণনগরেই বাড়ি নিয়ে থেকে যেতে পারতো। কৃষ্ণনগর জায়গাটি বেশ, সাহিত্যের পরিবেশ আছে। দময়ন্তীর কাছ থেকে দূরে সরে যাবার জন্য তাকে হিমালয়ের

গিরিকন্দরে আশ্রয় নিতে হবে কেন ?

নিয়তি, না খেয়াল ? প্রথম দিকে খানিকটা খেয়ালের বশেই কি সে থেকে যেতে চায়নি ? বুকের মধ্যে সেরকম কিছু অভিমানের তীব্র কুয়াশা ছিল না, বরং তার কবিসত্তা এই পরিবেশে স্পন্দিত হয়েছিল। মাসখানেকের বেশি এরকম ভাল লাগার বোধ থাকে না, তারপর ফিরে যাওয়াই ছিল স্বাভাবিক।

এখানকার একজন মানুষ তাকে আকৃষ্ট করেছিল। উমলা থেকে বেশ খানিকটা দূরে ছিল যোগত্রয়ানন্দের আশ্রম। অনেকেই সেখানে যায়, তরুণ কবি অর্চিষ্মানও সেখানে গিয়েছিল কৌতূহলবশে। ধর্ম সম্পর্কে তার মন ছিল মুক্ত, নিজে কোনও ধর্মাচরণ না করলেও অপরের ধর্মাচরণের ব্যাপারে অশ্রদ্ধা ছিল না। যার যা ভাল লাগে। ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা ছিল খুবই অস্পষ্ট, এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও পরিচালক একজন কেউ আছে না নেই, তা স্পষ্টভাবে বলা খুব দুষ্কর। এক এক সময় তার মনে হতো, ঈশ্বর এক অলীক, কল্পনা মাত্র। আবার কখনো মনে হতো, এই বিশ্বের সৌন্দর্য, কল্যাণ প্রবহমানতার জন্য যদি ঈশ্বর দায়ী হন, তাহলে কুশ্রীতা, হানাহানি, অশুভ শক্তির অভ্যুত্থান, এসবের জন্যও কি তিনিই দায়ী ?

যোগত্রয়ানন্দ বা যোগীবাবার আশ্রমের বাইরে বেশ বড় একটা বাগান। নানা বর্ণের, কত বিচিত্র সব ফুল। আশ্রমে প্রবেশ করার আগে অর্চিষ্মান সেই বাগানে বেশ কিছুক্ষণ ঘুরেছিল। ফুলের বাহার দেখতে দেখতে অর্চিষ্মানের হঠাৎ মনে হয়েছিল, প্রতিটি গাছের ফুল আলাদা, এক একটি ফুলের কী অপূর্ব ডিজাইন, কতরকম রঙের তরঙ্গ এবং তা একেবারে নিখুঁত। এত রকম ফুলের সৃষ্টি করলো কে ? প্রকৃতি ? এই সৃষ্টির পেছনে কি কোনও চিন্তাশীল মন কাজ করেনি ? চিন্তা না করলে সব আলাদা আলাদা হবে কী করে ? শুধু তো ফুল নয়, এতরকমের গাছ, মানুষ, পশু, পাখি, কীট-পতঙ্গ। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের মুখ আলাদা। কারখানায় প্রস্তুত সব জিনিস একরকম হয়, প্রকৃতির কারখানার পেছনে কি তা হল ঈশ্বর নামে একজন শিল্পী আছেন ? কিন্তু একা সেই ঈশ্বর বসে বসে এত কোটি কোটি ফুল-গাছ-মানুষ-জন্তু-কীট-পতঙ্গেও ডিজাইন আঁকছেন, এও তো অবাস্তব ব্যাপার !

যোগীবাবা বসেছিলেন উন্মুক্ত স্থানে, একটি বাঘের চামড়ার ওপরে। মোটাসোটা, দীর্ঘকায় মানুষটি, কোনো রকম উগ্রভাব নেই, বরং মুখখানি দেখলেই ভালো লাগে। কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে মৃদুস্বরে কথা বলছেন, নিজেকে জাহির করার ভাব নেই। প্রথম দিন অর্চিষ্মান যোগীবাবার সঙ্গে কোনো কথা না বলে, কিছুক্ষণ বসে থেকে ফিরে এলো।

অর্চিষ্মানের আগে ধারণা ছিল সাধুগিরি এক ধরনের নিরাপদ ব্যবসা। মূলধন লাগে না, কোনো খাটাখাটনি করতে হয় না, কিছু চটকদার কথা বলার ক্ষমতা থাকলেই হলো। তাতেই কিছু চ্যালা জুটে যায়, তারা সেবা করে, খাবার দাবারের ব্যবস্থা হয়ে যায় সচ্ছন্দে। সবাই জানে, উপমা আর যুক্তি এক নয়, কিন্তু সব সাধুই কথায় কথায় উপমা দিয়ে ভক্তদের মাত করে। মানুষের গূঢ় জিজ্ঞাসার উত্তরে সাধুরা একটা গল্প শুনিয়ে দেয়।

যোগীবাবার আশ্রমের পরিবেশটা অর্চিষ্মানের পছন্দ হয়েছিল। হৈ চৈ নেই, দাও দাও ভাব নেই, পেছন দিকে একটি গম্ভীর পাহাড় চূড়া, সামনে সযত্নে রক্ষিত বাগান। যোগীবাবা নিজে বাগানে ঘুরে ঘুরে ফুলের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন।

দিন তিনেক যাবার পর অর্চিষ্মান একদিন যোগীবাবাকে প্রশ্ন করলো, সাধুজী, আপনি যে এখানে আশ্রম করে আছেন, তা কিসের জন্য? আপনি কী পেয়েছেন?

ফুলবাগানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যোগীবাবা আকাশের দিকে আঙুল তুলে বললেন, ঐ পেয়েছি।

অর্চিষ্মান চমকে গেল। এত সহজ উত্তর? অনেক বড় বড় যোগী-সাধকও ঈশ্বরকে পেয়ে যাওয়ার কথা সরাসরি স্বীকার করেন না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অন্য কথা বলেন। এই লোকটা ভণ্ড, মিথ্যেবাদী নাকি?

সে জিজ্ঞেস করলো, আপনার ঈশ্বর দর্শন হয়ে গেছে?

এর উত্তরে যোগীবাবা যদি হ্যাঁ বলতেন, তা হলে অর্চিষ্মান হয়তো আর কখনো ও আশ্রমে আসতো না।

যোগীবাবা সামান্য হেসে বললেন, ঈশ্বর আকাশে থাকেন কি না তা আমি জানি না। না, আমার আজও ঈশ্বর দর্শন হয়নি। আমি আকাশের দিকে দেখলাম, তার মানে আমি আকাশকে পেয়েছি। গাছের দিকে তাকিয়ে গাছকে পাই, মানুষের দিকে তাকিয়ে মানুষকে পাই, সব

কিছুর ওপরে আকাশ।

এমন স্নিগ্ধস্বরে যোগীবাবা কথাগুলি বলেছিলেন, অর্চিস্মান মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, এই মানুষটিও কবি।

যোগীবাবার সঙ্গে ভাব জমে যাবার পর তিনি অর্চিস্মানকে এই আশ্রমে এসে থেকে যাবার জন্য আহ্বান জানালেন। এর আগে অর্চিস্মান ছিল পাহাড়িদের গ্রামের একজনের বাড়িতে। দৈনিক মাত্র দুটি টাকা দিলে তারা রুটি, ডাল, সবজি বানিয়ে দিত। ঘর ভাড়া কিছু লাগতো না। খানিকটা যোগীবাবার ব্যক্তিত্বের টানেই সে চলে এলো আশ্রমে।

এখানে তাকে কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম মানতে হয়নি। যোগীবাবা তাকে কোনো পুজো-আচ্চা বা ধ্যানের অনুজ্ঞা দেননি। বলেছিলেন, যা মন চায় তাই করবি, পাহাড় দেখবি, নদী, গাছপালা দেখবি, খুব গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখবি, সব কিছুর অন্তঃস্তল পর্যন্ত দেখবি, তাতেই হৃদয় পবিত্র হয়ে যাবে।

সেই অল্প বয়সের অস্থিরতায় অর্চিস্মান বেশ কিছুদিন যোগীবাবাকে নানান প্রশ্ন করে জব্দ করতে চেয়েছে। পারেনি।

একদিন সে জিজ্ঞেস করেছিল, যোগীবাবা, আপনি তো বলেন ঈশ্বর মঙ্গলময়। পৃথিবীতে যে অত অমঙ্গল, এত হানাহানি, তা কি ঈশ্বর দেখতে পান না? আপনি কি জানেন, জাপানে অ্যাটম বোমা ফেলে একদিনে লক্ষ লক্ষ লোক মারা হয়েছিল। সেইসব নিরীহমানুষ কি সবাই পাপী ছিল? তারা মরলো কেন? হত্যাকারীরাও কোনো শাস্তি পাননি। এটা ঈশ্বরের কোন্ লীলা?

যোগীবাবা সরল ভাবে বলেছিলেন, আমি এ প্রশ্নের উত্তর জানি না। ঈশ্বরের হয়ে ওকালতি করার দায়িত্বও কেউ আমাকে দেয়নি। আমি ঈশ্বরকে খুঁজি আমার নিজস্ব শান্তির জন্য। জানি না কোনোদিন তাঁর দর্শন পাবো কি না। তবে মাঝে মাঝে যেন আভাস পাই। একদিন শুধু তাঁর জ্যোতির্ময় প্রভাটুকু অন্তত দেখতে পাবো আশা করে আছি।

আর একদিন অর্চিস্মান বলেছিল, মানুষের জীবনে ঈশ্বরকে খুঁজতেই হবে কেন? ঈশ্বর যদি থাকেন তো থাকুন। আমি এমন কিছু কিছু মানুষকে জানি, যাঁদের ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস নেই, ঈশ্বরকে নিয়ে মাথাও ঘামান না। তারা লোক ঠকান না। অযথা মিথ্যে কথা বলেন না, সৎ ভাবেই জীবন কাটিয়ে যাচ্ছেন।

যোগীবাবা বলেছিলেন, ভালো, খুব ভালো। যার যা ভালো লাগে। আমি দেখেছি, অবিশ্বাসে বড় অশান্তি, বিশ্বাসে শান্তি। অবিশ্বাস নিয়েও যদি কেউ শান্তিতে জীবন কাটাতে পারে তা কাটাক না। তারাও শ্রদ্ধেয়।

একটু থেমে তিনি আবার বলেছিলেন, অবিশ্বাস থেকেও কেউ কেউ বিশ্বাসে পৌঁছে যায়। মাঝখানে সুদীর্ঘ কষ্টকর পথ। পৌঁছোবার পর সব ক্লান্তি দূর হয়ে যায়, তারপর বড় শান্তি রে, বড় শান্তি। অপার, সুগভীর শান্তি। না পৌঁছোলে বোঝা যায় না। আমার মনে হয়, তুই পারবি, তুই পৌঁছে যাবি।

অর্চিষ্মানের সেদিন খানিকটা কৌতুকের সঙ্গেই মনে হয়েছিল, তাই নাকি? আচ্ছা দেখাই যাক!

মাস দেড়েক কেটে যাবার পর ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কলকাতা থেকে ছুটে এসেছিলেন বাবা। অল্প বয়েসে মাকে হারিয়েছে অর্চিষ্মান। বাবা, দুই দাদা, এক দিদি ও পিসিমাকে নিয়ে সংসার। বাবার শত অনুরোধ, আদেশ, কান্নাকাটিতেও বিচলিত হয়নি অর্চিষ্মান, সে ফিরে যেতে চায়নি। বাবাকে বলেছিল, আমার ইচ্ছে হলে ঠিক ফিরে যাবো, আমি দেখতে চাই আর কতদিন এখানে ভালো লাগে। আমি চিঠি লিখবো মাঝে মাঝে।

এর পরেও বড়দাদা এসেছিল একবার, দু'তিনজন বন্ধুও এসেছিল দেখা করতে। অর্চিষ্মান তখন মোহমুগ্ধ হয়ে আছে, তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব ছিল না।

যোগীবাবা তাকে বলেছিলেন, ঈশ্বরের জন্য হন্যে হয়ে চোখ বুজে তপস্যা করে কোনো লাভ নেই। চোখ খুলেই তাঁকে পাওয়া যায়। এই পৃথিবীর সব সৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে ঈশ্বরের দিব্যজ্যোতির স্পর্শ। সেই জন্য, গাছপালা, ফুল, পাখি, নদী, পাহাড় এই সবকেই আগে চিনতে হয়। একদিন না একদিন এদের মধ্যেই দেখা যাবে সেই জ্যোতি।

সেই জন্য অর্চিষ্মান প্রকৃতিকে ভালোভাবে চেনবার চেষ্টা করছিল। কোনো কোনো ফুলগাছের সামনে তো সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত বসে থেকেছে। দেখেছে কুঁড়ি থেকে ফুল ফোটা। দেখেছে, মৌমাছি, প্রজাপতিদের খেলা। দেখেছে জীবনের স্রোত।

ফুলগুলি কেন এত সুন্দরভাবে সেজে পাপড়ি মেলে ধরে তা বোঝা যায়। ভ্রমর বা মৌমাছিদের অমন সাজগোজ করার দরকার নেই। কিন্তু

প্রজাপতিরা কেন এত সেজে আসে ? ওদের ডানায় কেন এত রঙের কারুকাজ ! প্রকৃতির যে এত রূপ, তার সব কিছুর মধ্যেই কোনো না কোনো প্রয়োজনের কথাও লেখা আছে। এত স্বল্পজীবী প্রজাপতির ডানার শিল্পকীর্তির মধ্যে কোন্ প্রয়োজন ? পাখিরা ওদের ধরে ধরে খেয়ে ফেলে।

ফুলগাছের কাছে কিংবা নদীর ধারে বসে থাকাই ছিল অর্চিষ্মানের ধ্যান। সেই ধ্যানে প্রায়ই বিঘ্ন ঘটাত দময়ন্তীর মুখ।

খানিকটা অভিমান থাকলেও দময়ন্তীর জন্য তার বুকে তেমন গভীর কোনো বেদনাবোধ ছিল না। দময়ন্তীর কাছ থেকে নিজেকে বিযুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল দময়ন্তীর বিয়ের অনেক আগে।

শান্তিনিকেতনের পৌষমেলায় নাগরদোলায় চাপতে গিয়ে আলাপ। অর্চিষ্মানের সঙ্গে ছিল কয়েকজন বন্ধু, দময়ন্তীর সঙ্গেও ছিল কয়েকজন বান্ধবী। চোখাচোখির টান। একসঙ্গে দাঁড়িয়ে ফুচকা খাওয়া, ঠিকানা বিনিময়। দময়ন্তী থাকে আসানসোলে, অর্চিষ্মান থাক দমদম ক্যান্টনমেন্টের কাছে। ঠিকানা নিলেও অর্চিষ্মান প্রথমে চিঠি লেখেনি, দময়ন্তী অর্চিষ্মানের একটি কবিতা পড়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসার চিঠি পাঠিয়েছিল। তারপর শুরু হয়েছিল চিঠির বন্যা। প্রথম প্রথম সপ্তাহে একটা দুটো, তারপর প্রতিদিন, এমন কি একদিনে দুটি চিঠিও লিখেছে অর্চিষ্মান।

নতুন দাঁত ওঠা শিশু যেমন সব কিছু কামড়াতে চায়, একজন তরুণ কবিরও সে রকম সব সময় আঙুল নিশপিশ করে। ভাষার মাধ্যমে জীবন যাপন। ভাষার মাধ্যমে মুক্তি। ভাষা নিয়ে আত্মরতি। অর্চিষ্মান তখন শুধু কবিতাই লেখে না, পুস্তক সমালোচনা, ছোটখাটো প্রবন্ধ, রম্যরচনাও লিখেছে বেশ কিছু। 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষ তাকে পছন্দ করেন, তার একটি কাল্পনিক ভ্রমণ কাহিনী পড়ে সাগরময় ঘোষ একদিন বলেছিলেন, তোমার গদ্যের হাতও বেশ ভালো, তুমি একটা উপন্যাস লেখার চেষ্টা করবে নাকি, অর্চি ? সে লাজুকভাবে মাথা নিচু করে বলেছিল, ওরে বাবা, উপন্যাস কি লিখতে পারবো, সাগরদা ! সে যে খুব শক্ত ! মুখে এই কথা বললেও 'দেশ' সম্পাদকের এই প্রস্তাবে খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল অর্চিষ্মান।

টানা তিন বছর ধরে চলেছিল চিঠি লেখালেখির পালা। এর মধ্যে

ময়ন্তীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল মাত্র একবার। মামাতো ভাইয়ের বিয়েতে াসানসোল থেকে দময়ন্তী এসেছিল কলকাতায়, চিঠিতে আগেই ঠিক রা ছিল, বিয়ে বাড়ি থেকে কিছুক্ষণের জন্য পালিয়ে এসে দময়ন্তী াড়িয়েছিল ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের পুকুরের ধারে। দু'জনে াশাপাশি হেঁটেছে, চিঠিপত্রে পরস্পরের খুব কাছাকাছি চলে এলেও থাবার্তায় সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারেনি। কেউ কারুর অঙ্গ স্পর্শ রেনি। না, তা ঠিক নয়। একবার শুধু দময়ন্তীর চাঁপা ফুলের মতন কটি আঙুল ছুঁয়ে দিয়েছিল অর্চিষ্মান। সেইটুকুই যথেষ্ট।

এতদিনে অর্ধেক ছাপার খরচ দিয়ে একটা ছোট প্রকাশনী থেকে চিষ্মান গুহঠাকুরতার প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সেই বই পেয়ে ময়ন্তী লিখেছিল, তুমি প্রত্যেকটি কবিতা ছাপার আগে কপি করে ামার কাছে পাঠাবে। আমি প্রথম পড়তে চাই। তুমি আমার কবি। ামি জানি, আমার কবি একদিন নোবেল প্রাইজ পাবে।

তিন বছর পর দময়ন্তী এম-এ পড়তে এলো কলকাতায়। টালিগঞ্জে ার মামার বাড়িতে উঠলো। দমদম থেকে টালিগঞ্জ, দূরত্ব অনেকখানি। ময়ন্তীর মামার বাড়িটি মস্ত বড়, অনেক লোকজন, ছেলেমেয়েদের লামেশার কোনো বাধা নেই। সে বাড়িতে বেশ কয়েকবার গেছে চিষ্মান, একতলাতে দু'খানা বৈঠকখানা, দুপুরের দিকে গেলে িরিবিলিতে কথা বলা যায় অনায়াসে।

এক মেঘলা দুপুরে ওরা ছোট বসবার ঘরটায় বসেছিল অনেকক্ষণ। ক পাশে পুরনো আমলের একটি সোফা পাতা, আর একদিকে একটি াল শ্বেতপাথরের টেবিল ঘিরে কয়েকটি চেয়ার। দময়ন্তী বসে আছে াফায়, ধূপের ধোঁয়া রঙের শাড়ি পরা, মাথার সব চুল খোলা। প্যান্ট ার্ট পরা অর্চিষ্মান বসে আছে একটু দূরের চেয়ারে, হাতে সিগারেট। ক মাথা চুল, গালে দু-তিন দিনের দাড়ি, পাশের খোলা জানলা দিয়ে খা যাচ্ছে একটা করবী গাছের ঝোপ। আকাশে মাঝে মাঝে গুরুগুরু ব্দ হচ্ছে। জানিয়ে দিচ্ছে ভারি বর্ষণের সম্ভাবনা। কথাবার্তা থামিয়ে রা চেয়ে আছে পরস্পরের দিকে। এক এক সময় নীরবতাই বাঙ্ময়। াখে চোখে প্রবাহিত হচ্ছে ওদের হৃদয়। এতদিন পরে এই প্রথম ওদের রীর জেগে উঠেছে, চুম্বকের মতন পরস্পরকে টানছে, দু' জনেরই ঠোঁটে ারুণ তৃষ্ণা, যে-কোনো মুহূর্তে অর্চিষ্মান উঠে যেতে পারে দময়ন্তীর কাছে।

সেই মুহূর্তটা এলো না। কাঠের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। ওপর থেকে নেমে এলো দময়ন্তীর মামাতো দাদা তপন, সঙ্গে তার এক বন্ধু। বন্ধুটির নাম অভিজিৎ, সে এয়ারফোর্সের অফিসার। লম্বা, ফর্সা অত্যন্ত সুদর্শন যুবা, পোশাকের ভাঁজ নিখুঁত, মাথার চুল কপালে এসে পড়ে না।

তারপর থেকে অভিজিৎকে প্রায়ই দেখা যায় ও-বাড়িতে। একসঙ্গে গল্প, হাসিঠাট্টা হয়। বাংলা কবিতার ধার ধারে না অভিজিৎ কিন্তু সে অশিক্ষিত নয়, বিদেশী বই পড়েছে অনেক। মোটামুটি জার্মান ভাষা জানে।

আইশ স্কেটিং রিংকে একটি বিলিতি দলের নাচের অনুষ্ঠান চলছে। অভিজিৎ একদিন প্রস্তাব দিল, সবাই মিলে সেটা দেখতে যাওয়া হোক। তার চেনাশুনো আছে, ভেতর থেকে সে টিকিট জোগাড় করতে পারবে। দময়ন্তীর খুব উৎসাহ, সে বললো, হ্যাঁ চলো, চলো। তপন যেতে পারবে না, বৈষয়িক ব্যাপারে তাকে যেতেই হবে উকিলের বাড়িতে। দময়ন্তীর চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে অর্চিষ্মান বললো, আমিও যেতে পারবো না, সন্ধেবেলা আমার বিশেষ কাজ আছে। দময়ন্তী তবু আবদারের সুরে বললো, চলো, চলো, দেখো, গেলেই তোমার ভালো লাগবে। অর্চিষ্মান তবু রাজি হলো না। এর পরেও কি দময়ন্তী একলা যাবে অভিজিতের সঙ্গে? হ্যাঁ, ওরা দু'জনেই গেল।

সেই দিন থেকেই সম্পর্কের শেষ। এর আগেও অভিজিৎ একবার দময়ন্তীকে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে চীনে খাবার খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিল। সেদিন অবশ্য তপন ছিল সঙ্গে। ওসব জায়গায় যাবার সাধ্য ছিল না অর্চিষ্মানের।

একদিন অন্য একজন পুরুষের সঙ্গে নাচ-গান দেখতে গেলে কী এমন আসে যায়? ব্যাপারটা তা নয়। অর্চিষ্মান বুঝে গেল, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। এই যুদ্ধে সে অংশ নেবে না। অভিজিৎ একজন অস্ত্রধারী যোদ্ধা, আর অর্চিষ্মান কবি। এদের মধ্যে কি লড়াই হতে পারে? কবিরা কখনো প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যায় না। কাপুরুষতা নয়, অরুচি, উপেক্ষা। লোকে মনে করবে পরাজয়। তা করুক। এই স্বেচ্ছা-পরাজয় কবির অহংকারকে উস্কে দেয়, তার সৃষ্টি ক্ষমতা বেড়ে যায় অনেকখানি।

অর্চিষ্মান আর কোনোদিন দমদম থেকে টালিগঞ্জে যায়নি।

পনেরো দিন পর দময়ন্তী চিঠি লিখেছিল। উত্তর না পেয়ে আর

কটি। অর্চিষ্মান কী উত্তর দেবে? সেদিন দময়ন্তীর চোখের দিকে কিয়ে অর্চিষ্মান যে তাকে যেতে নিষেধ করেছিল, তা কি সে বোঝেনি? াখের ভাষাই যদি বুঝতে ভুল করে, তাহলে আর চিঠি লিখে কী ব?

ছ' মাসের মধ্যে অভিজিতের সঙ্গে দময়ন্তীর বিয়ে হয়ে গেল করিতে প্রতিষ্ঠিত হবার পর অভিজিৎ বিয়ে করবে ঠিক করে উপযুক্ত ত্রীর সন্ধানে ঘুরছিল। তারপর সে যখন দময়ন্তীকে নির্বাচন করল, থন এ বিয়ে হবেই। জয়ী হবার জন্যই সে এসেছে।

অর্চিষ্মান তাতে আঘাত পায়নি, এটা সত্যি কথা। নিজের হাতে ড়া একটা মূর্তি হঠাৎ ভেঙে ফেললে সেই শিল্পী যেমন নিজেকেই দোষ য়, তার মনোভাব হয়েছিল সে রকম।

কিন্তু অভিজিৎ দমদম ক্যান্টনমেন্টের কাছেই বাড়ি নিতে গেল কন? সে হয়তো অর্চিষ্মানের বাড়ি কোথায় তা জানত না, কিন্তু ময়ন্তীর তো জানা ছিল। আসতে যেতে প্রায়ই দেখা হয়ে যাবে। পাড়া-তিবেশী হিসেবে ভাব হবে, দু' বাড়িতে আসা-যাওয়া, অর্চিষ্মানের সিকে দময়ন্তী পিসি বলে ডাকবে, অভিজিৎ চায়ের নেমন্তন্ন করবে, াখের সামনে গর্ভবতী হবে দময়ন্তী, এই চিন্তাই অসহ্য বোধ হয়েছিল র্চিষ্মানের।

কিন্তু সে জন্যই সে হিমালয়ে পালিয়ে আসেনি। হয়তো তার মনের ভীরে প্রকৃতির প্রতি জোরালো টান ছিল। পাহাড়ের গম্ভীর নীরবতা খে সে সত্যিই মুগ্ধ হয়েছিল। মানুষের জীবনে ভাল লাগাটাই তো াসল। কেউ প্রভুত্ব ভালবাসে, কেউ পছন্দ করে একাকিত্ব।

যোগীবাবার সান্নিধ্যে তার মনের ব্যাপ্তি বেড়ে গিয়েছিল অনেকখানি। কটা গাছকেও তীব্র ভাবে ভালবাসা যায়। একগুচ্ছ ফুল, একটা চ্ছতোয়া নদীও হতে পারে ভালবাসার সামগ্রী। মাঝে মাঝে সে একটা তীন্দ্রিয় অনুভূতিও বোধ করে। এই দৃশ্যমান সব কিছুর আড়ালে যেন য়েছে একটা শক্তি। বিকেলের আকাশের রং ফেরা দেখে মনে হয়, টাই কি ঈশ্বরের করুণার প্রকাশ!

দময়ন্তীকে একেবারে মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। তা সম্ভব । এক-এক সময় বিশাল পাহাড়কেও আড়াল করে দময়ন্তীর মুখ সে ওঠে। তারপরই সেই মুখখানি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

সে আগে কোনও মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশেনি, পরেও না একদিন শুধু চুম্বনের জন্য উদ্যত হয়েছিল, তাও শেষ পর্যন্ত হল না নারী তার কাছে অনাঘ্রাতাই রয়ে গেল। কোনও আফসোস নেই। নারী চেয়ে প্রকৃতিও কম কিছু দেয় না। আর যদি ঈশ্বরের জ্যোতির সন্ধা পাওয়া যায়, তা হলে আর কোনও দিকেই মন যায় না।

অর্চিষ্মান একদিন খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিল। সেই মেঘলা দুপু পরস্পর গাঢ় চোখাচোখির দৃশ্যটা মনে পড়তেই তার পুরুষ লিঙ্গের উত্থা হল। উত্তপ্ত হয়ে উঠল শরীর। কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল।

এ কী হল তার ? সে তো দময়ন্তীকে আর কামনা করে না, ত কেন শরীরের এই চাঞ্চল্য ? শরীর কি মনের অধীন নয় ? নিজে খুব অপরাধী মনে হল। অনেকক্ষণ ঠায় বসে থেকে সে এক সম উঠে গেল যোগীবাবার কাছে।

যোগীবাবার সঙ্গে তার অনেক বিষয়েই খোলাখুলির কথা হয়। বি দ্বিধায় তাঁকে সব ঘটনাটা জানিয়ে দিল। যোগীবাবা কিছুক্ষণ চুপ ক বসে রইলেন। যেন ধ্যানস্থ হলেন চোখ বুজে। তারপর এক সময় তি অর্চিষ্মানের হাত ধরে বললেন, তুই আমারটা ধরে দেখ!

অর্চিষ্মান সবিস্ময়ে দেখল, যোগীবাবার পুরুষাঙ্গ লোহার মতন শক্ত

তিনি বললেন, বেটা, আমি কখনও যোষিৎ সঙ্গ করিনি। তো মতন কোনও প্রেমিকাকে পিছনে ফেলে আসিনি। ছোটবেলা থেকে আমার মিলনেচ্ছা ঈশ্বরের সঙ্গে। তীব্র মিলনেচ্ছাতে এ রকম হয়। এট শরীরের নিয়ম। দেখবি, এমন দিন আসবে, যখন কোনও নারীর কথ চিন্তা না করলেও ঈশ্বর অনুভূতি হলে পুরুষার্থ জাগ্রত হবে।

যোগীবাবার কথা একদিন ফলে গিয়েছিল। মন থেকে মুছে গে দময়ন্তী, আর তার মুখ মনে পড়ে না। সে অনেক পরের কথা

যোগীবাবার মৃত্যুর পর সাধক অর্চিষ্মান সেই আশ্রম ছেড়ে পাহাড়ে অনেক ওপরে উঠে গিয়ে এক গুহায় আশ্রয় নিয়েছেন। যোগীবাবা ইচ্ছে ছিল, অর্চিষ্মান এই আশ্রমের ভার নিয়ে নেন। কিন্তু বাবার অন শিষ্যদের মধ্যে ঈর্ষার ভাব দেখে তিনি সরে এসেছেন। সব সাধু তে এক হয় না। অনেক সাধুর টনটনে স্বার্থজ্ঞানও অর্চিষ্মানের চো পড়েছে।

এখানে গ্রাসাচ্ছাদনের কোনও চিন্তা নেই। অর্চিষ্মান নিজের জন

কিছুই কখনও রান্না করেন না। মাইল পাঁচেক দূরে পোটালা গ্রামে একটি লঙ্গরখানা আছে, গুজরাটের এক সমিতি সেটা চালায়। সেই লঙ্গরখানায় যেতেও হয় না, সেখানকার স্বেচ্ছাসেবকরা এসে রুটি, গুড়, ছাতু, বাতাসা দিয়ে যায়। খুব ঝড় বৃষ্টির সময় তারা আসতে পারে না, তাতেই বা কী, দু'-তিন দিন না খেয়ে থাকলেও কিছু ক্ষতি হয় না শরীরের। অবশ্য মনটা ছটফট করে; কখন আসবে, এই বুঝি এলো, এরকম অনুভূতি হয়।

মৃত্যুর আগের দু'দিন যোগীবাবার বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। অর্চিষ্মানের খুব জানতে ইচ্ছে করেছিল, শেষ পর্যন্ত তিনি ঈশ্বরের জ্যোতি দেখতে পেলেন কি না। শেষ দিনটিতে যোগীবাবার মুখে লেখেছিল অপূর্ব এক হাসি। কী পেয়েছেন তিনি?

কিছু একটা আছে, কোনও এক সময় সেই অনির্বচনীয়কে পাওয়া যাবে, এই বোধটাই জীবনকে উদ্দীপ্ত করে রেখেছে। সারাদিন পাহাড়ের রং বদলায়, মেঘ এসে গুম গুম শব্দ করে, এই সব কিছুর মধ্যেই যেন একটা রহস্য আছে। এতগুলি বছরের মধ্যে একটি দিনও অর্চিষ্মানের একঘেয়ে লাগেনি। তাঁর শাস্ত্র পাঠ করার দরকার হয় না, নিজের উপলব্ধিতেই তিনি এই বিশ্ব বিন্যাসের মধ্যে এক চৈতন্যের সন্ধান পেয়েছেন।

নদীতে স্নান করে ভিজে গায়ে রোদ্দুরে দাঁড়ালেন অর্চিষ্মান। বুকের মধ্যে হাতুড়ি পেটার মতন শব্দ হচ্ছে। শরীরটা আজ এত গণ্ডগোল করছে কেন? তিনি কাঠঠোকরা পাখিটিকে খুঁজলেন, পেলন না। সে উড়ে গেছে। প্রজাপতিরাও নেই। তিনি আকাশের দিকে তাকালেন। মনে মনে বললেন, হে সুন্দর, আমাকে শরীর ভুলিয়ে দাও!

আজ যেন বেশি শীত লাগছে। মেঘলা দিনের চেয়ে রৌদ্র ঝলমলে দিনে শীত বেশি পড়ে। এতগুলি বছরে শরীর তীব্র শীতেও অভ্যস্ত হয়ে গেছে। রাতে একটা কম্বলেই চলে যায়।

ভিজে গায়েই কম্বলটা জড়িয়ে নিয়ে অর্চিষ্মান এক পা এক পা করে এগোলেন গুহার দিকে। এখন শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে। কাঠের আগুন জ্বেলে গা সেঁকতে পারলে ভাল হয়।

গুহা পর্যন্ত পৌঁছতে পারলেন না অর্চিষ্মান। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। কপালটা ঠুকে গেল পাথরে।

আর উঠে দাঁড়াতে পারলেন না। সর্বাঙ্গ একেবারে অবশ। তিনি ভাবলেন, এই কি তাঁর শেষ মুহূর্ত ? তবে আসুক সেই মুহূর্ত, কোনও খেদ নেই।

হঠাৎ যেন অর্চিষ্মানের শরীরের সমস্ত ব্যথা-বেদনা চলে গেল। শরীরই যেন নেই, শুধু মন, একেবারে নির্ভার। তাঁর চোখে ফুটে উঠল প্রগাঢ় মুগ্ধতা। দৃশ্যের পর দৃশ্য ঢেউ খেলে যেতে লাগল। পাহাড় চূড়া থেকে গড়িয়ে এল তরল সোনা। তারপর সেই সোনা বদলে গিয়ে হল সাদা রঙের স্নিগ্ধ ধোঁয়া। কোথায় যেন অনেকগুলি আরতির ঘণ্টা বেজে উঠল। একরাশ ফুলের পাপড়ির মতন প্রজাপতি ঢেকে দিল সামনের পাথরটা। তারপর সেই ধোঁয়া ভেদ করে এগিয়ে এল একটা আলোর রেখা।

এই কি সেই ঈশ্বরের জ্যোতি ? ধন্য, ধন্য এই জীবন। এই আলোর মতন পরম সুন্দর আর কিছু নেই।

সেই আলোর রেখায় ফুটে উঠল একটি মুখ। সেই মুখ দময়ন্তীর।

অর্চিষ্মান প্রথমে চিনতে না পেরে চমকে উঠলেন। এই কি ঈশ্বরের রূপ ? না, না, এ তো দময়ন্তী, সেই যৌবনের দময়ন্তী, একদিন যার শুধু একটা আঙুল স্পর্শ করেছিলেন অর্চিষ্মান। শেষের দিকে বছরের পর বছর আর দময়ন্তীকে মনে পড়েনি। অথচ এখন অবিকল সেই মুখ, সেই মুখে মাখা রয়েছে বিষাদ।

ভারি ক্লান্ত গলায় দময়ন্তী বলল, অর্চি, তুমি আমাকে কোনও দিন ভালবাসনি !

অর্চিষ্মান বললেন, এখন আর সে কথা কেন ? কেন এখন এলে ? আমি তো আর সেই অর্চিষ্মান নই। তুমি কেন ঈশ্বরের জ্যোতি আড়াল করে দাঁড়াসে ?

দময়ন্তী যেন সে কথা শুনতে পেল না। সে আবার বলল, তুমি আমাকে ভালবাসনি, তুমি ভালবেসেছিলে তোমার গড়া এক নারীকে। আমাকে যত চিঠি লিখেছ, সে সব চিঠি তোমার নিজেকেই লেখা। তোমার ভাষার সাধনা। তুমি আমাকে গ্রহণ করতে চাওনি, তাই প্রথম সুযোগেই একজন পুরুষের হাতে আমাকে তুলে দিয়ে তুমি দূরে সরে গেলে।

অর্চিষ্মান কাতরভাবে বললেন, না, না, তা ঠিক নয়। যে ক'টা বছর আর কেউ আসেনি, আমি তোমাকেই শুধু ভালবেসেছি। তাতে কোনও মিথ্যে ছিল না।

দময়ন্তী বলল, এই তোমার ভালবাসা ? আমি চিঠি দিয়ে তোমাকে ডেকেছি, তুমি সাড়া দাওনি ! আমাকে ফেলে কত দূরে চলে গেলে, এতগুলি বছরে আমার কথা একবারও ভাবনি।

অর্চিষ্মান বললেন, এ জীবনে তোমাকে ছাড়া আর কোনও নারীকেই আমি চিনিনি। পাছে তোমার কথা ভুলে যাই, তাই আর কোনও নারীর সঙ্গে মিশিনি। আমার সেই ভালবাসা অটুটভাবে রেখে দিয়েছি বুকের মধ্যে। প্রথম প্রথম তোমার কথা মনে পড়লে কী কষ্ট যে হতো, তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। সেই জন্যই আমি আস্তে আস্তে তোমার মুখচ্ছবিখানি বদলে দিয়েছি। এই যে পাহাড়, এই যে ছোট নদী, ফুলের সমারোহ, প্রজাপতি, এমনকি কাঠঠোকরা পাখিটির মধ্যেও ভাগ ভাগ করে দিয়েছি তোমাকে। আকাশের রং-ফেরা তুমি, বাতাসের সুগন্ধ তুমি, পাথরের ডৌল তুমি। সবই তুমি। দময়ন্তী, এই বার এসো, আমাকে তুলে ধরো।

সেই আলোর রেখাটি অর্চিষ্মানের নিস্পন্দ শরীরে মিশে গেল।

স্বপ্নপুরী

চামেলি যেদিন এ পাড়া ছেড়ে চলে যায়, হ্যাঁ, অন্তত সাত আট বছর আগের কথা, সেই দিনটির কথা অনেকেরই মনে আছে। সেই দিন আর এই দিন, কত তফাত! বাড়িটার নাম পদ্মরানির ফ্ল্যাট। এ পাড়ার অন্য কোনও বাড়ির নাম নেই, শুধু নম্বর, শুধু এই বাড়িটাই লোকের মুখে মুখে পদ্মরানির ফ্ল্যাট হিসেবে নাম রটে গেল কী করে, তা বলা মুশকিল। পদ্মরানির নামে কেউ নেই, কস্মিনকালেও কোনও পদ্মরানি এ বাড়ির মালকিন ছিল না, আরও তিনখানা বাড়ি সমেত এ বাড়িটাও মল্লিকবাবুদের সম্পত্তি। এই পদ্মরানির ফ্ল্যাটের দোতলার ডান দিকের কোণের ঘরটায় থাকত চামেলি। মোট সতেরো জনের এক জন। তার নোকরের নাম ছিল হরিয়া।

নোকরদের যে কত প্রতাপ, তা বাইরের লোকেরা বিশেষ টের পায় না। হরিয়া অনেকবার থাপ্পড় কষিয়েছে চামেলিকে, চুলের মুঠি ধরে মাটিতে ফেলে দিয়েছে। কাবুর কাছে নালিশ জানাবার উপায় নেই। এক এক জন বাবু চলে যাওয়ার পরেই হরিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকে বলত, কেত্তো রুপিয়া দিল? নিকাল, নিকাল! বাবু পঞ্চাশ টাকা দিলে তার থেকে হরিয়া নেবে পনেরো টাকা। কার ঘরে ক'জন বাবু আসে সে হিসেব রাখে মালিকের প্রতিনিধি রূপলাল, ঘর ভাড়া নেয় সেই অনুযায়ী, প্রতি বাবুর জন্য কুড়ি টাকা। গতর খাটায় চামেলির মতন মেয়েরা, হরিয়ার মতন নোকরদের রোজগার তাদের চেয়ে অনেক বেশি। বাবুরা মদের পাঁইট আনায়, তার থেকে হরিয়ার দশ-বারো টাকা লাভ থাকে,

মাংস-সিগারেট আনতে দিলেও সে দু-পাঁচ টাকা তার থেকে নাফা করে।

তবু এই হরিয়ার জন্যই চামেলির ভাগ্য খুলে গিয়েছিল।

আট বছর আগেকার কথা। সে দিন ছিল এক প্রবল বর্ষণের সন্ধ্যা। রাস্তায় হাঁটু-ডোবা জল জমে গেছে, তবু ওইসব সন্ধেতেই বাবুদের আনাগোনা বেশি হয়। দুনিচাঁদ এসেছিলো চামেলির ঘরে। পদ্মরানির ফ্ল্যাটের সতেরোটি মেয়ের মধ্যে চামেলি মোটেই রূপে-গুণে শ্রেষ্ঠ নয়, বরং কুলসম, রতুরানি আর মালতীর ঠমক-ঠামক আর চেহারার চটক অনেক বেশি, তবু যে দুনিচাঁদ চামেলির ঘরে বসতে এসেছিল, তার কারণ সেই সন্ধেবেলা লোক ছিল আর সব কটা ঘরে। শুধু চামেলিই একমাত্র দরজায় দাঁড়িয়ে। একে নিয়তি ছাড়া আর কী বলা যায়!

চেহারা খুব বড়সড় নয় দুনিচাঁদের, কিন্তু গলার আওয়াজ বাজখাঁই, ঘাড় উঁচু করে হাঁটার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায় যে, সে-বেশ তেজী পুরুষ। দুনিচাঁদ যেমনই দিলদরিয়া, তেমনই হঠাৎ হঠাৎ রেগে ওঠে। প্রথম দিন অবশ্য সে একবারও রাগারাগি করেনি, ছিল বেশ খোশমেজাজে, হরিয়াকে চুরি করার সুযোগ না দিয়ে আগেই বখশিস দিল কুড়ি টাকা, এক বোতল রাম, এক ভাঁড় কষা মাংস ও চারখানা রুটি আনিয়ে নিজেই খেয়ে ফেলল তিনটে রুটি, বেশ খিদে পেয়েছিল তার। গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে চামেলিকে জিজ্ঞেস করল, তোমার এখানকার নাম চামেলি, আগে কী নাম ছিল?

চামেলি বলল, ওই একই নাম!

দুনিচাঁদ বলল, বাজে কথা! যত মেয়ে দেখি, সব ফুলের নামে নাম। চামেলি, শেফালি, পদ্ম, কুসুম, মল্লিকা। যত রাজ্যের ফুলেরা এসে এখানে জোটে? তোমার বাড়ি ছিল কোথায়?

অনেক বাবুই পূর্ব-ইতিহাস জানতে চায়। একটা গল্প খোঁজে। গ্রাম থেকে কোনও প্রেমিক বিয়ে করার নাম করে ফুসলিয়ে শহরে এনে দু-একদিন ফুর্তি করে এ পাড়ায় ছেড়ে দিয়ে গেছে, এই গল্পটাই বাবুরা বেশি পছন্দ করে। খেতে না পাওয়া বাপ-মা মেয়েকে বিক্রি করে দিয়েছে দালালের কাছে, এ কাহিনী বাবুরা পুরোটা শুনতে চায় না, মাঝপথে থামিয়ে দেয়। চামেলি এক নম্বর গল্পটাই বলল।

তা শুনে দুনিচাঁদ বলল, সে হারামজাদাটা এখন কোথায়? তার কান দুটো কেটে নিতে ইচ্ছে করে না তোমার?

এক ঘণ্টা বসলে একরকম রেট আর হোল নাইট থাকলে আলাদা রেট। দুনিচাঁদ হোল নাইট থাকার কথাই বলেছিল, কিন্তু ঘণ্টা দেড়েক বাদে চলে গেল পুরো টাকা দিয়ে। আবার ফিরে এল তিন দিন পরে। সেদিন রত্নরানি আর মালতীর ঘর খালি ছিল, তারা চোখ দিয়ে টানতেও চেয়েছিল, কিন্তু দুনিচাঁদ সোজা চলে এল চামেলির ঘরে। চামেলিকে তার মনে ধরেছে।

তিন মাস নিয়মিত যাতায়াত করেছিল দুনিচাঁদ, মাঝেমধ্যে হোল নাইটও থেকেছে, পরদিন সকালেও যায়নি, চামেলির হাতে রান্না খেয়ে ঘুমিয়েছে দুপুরে। হরিয়ার সঙ্গেও তার বেশ ভাব জমে গিয়েছিল, হরিয়ার সঙ্গে নানারকম মজা করত। নিজের কথা কখনও কিছু বলেনি দুনিচাঁদ। নাম শুনলে বাঙালি মনে হয় না, অথচ অনর্গল বাংলা কথা বলে। পকেট ভর্তি টাকা থাকে, কিন্তু তার পেশা বা জীবিকা কী তা বোঝা যায় না। মানুষটাকে ভালই লেগেছিল চামেলির, কখনও কর্কশ ব্যবহার করেনি। বেশ ঘরোয়া মতন।

এক সন্ধেবেলা এসে জামা-টামা খুলে মদের বোতল নিয়ে বসেছিল। হোল নাইট থাকবে। হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল তার, কোনও জরুরি কাজ ফেলে এসেছে যেন, ধড়ফড় করে উঠে জামা গলিয়ে বলল, আজ চলি গো চামেলি, আজ থাকতে পারব না!

সে বেরিয়ে যাওয়ার পর হরিয়া ঘরে ঢুকে বখরা চেয়েছিল। কত টাকা দিয়েছে দুনিচাঁদ? চামেলি বলল, আজ তো এক ঘণ্টাও থাকেনি, পঞ্চাশ দিয়ে গেছে। হরিয়া চোখ গরম করে বলল, তুই ঝুট বলছিস আমাকে! ওই বাবুটা হোল নাইট থাকার কড়ার করলে যখনই যাক পুরো টাকা দিয়ে যায়। দুশো টাকা। নিকাল, নিকাল।

প্রথমে চামেলির আঁচল ধরে টানল হরিয়া, আঁচলে বাঁধা আছে টাকা, চামেলি ছাড়বে না, তখন হরিয়া তার চুলের মুঠি চেপে ধরে মারল এক থাবড়া। সেই মুহূর্তে দরজা ঠেলে ঢুকে এল দুনিচাঁদ। সে তার সিগারেট-লাইটার ফেলে গেছে। ওই দৃশ্য দেখে সঙ্গে সঙ্গে তার চক্ষু রক্তবর্ণ হল। চিৎকার করে বলল, হারামজাদা! তারপর বাঘের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ল হরিয়ার ওপর। দুনিচাঁদের বিকট গর্জন শোনা গেল সারা বাড়িতে, ফট ফট করে খুলে গেল অনেকগুলো দরজা।

হরিয়াই তো এ বাড়ির একমাত্র নোকর নয়, আরও নোকর আছে। এক নোকরকে মারলে অন্যরা ছুটে আসে। তারা সবাই এককাট্টা।

রূপলাল বসে থাকে বাইরের গেটের কাছে, গোলমাল শুনে সেও ওপরে উঠে এল। অন্য নোকররা লাঠি-ডাণ্ডা নিয়ে এসেছে, তারা দুনিচাঁদকে ছাড়বে না। চামেলি দুনিচাঁদকে আড়াল করে আছে।

রূপলাল এসেই বলল, চোপ, সব চোপ! এটা কি মেছোহাটা পেয়েছিস?

চেঁচামেচির আওয়াজ বাড়ির বাইরে গেলে বাড়ির বদনাম হয়। অন্য খদ্দেররা ফিরে যায়। পদ্মরানির ফ্ল্যাটে আজেবাজে লোকের স্থান নেই।

সবাই চুপ করলে রূপলাল প্রথমে শান্তভাবে দুনিচাঁদকে জিজ্ঞেস করল, আপনি ওকে মারলেন কেন?

দুনিচাঁদ সামনে এগিয়ে এসে বলল, ও মেয়েছেলের গায়ে হাত দেবে কেন? এত সাহস, আমি চামেলির কাছে আসি, এই নিমকহারামটাকে কত বখশিস দিয়েছি, তবু চামেলিকে চুল ধরে টেনে....।

রূপলাল বলল, ঠিক আছে, আপনি যান। চলে যান।

দুনিচাঁদ বলল, চলে যাব মানে? ও কান ধরে সবার সামনে বলুক, আর কোনওদিন আমার বাঁধা মেয়েছেলের গায়ে হাত তুলবে না!

রূপলাল এবার তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তার দারোয়ানের দিকে তাকিয়ে বলল, এ লোকটাকে দূর করে দে! আর কোনওদিন ঢুকতে দিবি না! ঝনঝটিয়া পার্টি আমি চাই না!

রূপলালের সমর্থন পেয়ে সাহস বেড়ে গেল হরিয়ার। সে একটা পেতলের ফুলদানি তুলে মারতে গেল দুনিচাঁদকে। নিপুণ খেলোয়াড়ের মতন মাথা বাঁচিয়ে সরে গিয়ে দুনিচাঁদ হা-হা করে হেসে উঠল।

এমন অবস্থায় কোনও মানুষ হাসে? রূপলালের দারোয়ান আর সব নোকররা একযোগে আক্রমণ করলে সে যে ছাতু হয়ে যাবে। এখান থেকে দৌড়ে পালাতেও পারবে না, এটা বাঘের গুহা।

দুনিচাঁদকে কেমন যেন দুর্বোধ্য দেখাচ্ছে। তার মুখে উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নেই। বরং সে চামেলির বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, ঘাবড়াসনি, কেউ তোকে কিছু করবে না। তারপর হরিয়াকে বলল, কইরে কান ধর, ওর পা ধরে ক্ষমা চা, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

এবারে হরিয়া অতি কুৎসিত একটা গালাগাল দিয়ে উঠল। এভাবে সময় নষ্ট করাটাও রূপলালের পছন্দ নয়, সে দারোয়ানের দিকে ইঙ্গিত করল লোকটাকে পেটাবার জন্য।

দুনিচাঁদ তবু হাসছে, এটা যেন একটা খেলা, দৌড়ে দৌড়ে ঘুরছে ঘরের মধ্যে। এক লাফে একটা চেয়ারের ওপরে উঠে দাঁড়াল। প্যান্টের পকেট থেকে ফস করে বার করল একটা রিভলবার। হরিয়ার কপালের দিকে তাক করে বলল, মরতে চাস নাকি? তুই মরলে দেশে তোর বউ-বাচ্চার কী হবে?

ওটা খেলার অস্ত্র নয়, আসল, দেখলেই বোঝা যায়।

এ পাড়ায় খুন-জখম কিছু অভাবিত ব্যাপার নয়। গত সোমবারই এগারো নম্বর বাড়িতে একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে গেছে। দুই বন্ধু এসেছিল বীণা নামে একটি মেয়ের ঘরে। মদ খেতে খেতে দুই বন্ধুর মধ্যে কথা কাটাকাটি. বীণা কী করেছিল কে জানে, একজন হঠাৎ মস্ত বড় ছুরি বার করে প্রথমে বন্ধুকে মেরেছে, তারপর বীণার গলা কেটে দিয়েছে। ধরা পড়েনি লোকটা, ছুরি লকলকিয়ে বেরিয়ে গেছে অনেকের চোখের সামনে দিয়ে।

রূপলাল ভয়ে দেওয়াল সিঁটিয়ে দাঁড়াল। হুড়োহুড়ি করে পালল অন্য নোকররা, হরিয়ার কালো মুখখানা বেগুনি হয়ে গেছে।

এতবার এসেছে চামেলির কাছে, কিন্তু দুনিচাঁদ চামেলিকে নিয়ে কোনও আদিখ্যেতা করেনি। প্রশংসা-ট্রশংসা যেন সে করতেই জানে না। এসেছে, কাজ সেরে পয়সা ফেলে চলে গেছে। আজ হরিয়ার কাছে চামেলির লাঞ্ছনা দেখে সে কি হঠাৎ বদলে গেল!

এক হাতে রিভলবার, আততায়ী হওয়ার বদলে যেন প্রেমিক হয়ে উঠল দুনিচাঁদ। সে চামেলির দিকে মুগ্ধভাবে চেয়ে বলল, এ মেয়েটা বড় ভাল! কী নরম, কী সরল আর কী বোকা! ঠিক যেন একটা ফুল, যে-কেউ ঘাড় মুচড়ে দিতে পারে। আহা রে! আমি বহুৎ মেয়েছেলে ঘাঁটাঘাঁটি করেছি, এমন ফেইথফুল আর দেখিনি। সব কথা শোনে। ফলস দম নেয় না। আমার বড় পছন্দ হয়েছে। তুই আমার সঙ্গে যাবি চামেলি? যত্ন করে রাখব। মান দিয়ে রাখব। ঘরের বউয়ে মতন থাকবি। এমন কি আমি তোকে বিয়েও করতে পারি। হ্যাঁ, কেন বিয়ে করব না? আমার ইচ্ছে হয়েছে বিয়ে করব। আলবাৎ করব!

একটা রিভলবার দেখার চেয়েও এরকম প্রেমের সংলাপ শুনে সবাই বেশি স্তম্ভিত হয়ে যায়। বিয়ে করবে? বলে কী লোকটা?

চেয়ার থেকে নেমে দুনিচাঁদ রূপলালকে বলল, তুমি তো মালিক?

শুনে রাখ, আজ থেকে চামেলির ঘরে আর কোনও বাবু আসবে না। খবরদার, মনে থাকে যেন, আমার নাম দুনিচাঁদ! আমাকে একটু গুছিয়ে নিতে হবে, ঠিক সাত দিন পরে আমি আসব, চামেলিকে বিয়ে করে নিয়ে যাব। সবাই সাক্ষী থাকবে।

পকেট থেকে একটা নোটের তাড়া বার করে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে রূপলালের গায়ের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বলল, এই নাও, তোমার ঘর ভাড়া।

তারপর সকৌতুকে হরিয়ার এক কানের মধ্যে রিভলবারের নল ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, একটু আঙুল নাড়ালেই ফুস! ঘলু-ফিলু সব বেরিয়ে যাবে, বুঝলি? নিমকাহারামি করিস কেন? যার কাছ থেকে পয়সা নিবি, আবার তাকেই বে-ইজ্জতি করবি? আর অমন করিস না!

এক হাত উঁচু করে রিভলবারটা ধরে দুনিচাঁদ যখন বেরিয়ে গেল, তখন মনে হল সে যেন কোনও নাটকের চূড়ান্ত দৃশ্যের নায়ক। চটপট হাততালি পড়া উচিত ছিল। কিন্তু সবাই নিঃশব্দ, নির্বাক।

পরে অবশ্য সবাই বলাবলি করতে লাগল, এসব মাতালের বারফট্টাই! নেশার ঝোঁকে এক একজন নিজেকে মনে করে খাঞ্জা খাঁ! বিয়ে করবে না ছাই! ও আর এ মুখোই হবে না!

দুনিচাঁদের নামটা আগে রূপলালরা জানত না। পাড়ার গুণ্ডা-মাস্তানদের কাছে খোঁজখবর নিয়ে দেখল, এ নামের বাজারদর আছে। কয়েকজন এ নাম শুনেছে। একজন বলল, ওরস্ শালা, লোকটা দারুণ রগচটা, কেউ বেগড়বাঁই করতে গেলেই ঝটকসে গুলি চালিয়ে দেয়। ওর আর এক নাম ফান্দা দুনিচাঁদ।

সাত দিন সময় দিয়ে গেছে, হাজার খানেক টাকা দিয়ে গেছে, সাত দিন অপেক্ষা করতেই হয়। রূপলাল এই সাত দিন চামেলির ঘরে কোনও লোক বসাল না। হরিয়া ভয়ের চোটে ও ঘরের কাছেই যায় না। চামেলি সন্ধের পর দরজা বন্ধ করে রাখে।

ঠিক সাত দিনের মাথায় ফিরে এল দুনিচাঁদ। ফিরে এল মানে কী, একেবারে রাজার মতন। জরির কাজ করা পাঞ্জাবি আর সরু পাজামা পরা, ঘাড়ে পাউডার। দুখানা ট্যাক্সি করে কয়েকজন স্যাঙাৎ নিয়ে এসেছে, সে ট্যাক্সির মিটারে লাল কাপড় বাঁধা। চামেলির জন্য এনেছে বেনারসি শাড়ি। রূপলালের থুতনি ধরে নেড়ে জিজ্ঞেস করল, কী গো, সব ঠিক আছে তো?

দিনেরবেলা, দুপুর বারোটা। কুলসম, মালতীরা যত্ন করে সাজিয়ে দিল চামেলিকে। কপালে চন্দনের ফোঁটা, যেন সত্যি সত্যি বিয়ের কনে। বিয়ে হবে আহিরিটোলার কালীবাড়িতে, সেখানকার পুরুতের সঙ্গে ঠিকঠাক করা আছে। আরও চমকের ব্যবস্থা করে এসেছে দুনিচাঁদ, ট্যাক্সি থেকে নামানো হল কেটল্ ড্রাম আর বিউগল্, দুনিচাঁদের বন্ধুরা বাজাবে, মিছিল করে যাওয়া হবে কালীমন্দির পর্যন্ত। পদ্মরানির ফ্ল্যাটের সব মেয়ের নেমন্তন্ন।

দুখানা ট্যাক্সি চলছে আস্তে আস্তে, সামনে দিয়ে হাঁটছে একগুচ্ছের স্ত্রীলোক, তারও সামনে ভ্যাঁপোর ভ্যাঁপোর শব্দে বাজছে ব্যান্ডপার্টি। রাস্তার লোকেরা অবাক হয়ে তাকিয়েও কিছু বুঝল না। রুপোগাছির বারবনিতাদের এমন মিছিল আগে কেউ কখনও দেখেছে ? ইতিহাস সৃষ্টি করে গেল দুনিচাঁদ।

পদ্মরানির ফ্ল্যাটের অনেক রমণীই চোখের জল ফেলল চামেলিকে বিদায় জানাবার সময়।

বউকে নিয়ে দুনিচাঁদ প্রথমেই গেল ভাইজাগ শহরে, সেখানে ন দিন কাটাবার পর গোয়াতে ছ দিন, তারপর ম্যাঙ্গালোরে আরও কয়েকটা দিন। হোটেলে হোটেলে থাকা। মুর্শিদাবাদের এক গ্রাম থেকে দুই দালালের হাত ঘুরে উত্তর কলকাতার নিষিদ্ধপল্লীতে এসে ঠেকেছিল চামেলি, সেখানকার কয়েকটি গলি, আর সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের একটা সিনেমা হলে কয়েকবার হিন্দি সিনেমা দেখতে যাওয়া ছাড়া পৃথিবী সম্পর্কে তাব কোনও জ্ঞানই ছিল না। এত দূরদেশের নতুন নতুন শহর. অন্যরকম মানুষ, অন্যরকম ভাষা, চামেলি তো হকচকিয়ে যাবেই। দুনিচাঁদের ব্যবহারের কোনও ত্রুটি নেই, সবসময় হাসিঠাট্টা করে, এমন মানুষকেও লোকে রাগচটা বলে ?

প্রায় এক মাস ঘোরাঘুরির পর দুনিচাঁদ চামেলিকে এনে তুলল নিউ ব্যারাকপুরের এক দোতলা বাড়িতে। একতলায় সপরিবারে থাকে দুনিচাঁদের দাদা, তার তিনটি ছেলেমেয়ে। ওপরে দুখানা ঘর। দুনিচাঁদ বলল, এবার তোর সংসার গুছিয়ে নে চামেলি। কাজের জন্য আমাকে প্রায়ই বাইরে যেতে হয়, একটানা বিশ-পঁচিশ দিন থাকব না, তাই তোকে তো কোথাও একা রাখতে পারি না। নিচে বউদি রইল, তোর কোনও বিপদ হবে না এখানে। ডাঁটের ওপর থাকবি, কারুকে গেরাহ্য করার

রকার নেই। দাদার সংসার খরচ চলে আমার টাকায়।

সত্যি দুনিচাঁদ মাঝে মাঝে উধাও হয়ে যায়। আবার ফিরে এসে াট-দশ দিন বাড়িতে থেকে যায়, বেরুতেই চায় না, শুয়েবসে কাটায়। খন তাকে মনে হয় আদর্শ স্বামী। বকাঝকা দেয় না, আদর করে, মন কি সংসারের কাজে সাহায্যও করে। নিজে মাংস রাঁধে। বেশি দ খায় না। চামেলির হাতে মাঝে মাঝে পাঁচশো, সাতশো টাকা দিয়ে লে, তুই ইচ্ছেমতন খরচ করবি।

চামেলি অবশ্য বাড়ি থেকে বেরোয় না। এই বাড়ি সমেত গোটা াঁচেক বাড়ি নিয়ে একটা কম্পাউন্ড, পেছন দিকে বস্তি, তারপর রললাইন। কী করে যেন রটে গেছে, চামেলি বুপোগাছির মেয়ে। এসব থা চাপা থাকে না। কিংবা দুনিচাঁদ হয়তো নিজেই জাঁক করে বলেছে। ার তো কোনও ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই, একটা মেয়েকে তার পছন্দ য়েছে, তাকে বিয়ে করে এনেছে, সে আগে কুলটা না কুলনারী কী ছল, তাতে অন্যের কী আসে যায়?

দুনিচাঁদের বউদি চামেলির সঙ্গে পারতপক্ষে কথা বলে না। দু-কবার দোকান-টোকানে গিয়েছিল চামেলি, পাড়ার অন্য মেয়েরা তাকে দখে মুখ ঘুরিয়ে নেয়, পুরুষরা ভুরু বেঁকিয়ে তাকায়। এ নিয়ে দুনিচাঁদের াছে নালিশ করা চলে না। বরং এসব অগ্রাহ্য করাই ভাল। তার স্বামী াকে আশাতিরিক্ত সুখে রেখেছে। এমন স্বামী কজন পায়?

একটি অল্পবয়সী কাজের মেয়ে রাখা হয়েছে, দুনিচাঁদ যখন থাকে া, তখন তার সঙ্গেই গল্প করে সময় কাটায় চামেলি। মেয়েটির নাম র্ণিমা, ডাকনাম পুনি, বছর পনেরো বয়েস, কালো, রেললাইনের ধারের স্তিতে থাকে। এই বয়েসেই পুনির খুব বিয়ে করার শখ। সে জানে, ার চেহারা সুন্দর নয়, তার বাবা-মা তার বিয়ে দিতে পারবে না। রল স্টেশনে একজন লোক তাকে বলেছে, কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ভাল াজ জুটিয়ে দেবে।

পুনিও জানে, চামেলি আগে কোথায় ছিল। তার ধারণা, সেটা খুব র্তির জায়গা। সে একদিন জিজ্ঞেস করল, ওখানে খুব মজা, তাই া? কত লোক আসে, রোজ নতুন নতুন, সে সব ছেড়ে তুমি চলে লে কেন গো?

প্রবলভাবে মাথা নেড়ে চামেলি বলল, না রে, মজা নেই। একটুও

মজা নেই। সবাই মারে। বাড়ির মালিক, এমন কি বাড়ির চাকর পর্যন্ত মারে। রোজগারের পয়সা অন্যরা নিয়ে নেয়। বাবুদেরও কতরকম বায়না। গায়ে সিগারেটের ছ্যাঁকা পর্যন্ত দিয়ে দেয়। ওরে পুনি মেয়েমানুষকে সবাই মারে। এমন কি আমি শুনেছি, অনেক বিয়ে করা বরও বউদের ধরে পেটায়। আমার সোয়ামী যে আমাকে মারে না, সেটা আমার সাতপুরুষের ভাগ্যি

এক বছর ঘুরতে না ঘুরতেই চামেলির একটি সন্তান জন্মাল কন্যাসন্তান। তাতেই দুনিচাঁদ কী খুশি! তার নিজের সন্তান! কোলে নিয়ে শিশুটিকে আদর করে। বাইরের অনেকে দুনিচাঁদকে নিষ্ঠুর, দুর্দান্ত প্রকৃতির মানুষ বলে জানে, কিন্তু এখন বোধহয় সে শান্ত হয়ে ঘর বাঁধতে চায়। মাঝে মাঝেই সে বলে, চামেলি, আমার চার-পাঁচটা ছেলেমেয়ে চাই। দিতে পারবি না? আমার বেশ একটা বড় ফ্যামিলি হবে।

দুনিচাঁদ মেয়ের নাম রাখল চাঁদনী। ওদের পদবি সাউ। দুনিচাঁদের বাবা ছিলেন ওড়িয়া, মা বাঙালি। জন্মকর্ম সব ধানবাদে, সেখানেই দুনিচাঁদের ডানপিটেমির হাতেখড়ি। মেয়ের ওই নামে দেওয়ার পর দুনিচাঁদ বলেছিল, ইস্কুলে ভর্তি করার সময় ওর নাম হবে চাঁদনী সাহা তাতে সবাই ভাববে বাঙালি। আমরা তো বাঙালিই হয়ে গেছি

চামেলি অমনি কল্পনায় দেখতে পায়, তার মেয়ে ফ্রক পরে বেণি দুলিয়ে স্কুলে যাচ্ছে। তাদের মুর্শিদাবাদের গ্রামে কোনও স্কুল ছিল না গ্রামের কিছু ছেলে সাত মাইল দূরে অন্য গ্রামের স্কুলে পড়তে যেত মেয়েদের বেলায় সে প্রশ্নই ছিল না।

এই মেয়ের টানেই দুনিচাঁদ এখন বেশি বেশি বাড়িতে থাকে। কাজের জন্য বাইরে গেলেও ফিরে আসে পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে। মেয়েকে কোলে নিয়ে দুনিচাঁদ পাড়া বেড়াতে যায়। যারা চামেলিকে ঘেন্না করে, তারাও দুনিচাঁদের সঙ্গে খাতির করে কথা বলে, জানলা দিয়ে চামেলি দেখতে পায়, পড়শীর কেউ কেউ তার মেয়ের গাল ছুঁয়ে আদর করছে। দেখে বুকের মধ্যে কেমন যেন হয় চামেলির। বুপোগাছিতে থাকার সময় এক এক দিন হরিয়ার হাতে মার খেতে খেতে তার মনে হত, সে সারা জীবনের জন্য দণ্ডিত, ওখানেই তার জীবন কাটাতে হবে। তবু সে মুক্তি পেয়ে গেল কী করে? দুনিচাঁদ যখন বিয়ের কথা বলে চলে যায়, সেই সাত দিন তার মাঝে মাঝেই মনে হয়েছে, লোকটার কাছে বন্দুক-পিস্তল

থাকে, লোকটা খুনি, সে যদি বিয়ে করার নাম করে নিয়ে গিয়ে তাকে খুন করে? তারপর সে ঠিক করেছিল, হরিয়ার হাতে নিয়মিত মার খাওয়ার চেয়ে মরে যাওয়াও ভাল। কিন্তু কোথায় খুনী, এ লোকটা তাকে কখনও একটা চড়ও মারেনি। কোন মন্ত্রে তার জীবনটা এমন বদলে গেল? তবে কি স্বপ্নপরী তাকে দয়া করেছে?

দুনিচাঁদের আরও কয়েকটি ছেলেমেয়ের জনক হওয়ার সাধ ছিল, কিন্তু পরবর্তী পাঁচ বছরে চামেলি আর কোনও সন্তানের জন্ম দিতে পারল না। চাঁদনী পাড়ার শিশুমঙ্গল স্কুলে ভর্তি হয়েছে, সে মাকে ছড়া মুখস্থ করে শোনায়। চামেলি যেরকম স্বপ্ন দেখেছিল, ঠিক সেইরকমই সেজেগুজে স্কুলে যায় তার মেয়ে।

পরের বছর চাঁদনী হঠাৎ অসুখে পড়ল। হঠাৎ হঠাৎ তার পেট ব্যথা করে, এমনই ব্যথা যে বলি দেওয়া পাঁঠার মতন মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে ছটফট করে, মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরোয়। ডাক্তার-কবিরাজদের ওষুধে কোনও কাজ হয় না। কী যে অসুখ, সেটাই ধরা যাচ্ছে না, এক্স-রে করানো হল, রক্ত পরীক্ষা করানো হল, তবু কিছু বোঝা যায় না। ক্রমেই অসুখ বাড়ছে, একসময় মনে হল, এ মেয়েকে আর বাঁচানো যাবে না, যখন-তখন পেট ব্যথায় অজ্ঞান হয়ে যায়, খেতেও চায় না

একজন ডাক্তার বললেন, হাসপাতালে পাঠিয়ে শেষ চেষ্টা করা যেতে পারে।

হাসপাতালের নামে চামেলির বিষম ভয়। তার ধারণা, হাসপাতাল থেকে কেউ ফেরে না। পদ্মরানির ফ্ল্যাটে তার পাশের ঘরেই থাকত নিভাননী, একদিন তার ধুম জ্বর হল, পাড়ার ডাক্তার বলল, টাইফয়েড। রূপলাল তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিল, সেদিন খুব বৃষ্টি ছিল মনে আছে, অত জ্বরের মধ্যেও নিভাননী হেসে হেসে কথা বলছিল, ওমা পরদিনই খবর এল, নিভাননী আর নেই।

আকুলি-বিকুলি করে কাঁদতে লাগল চামেলি। মেয়েকে সে হাসপাতালে কিছুতেই পাঠাবে না। দুনিচাঁদ ধমকাতে লাগল তাকে। ডাক্তারের চেয়ে সে বেশি বোঝে? বাড়িতে রেখে তো মেয়েটাকে এক গরাস ভাতও খাওয়ানো যাচ্ছে না, ওরা নল দিয়ে খাওয়ায়। আজও পড়ছে অঝোরে, কালিবর্ণ আকাশ দেখে চামেলির মনে পড়ছে

নিভাননীর কথা। সে দুনিচাঁদের পায়ে আছড়ে পড়ে বলল, ওগো অন্তত বৃষ্টিটা থামতে দাও, কাল পাঠিও।

সন্ধের পর অনেকক্ষণ ব্যথায় ছটফট করে মেয়ে ঘুমিয়েছে মাঝরাতে দুনিচাঁদ ঘুম ভেঙে দেখল, মেয়ের খাটের পাশে মেঝেতে হাঁ গেড়ে বসে চামেলি বিড়বিড় করে কী যেন বলছে। চক্ষু দুটি বোজা একটু একটু দুলছে শরীর।

দুনিচাঁদের বড় কষ্ট হল। মেয়েটা না বাঁচলে শোকে দুঃখে বউট বোধহয় পাগল হয়ে যাবে। সেও পাশে গিয়ে বসে পড়ে জিজ্ঞেস করল কোন ঠাকুরকে ডাকছিস ?

চামেলি চোখ না মেলেই বলল, স্বপ্নপরী।

এখানে পাড়ার মধ্যেই রয়েছে কালীমন্দির। একটু দূরে মস্ত ব জগদ্ধাত্রী মন্দির, দু জায়গাতেই পুজো দেওয়া হয়েছে। স্বপ্নপরী আবা কী ঠাকুর ? দুনিচাঁদ কোনওদিন নাম শোনেনি।

চামেলি মেয়েকে ঠেলা দিয়ে বলল, মা রে, একবার চোখ মে তাকা।

দুনিচাঁদ বলল, ওর ঘুম ভাঙাচ্ছিস কেন ?

চামেলি বলল, ও নিজে না ডাকলে ফল হবে না। আমার স্বপ্নপরীে ডাকলাম তো কতবার। একবার দেখা দিয়ে বলল, আমার স্বপ্নপরী আ ওর স্বপ্নপরী আলাদা। ওরটা আমি চিনব না।

দুনিচাঁদ অবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, কী বলছিস তুই ? পরী কখন ঠাকুর হয় নাকি ?

চামেলি বলল, আমি যখন ছোট ছিলাম, আমাদের গ্রামে একট পাগল ছিল। সে স্বপনপরী স্বপনপরী বলে খুব চেঁচাত। লোকে জিজ্ঞে করলে বলত, আমার স্বপনপরীকে তোরা দেখতে পাবি না। প্রত্যে মানুষের আলাদা আলাদা স্বপনপরী থাকে। তাকে ডাকতে হয় সাধ্যসাধনা করতে হয়, তা হলে ঘুমের মধ্যে দেখা দেয়।

দুনিচাঁদ বলল, হুঁ, পাগলের কথা।

চামেলি তবু মেয়েকে জাগিয়ে বললো, একবার বল তো মা, স্বপ্নপরী স্বপ্নপরী, দেখা দাও। আমার ভাগ্য বদলে দাও।

চাঁদনী একবার শুধু অস্ফুট স্বরে বলল, স্বপ্ন....স্বপ্ন....স্বপ্নপরী

পরদিন চাঁদনীকে পাঠাতে হলো হাসপাতালে। বৃষ্টি থেমে গেছে শো

রাতে। তাতে চামেলি খানিকটা সান্ত্বনা পেয়েছে, বৃষ্টির মধ্যে পরী আসবে কী করে?

এগারো দিন বাদে হাসপাতালে থেকে অনেকটা সুস্থ হয়ে ফিরে এল চাঁদনী। ডাক্তারদের হাতযশ, না স্বপ্নপরীর দয়ায়, তা বোঝার উপায় নেই। চাঁদনীকে জিজ্ঞেস করলে সে দু'দিকে মাথা নাড়ে, না সে দেখেনি স্বপ্নপরীকে। চামেলি তা বিশ্বাস করে না, তার দৃঢ় বিশ্বাস ঘুমের মধ্যে চাঁদনীর নিজস্ব স্বপ্নপরী এসে ওর কপাল ছুঁয়ে গেছে, স্বপ্নের কথা অনেকের মনে থাকে না।

চাঁদনী সুস্থ হয়ে ওঠায় এ সংসারে আবার স্বস্তি ফিরে এল। শুধু কাজের মেয়েটা এর মধ্যে ডুব দিয়েছে। চামেলির কথা সে শোনেনি, সে পালিয়েছে স্টেশনের একটা ছোকরার সঙ্গে।

অনেক দিন কাজকারবারে যাওয়া হয়নি, দুনিচাঁদ এবার বাইরে গেল। সাত দিনের মধ্যে ফিরে আসার কথা। দেখতে দেখতে দু সপ্তাহে, তিন সপ্তাহ কেটে গেল, তার কোনও খবর নেই। মেয়ের চিকিৎসার জন্য অনেক খরচ হয়ে গেছে, চামেলির হাতে বিশেষ টাকা নেই। দুনিচাঁদ যাওয়ার সময় পাঁচশো টাকা দিয়ে গেছে, তাতে কতদিন চলে? প্রায় মাস ঘুরে যাওয়ার উপক্রম, এত দেরি দুনিচাঁদ কখনও করে না।

একদিন দুটো লোক এল দুনিচাঁদের খোঁজে। লোক দুটির মুখ চেনা, চামেলি ওদের বিয়ের দিন দেখেছে। এর মধ্যে ওরা একবারও আসেনি। ঘরে ঢুকেই একজন চারদিক তাকিয়ে দেখল। তারপর জিজ্ঞেস করল, ছাদের দরজায় চাবি দেওয়া থাকে?

সত্যিই তাই, ছাদের দরজায় সবসময় চাবি দিয়ে রাখে দুনিচাঁদ, কারুকে উঠতে দেয় না। সে চাবি কি সে সঙ্গে নিয়ে গেছে? না, একটা দেরাজে পাওয়া গেল চাবি। লোক দুটি ছাদে গিয়ে জলের ট্যাঙ্কে নেমে পড়ল। সেখান থেকে তুলে আনল তিনটে রিভলবার। সেগুলো নিয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে তারা বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

তার একটু পরেই দোতলায় উঠে এল দুনিচাঁদের দাদা আর তার গুণ্ডামার্কা দুই ছেলে। ব্যস্তসমস্তভাবে বলল, আর কোথায় কী লুকিয়ে রেখে গেছে? এক্ষুনি দেখতে হবে। পুলিশ এসে কিছু পেলে আমাদেরও হাতে দড়ি দেবে।

আলমারি, বাক্স সব খুলে দেখল, বাথরুম, রান্নাঘর তন্ন তন্ন করে

খুঁজেও অবশ্য আর কোনও অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেল না। বড় ছেলেটা চামেলির গয়নাগুলো হাতিয়ে নিল।

দুনিচাঁদের দাদা চামেলির দিকে রক্তচক্ষে তাকিয়ে বলল, হারামজাদি, আমার ভাইটাকে খেলি ? আমি আগেই জানতাম—

দুই

ট্যাক্সি চেপেই এ পাড়া থেকে এক দিন চলে গিয়েছিল; ট্যাক্সিতেই ফিরে এল চামেলি ! সেই দিন আর এই দিন !

ট্যাক্সিটা থামল বুড়োর দোকানের সামনে। ভেতর থেকে কারা যেন চামেলিকে ঠেলে নামিয়ে দিল, ছুঁড়ে দিল তার মেয়েকে আর একটা কাপড়ের পুঁটুলি। তারপর হুস করে চলে গেল ট্যাক্সিটা।

বুড়োর দোকানে দিনেরবেলা পান-বিড়ি, সোডা-লেমনেড বিক্রি হয়, রাত্তিরে চোলাই মদ। দোকানের মালিক বৃদ্ধ নয়, বছর পঁয়তাল্লিশেক বয়স, তার নামই বুড়ো। দিনেরবেলা সে আসে না, দোকানে বসে পটল। দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দুজন ছেলে পটলের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে, তারা ত্যাড়ছা চোখে তাকাল চামেলির দিকে। একজন চিনতে পারল, এ মেয়েটা পদ্মরানির ফ্ল্যাটে একসময় থাকত না ? চেহারাটা চিমসে মেরে গেছে।

মেয়েকে নিয়ে কোথায় যাবে চামেলি ? একটাই বাড়ি সে চেনে। আস্তে আস্তে হেঁটে পদ্মরানির ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে দাঁড়াতেই রূপলাল হেঁকে বলল, কে রে ?

চামেলি মিনমিন করে বলল, দাদা, আমি চামেলি !

গেটের সামনে একটা চেয়ারে রূপলাল দুপুর থেকে রাত বারোটা-একটা পর্যন্ত ঠায় বসে থাকে। পাজামার ওপর গেঞ্জি পরা, ডান বাহুতে সোনার মাদুলি বাঁধা। দুজন নেপালি দারোয়ান থাকে কাছাকাছি। এ বাড়িতে সবরকম গণ্ডগোল সামলাবার দায়িত্ব তার।

রূপলাল চিনতে পারল না। ভুরু কুঁচকে চামেলিকে আপাদমস্ত দেখে বলল, কী চাই এখানে ? ভিক্ষেটিক্ষে হবে না, যা ভাগ !

সত্যি চেহারাটা হঠাৎ বেশ খারাপ হয়ে গেছে চামেলির। দুনিচাঁ আর ফেরেনি, কী করে যেন জানা গেছে যে লালগোলার কাছে (খুন হয়েছে, তার কোনও পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছুরি মেরেছে পেছন দি থেকে। এ খবর শোনামাত্র দুনিচাঁদের দাদা ও বাড়ির অন্যান্য লে

চামেলিকে তাড়াবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল। চামেলি একটা নষ্ট মেয়ে, বিয়েটিয়ে সব বাজে কথা। দুনিচাঁদের সম্পত্তির ওপর তার কোনও অধিকার নেই। প্রথমে ধমকানি ও হুমকি, তারপর ধাক্কাধাক্কি, তারপর মার। চামেলির অবশ্য দৃঢ়বিশ্বাস দুনিচাঁদ মরেনি, কোনও কারণে লুকিয়ে আছে, আবার ঠিক ফিরে আসবে, সে জন্য সে বাড়ি ছেড়ে কিছুতেই যাবে না। কিন্তু কতদিন মার সহ্য করবে? ও পাড়ায় একজনও তার প্রতি সহানুভূতি দেখায়নি। দাদার দুই ছেলে আরও সাঙ্গোপাঙ্গ জুটিয়ে আজ গলা ধাক্কা দিতে দিতে বাড়ির বার করে দিয়েছে। তারপর বেড়াল পার করার মতন ট্যাক্সি করে এনে ফেলে দিয়ে গেছে এখানে।

দোতলার একটা ছোট ছাদ আছে। এই সময় এ বাড়ির মেয়েরা দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর খোলা চুল মেলে ছাদে দাঁড়ায়, চুল শুকোয়। কে উঁকি মেরে বলল, ও মা, ও তো চামেলি, ফিরে এসেছে! আয় আয়, ওপরে আয়!

সে গল্পটা শুনতে চায়। গল্প শোনার লোভে আরও অনেক মেয়ে কুলসমের ঘরে এসে চামেলিকে ঘিরে বসল। কত ধূমধাম করে বিয়ে হয়েছিল চামেলির, বেনারসি শাড়িতে কী সুন্দর দেখাচ্ছিল। আজ তার মলিন চেহারাতেই সব গল্প লেখা আছে। বিয়ের সুখ কি সকলের কপালে সয়! কেউ হাসিঠাট্টা করল না, কেউ বিদ্রূপের হুল ফোটাল না। স্বামী নামে সেই লোকটা তাড়িয়ে দেয়নি, সে মারা গেছে, এটাই যেন খানিকটা সান্ত্বনার মতন।

চাঁদনীর থুতনি ধরে আদর করে কুলসম বলল, কী সুন্দর দেখতে হয়েছে মেয়েটা। আহা রে, মুখখানা শুকিয়ে গেছে কেন? সারাদিন খায়নি বুঝি কিছু?

ওদের দুজনকেই খাওয়ানো দাওয়ানো তো হল, কিন্তু আশ্রয় দেবে কে? পদ্মরানির ফ্ল্যাটে একটাও ঘর খালি নেই। তা ছাড়া এখানে বাছাই করা মেয়ে রাখা হয়। চামেলির যা চেহারা হয়েছে, তাতে রূপলাল তাকে রাখতে চাইবে না। চার নম্বর বাড়িতে হরিমতী মারা গেছে গত সপ্তাহে, তার ঘরে নতুন কেউ এসেছে? সে ঘরখানা যদি খালি থাকে—

চামেলি, বলল, ও দিদি, আমি আর এ লাইনে আসতে পারব না।

কুলসম বলল, লাইন ছেড়ে দিতে চাস, তা বেশ কথা। টাকাপয়সা কিছু জমিয়েছিস? গয়নাগাটি সব সঙ্গে এনেছিস তো?

এতক্ষণ বাদে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে চামেলি। সব কেড়ে নিয়েছে। পুরুষ মানুষদের সঙ্গে সে গায়ের জোরে পারবে কেন ? জোর করে গা থেকে গয়না খুলে নিয়েছে। আলমারি খুলে সাফ করে নিয়েছে একেবারে। বাধা দিতে গিয়ে মার খেয়েছে চামেলি। চেঁচাবার চেষ্টা করলে ওরা তার গলা টিপে ধরেছিল।

যেন সেই সব অত্যাচারীদের চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে, কুলসম দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল, হারামি ! কুত্তার বাচ্চা ! কোনওদিন মায়ের দুধ খায়নি !

শুধু মেয়ের কানে রয়েছে দুটো সোনার দুল, ওর বাবা সাধ করে এ বছরেই কিনে দিয়েছিল, সে দুটো ওরা নিতে পারেনি !

এ লাইনে যদি আর আসতে না চায় চামেলি, তা হলে সে খাবে কী ? মেয়েকেই বা বাঁচাবে কী করে ? আর কোন কোন পথ খোলা আছে চামেলির জন্য ? লোকের বাড়িতে ঝি-গিরি করতে পারে। রাজমিস্তিরিদের জোগাড়ে হতে পারে। অথবা শেষ উপায় রাস্তায় ভিক্ষে করা, রাস্তাতেই আশ্রয়।

বীণা বলল, এ লাইন ছেড়ে তুই আর যেখানেই যা, সঙ্গে যদি মরদ না থাকে, অন্য পুরুষ মানুষরা যখন তখন ফোকটে ঠুকরে ঠুকরে তোকে খাবে। মেয়েমানুষের শরীর যতদিন না একেবারে রসকষ শুকিয়ে দড়ি হয়ে যায়, ততদিন পুরুষ মানুষেরা ছাড়ে না। ভগবানের এই বিচার !

এ লাইন ছেড়ে দেওয়ার স্বপ্ন কি আগেও কেউ কেউ দেখেনি ? হেনা, মল্লিকা, বীণারা অনেক আলোচনা করেও কোনও কূলকিনারা পায় না। এখানে তবু নিজস্ব একটা ঘর আছে। মেয়েমানুষ রাস্তা চায় না, ঘর চায়।

কুলসম বলল, যদি সত্যিই এ লাইনে আসতে ইচ্ছে না করে, তা হলে রেললাইনে গিয়ে গলা দিগে যা। সেটাই সবচেয়ে ভাল।

কিন্তু তা হলে মেয়েটার কী হবে ?

চার নম্বর বাড়িতে মৃত হরিমতীর ঘরেই উঠতে হল চামেলিকে। আবার আগেকার মতন জীবন। মাঝখানের সাড়ে ছটা বছর যেন একটা স্বপ্ন। সে সময়টা অলীক, এই জীবনই বাস্তব। প্রতিদিন বারবার ধর্ষিত হওয়াই তার নিয়তি।

এ বাড়িতে তার নোকরের নাম লালুরাম, মাঝবয়েসী, কঠোর

চেহারার মানুষ। হরিয়ার সঙ্গে তার একটা তফাত আছে, সে গায়ে হাত তোলে না, কিন্তু হিসেব না বোঝার ভান করে প্রাপ্য টাকার চেয়েও বেশি চায়, না দিলে ঘ্যান ঘ্যান করে, শেষ পর্যন্ত পাঁচ-দশ টাকা বেশি আদায় করে ছাড়ে। তা নিক। নোকরদের ওপর নির্ভর না করেও তো উপায় নেই। ওরা সবসময় বাইরে বসে পাহারা দেয়, খদ্দেরদের মধ্যে কেউ বেশি গণ্ডগোল করলে ওদের সাহায্য নিতে হয়। আসেও তেমন কিছু কিছু, মানুষ না যেন বনমানুষ, আঁচড়ে কামড়ে অতিষ্ঠ করে তোলে।

লালুরামের সঙ্গে হরিয়ার গ্রাম সম্পর্কে আত্মীয়তা আছে। এ বাড়িতে আসে মাঝে মাঝে। চামেলির ওপর হরিয়ার এখনও খুব রাগ। দুনিচাঁদ তাকে মেরে দাঁত ভেঙে দিয়েছিল, সেটা যেন চামেলির দোষ।

চামেলি ছাড়া আরও তিন-চার জনের ছেলেমেয়ে আছে। ছাদের ওপর টালির চাল দেওয়া একটা ঘরে থাকে সেইসব ছেলেমেয়েরা। সন্ধের সময় তাদের নীচে নামা নিষিদ্ধ। রাতের মোহিনীদের কেউ মা হিসেবে দেখতে চায় না।

চাঁদনী এখানে এসে কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেছে। বাবা আর মা ছাড়া আর কারুর স্নেহ বা সান্নিধ্য সে পায়নি। বাবা অদৃশ্য হয়ে গেছে, মাকেও সে খুব কম সময় দেখে। তার শিশুমন এখানকার ধরনধারণ বুঝতে পারে না, সেইজন্যই বোধ হয় নির্বাক হয়ে গেছে। সমবয়েসীদের মতন দৌড়োদৌড়ি বা খেলাধুলোও করতে চায় না সে।

একটু ফাঁক পেলেই চামেলি ওপরে চলে আসে। সন্ধের পর মায়েদেরও ওপরে আসার নিয়ম নেই। এ জন্য এ বাড়ির মালকিন হীরেমাসির কাছে সে এক দিন ধমক খেয়েছে। ঘর ফাঁকা দেখে ফিরে গেছে খদ্দের।

রাত বারোটার পর সদর বন্ধ হয়ে যায়। রাস্তায় টহল দেয় পুলিশ। এর পর আর কেউ আসবে না। শেষ বাবুটি বিদায় হলেই চামেলি ওপর থেকে মেয়ে নিয়ে আসে নিজের ঘরে। বেশির ভাগ দিনই ঘুমন্ত চাঁদনীকে কোলে নিয়ে আসতে হয়। কোনওদিন যদি চামেলির ঘরে হোল নাইট বাবু থাকে, চামেলির সারাক্ষণ অস্বস্তি হয়। তার শরীরটা শুয়ে থাকে এক অচেনা পুরুষের পাশে, মন চলে যায় মেয়ের কাছে। এক দিন কী কারণে যেন চাঁদনী ঘুমের মধ্যে ভয় পেয়ে নীচে নেমে এসেছিল রাত তিনটের সময়। সেদিন চামেলির ঘরে হোল নাইট বাবু রয়েছে,

দরজা খুলে মেয়েকে দেখে তাকে আবার ওপরে পাঠিয়ে দিতে বুক ভেঙে গিয়েছিল চামেলির।

ভবিষ্যতে মেয়ের কী হবে ? দুনিচাঁদ তার মেয়েকে স্কুলে পড়িয়ে ভদ্রঘরের মেয়ে হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিল, তাকেও চামেলির মতন এ লাইনে নামাতে হবে ? না না না, তা কিছুতেই হয় না। হে ভগবান, একটা পথ দেখিয়ে দাও!

চামেলির এখনও আশা, দুনিচাঁদ হঠাৎ এক দিন ফিরে আসবে। নিউ ব্যারাকপুরের বাড়িতে চামেলিকে দেখতে না পেয়ে সে কি এ পাড়ায় খোঁজ নিতে আসবে না ? নিশ্চয়ই আসবে। পদ্মরানির ফ্ল্যাটে খোঁজ করলে কুলসম-বীণারা চার নম্বর বাড়ির সন্ধান দিয়ে দেবে।

চামেলি আবার এ লাইনে ফিরে এসেছে দেখে দুনিচাঁদ যদি রেগে যায় ? তাকে ঘেন্না করে ? করুক! চামেলির জীবন এভাবেই কাটবে, কিন্তু দুনিচাঁদ মেয়েকে নিশ্চিত ফেরত নিয়ে যাবে। তার অত আদরের মেয়ে, সে তো নষ্ট হয়নি। চামেলি তাকে কিছুতেই নষ্ট হতে দেবে না।

প্রায়ই সকালবেলা চামেলি মেয়েকে শেখায়, ঘুমোবার আগে রোজ স্বপ্নপরীকে ডাকবি। বলবি, স্বপ্নপরী, স্বপ্নপরী, তোমার পায়ে ধরি, দেখা দাও, একবার দেখা দাও!

চামেলি নিজেও তার স্বপ্নপরীকে-ডাকে। ভগবানকে ডাকে। কেউ সাড়া দেয় না। বছরের পর বছর কেটে গেল, দুনিচাঁদও ফিরে এল না।

চাঁদনী ন বছর পেরিয়ে দশে পা দিয়েছে, বেশ ডাগর চেহারা হয়েছে। নতুন করে চিন্তা শুরু হয়েছে চামেলির। এই বয়েসটাই ভয়ের। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই সে জানে, মেয়েরা এই বয়েসে পড়লেই পুরুষরা নজর দিতে শুরু করে। বয়স্করা জড়িয়ে ধরে স্নেহ দেখাবার ছলে। মেয়েরাও চঞ্চল হয়ে যায়, কারুর মিষ্টি কথা শুনলেই ভুলে যায়। চাঁদনীর বয়েসী এ বাড়ির মেয়েরা কুৎসিত গালাগালি শিখে গেছে, যেন নারী-পুরুষের শরীরের সম্পর্ক তারা বোঝে।

একতলায় মুখোমুখি দুখানা ঘরে থাকে জবা আর সোহাগী। ওরা মা আর মেয়ে। জবার মা পদ্মাও নাকি এ বাড়িতে ছিল। ওদের দুজনকে দেখলেই চামেলি শিউরে ওঠে। তার মেয়ের অদৃষ্টেও এরকম লেখা আছে ?

এক দিন বিকেল চারটের সময় চামেলির ঘরে দুটি বাবু এল। এরকম সময় সাধারণত বন্ধ-মাতাল ছাড়া কেউ আসে না। সন্ধের পরই এখানে মাংসের বাজার খোলে।

এই বাবু দুটি এক ফোঁটা মদ খায়নি, নেহাতই ছোকরা, মনে হয় যেন কুড়ি-বাইশ বেশি বয়েস নয়। তেমন শীত পড়েনি, তবু ওরা এসেছে প্যান্ট-কোট পরে, দুজনেরই মুখে পাতলা দাড়িগোঁফ। ঠোঁটে সিগারেট।

লালুরাম বারান্দায় ঘুমোচ্ছিল, পায়ের আওয়াজ পেয়েই তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। দরদাম ঠিক হয়ে গেল, এক ঘণ্টার খদ্দের। মালের বোতল আনতে হবে? না। মাংস? না। ফ্রেঞ্চ ক্যাপ? না, তাদের সঙ্গে আছে। কিছুই লাগবে না। তারা যখন দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছে, লালুরাম মনে করিয়ে দিল, কাজের সময় কিন্তু একজনকে বাইরে দাঁড়াতে হবে।

ঘরে কোনও চেয়ার থাকে না। পুরু তোশকের বিছানা পাতা। একটা ড্রেসিং টেবিলের সামনে ছোট টুল। দেওয়ালে মদের কোম্পানির দুটো ক্যালেন্ডার, আর একটি লক্ষ্মী ঠাকুরের পট।

সবাই এসে বিছানার ওপর বসে, এই বাবু দুটি দাঁড়িয়ে রইল, মুখ ঘুরিয়ে ঘরের সব কিছু দেখল। চোখাচোখি করল নিজেদের মধ্যে।

চামেলি বলল, কই গো, বসো!

একজন বাবু বসল ড্রেসিং টেবিলের সামনের টুলে, একজন বলল, একটা মোড়াটোড়া কিছু নেই?

চামেলি বলল, কেন, আমার বিছানায় বসতে বুঝি ঘেন্না করে? সে হি হি করে হেসে উঠল।

এইসব অল্পবয়েসী ছোকরাদের ধরনধারণ সে জানে। একটা কিছু নিষিদ্ধ কাজ করার বীরত্ব দেখাবার জন্য আসে। এরা শরীর দেখতে চায়, তার বেশি কিছু না। যারা মাল খেয়ে নেশা করে না, তারা অনেকেই পুরোপুরি বসতে চায় না। বড়জোর একটু টেপাটেপি করে। কেউ কেউ দূর থেকে শরীর দেখেই চলে যায়। এ রকম অল্প বয়েসী ছোকরাদের পছন্দ করে চামেলি, তেমন খাটাখাটনি থাকে না।

অন্য বাবুটি সত্যি বসল না, দাঁড়িয়ে রইল দেওয়ালে ঠেস দিয়ে। চামেলি আঁচল ফেলে দিয়ে ব্লাউজের বোতাম খুলতে যেতেই একজন হাত তুলে বলল, এই এই, দাঁড়াও, ওসব দরকার নেই।

চামেলি ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল, তা হলে আর কী করতে হবে ? নাচ দেখতে এসেছ নাকি ? আমি নাচফাচ জানি না।

দাঁড়িয়ে থাকা বাবুটি বলল, তুমি নিয়মিত ব্লাড টেস্ট, মানে, রক্ত পরীক্ষা করাও ?

পদ্মরানির ফ্ল্যাটে থাকার সময় দু'-একবার রক্ত পরীক্ষা করানো হত বটে। বছরে একবার দু'বার একজন ডাক্তার এসে ছুঁচ ফুটিয়ে রক্ত নিয়ে যেত। এ বাড়িতে কেউ সে রকম কিছু বলেনি।

সে বলল, হ্যাঁ গো, হয়, রক্ত পরীক্ষা হয়।

বাবুটি বলল, কই, রিপোর্ট দেখি ! কাগজটা কোথায় ?

চামেলি বলল, অ মোলো যা। কাগজ কোথায় পাব, সে বোধহয় মাসির কাছে আছে। আমার বাপু শরীরে কোনও রোগভোগ নেই।

টুলে বসা বাবুটি বলল, কী করে জানলে তোমার কোনও রোগ নেই ? এমন অনেক মারাত্মক রোগ আছে, যার হয়, সে নিজেই অনেক দিন জানতে পারে না।

চামেলি কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। কুঁচকে গেল ভুরু। একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর সে উঠে গিয়ে সেই বাবুটির থুতনি ছুঁয়ে বলল, ওমা, এ যে মেয়ে !

আগন্তুক দু'জনেই খলখলিয়ে হেসে উঠল। যে দণ্ডায়মান, সে অপর জনকে বলল, তোকে কথা বলতে বারণ করেছিলুম না ! তোর গলার আওয়াজ শুনলেই বোঝা যায়। ধরা পড়ে গেলি তো !

একজন নয়, দু'জনেই যুবতী। ছোট করে চুল ছাঁটা, গোঁফ লাগিয়ে, কায়দা করে সিগারেট টানছিল বলে প্রথমটায় বোঝা যায়নি।

হাসতে হাসতেই একজন বলল, তোমার কাজের লোকটি কিন্তু ধরতে পারেনি !

চামেলি হাসল না। গম্ভীরভাবে বলল, তোমরা কেন এসেছ ? আমার কাছে ওসব হবে না। টাইম নিয়েছ। পয়সা দিয়ে যেতে হবে।

সে বলল, ঠিক আছে, পয়সা দিয়ে যাব ! আমরা 'ওসবের' জন্য আসিনি। কিছু কথা বলতে এসেছি। আমার নাম শ্রীলেখা, ওর নাম দীপা। আমাদের একটা সংস্থা আছে, তার তরফ থেকে কিছু জানতে চাই। তোমার নাম তো চামেলি, তাই না ?

দীপা বলল, আচ্ছা চামেলি, তুমি কী জান, এডস্ নামে একটা

সাঙ্ঘাতিক রোগ আছে ? আগে যৌন কর্মীদের মধ্যে সিফিলিস-গনোরিয়া খুব হত। সেসব রোগের ঠিকমতন চিকিৎসা করালে সুস্থ হওয়া যায়, ওষুধ আছে, এড্স-এর কিন্তু কোনও ওষুধ এখনও বেরোয়নি। হলে নির্ঘাৎ মৃত্যু। তোমার যদি এইচ আই ভি পজেটিভ হয়, মানে এই রোগের প্রথম দিকে তুমি টেরও পাবে না। তোমার কাছে যারা আসবে, তাদের মধ্যেও এই রোগ ছড়াতে পারে। পারে মানে, ছড়াবেই!

চামেলি বিবর্ণভাবে বলল, আমার ওই রোগ হয়েছে ?

দীপা বলল, হয়েছেই যে তা রক্ত পরীক্ষা না করলে বোঝা যাবে না। হবার সম্ভাবনা খুব বেশি। তোমাদের মতন যৌন কর্মীদের মাধ্যমেই এই রোগ ছড়ায়। শোনো, তোমাদের পাড়ায়, বড় রাস্তার মুখে যে পেট্রোল পাম্প আছে, তার উল্টোদিকে আমাদের সমিতির অফিস খুলেছি। সেখানে তুমি যদি আস, বিনা পয়সায় রক্ত পরীক্ষা করার ব্যবস্থা আছে। আমরা এ পাড়ার বাচ্চাদের জন্য স্কুলও খুলেছি, তোমার ছেলেমেয়ে আছে ?

পরদিন বেলা এগারোটায় মেয়ের হাত ধরে চামেলি চলে এল সেই সমিতির অফিসে। কাছেই একটা গাড়ি বারান্দার নীচে ফুটপাতে স্কুল বসেছে। অফিসঘরের মধ্যে ভদ্দরলোকদের বাড়ির তিনজন মেয়েমানুষ ব্যস্ত হয়ে কাজকর্ম করছে, তারা খাতির করে চামেলিদের চেয়ারে বসতে দিল।

এ লাইনে প্রায় বারো বছর কেটে গেল চামেলির। মাতাল, লম্পট, গুণ্ডা শ্রেণীর লোকই বেশি দেখেছে। তার মতন মেয়েদের সঙ্গেই কথা বলেছে। এই মেয়ে তিনটি সম্পূর্ণ বাইরের জগতের, এরা তাদের নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে কেন ? এর উত্তর পাওয়া সোজা নয়।

চাঁদনীর বাবার সাধ ছিল তার মেয়ে স্কুল পড়বে। হ্যাঁ পড়ছে তো, ফুটপাতের হলেও সেটা স্কুল। কিছু লেখাপড়া শিখলে মেয়ে অন্য লাইনে যেতে পারবে না!

দীপা আর শ্রীলেখার সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেছে চামেলির। দীপা সব কথা বেশ সহজ ভাবে বুঝিয়ে বলতে পারে। চামেলির রক্তে দোষ পাওয়া যায়নি। কিন্তু তাকে বলে দেওয়া হয়েছে, ফ্রেঞ্চ ক্যাপ ছাড়া কোনও বাবুর সঙ্গে বসবে না। তাতে খদ্দের একটু কম হয় হোক। বাড়ির অন্য মেয়েদেরও এটা বোঝাবার ভার চামেলির ওপর।

এক দিন দুপুরে ছাদের ঘরে এসে চামেলি দেখল, হরিয়া সেখানে চকলেট বিলি করছে। চাঁদনীর হাতেও একটা চকলেট। হরিয়া নিজের বাড়ি ছেড়ে এ বাড়িতে কেন ঘন ঘন আসে? পদ্মরানির ফ্ল্যাটে বাচ্চা রাখার কোনো ব্যবস্থাই নেই। এ পাড়ার কিছু কিছু কচি মেয়ে নাকি বিক্রি হয়ে মুম্বইতে চালান হয়ে যায়। হরিয়াটা এমনই অর্থপিশাচ, ওর অসাধ্য কিছু নেই।

সে চাঁদনীর হাত থেকে চকলেট্‌টা কেড়ে নিয়ে ফেলে দিয়ে বলল, খর্বদার, তুমি আমার মেয়েকে কিছু দেবে না!

হরিয়া রক্তচক্ষে নীচে নেমে গেল। কিন্তু বুক কাঁপতে লাগল চামেলির। দুনিচাঁদের সেই মারের প্রতিশোধ নেবার জন্য হরিয়া যদি চাঁদনীর সর্বনাশ করে দেয়? হরিয়াকে সে কী করে বাধা দেবে?

এই ভয়ের কথা দীপাকে জানাতে দীপা বলল, তুমি হরিয়ার নামে পুলিশকে জানিয়েছ? থানায় আগে থেকে ডায়েরি করে রাখ।

চামেলি বলল, পুলিশ? পুলিশ আমার মতন মেয়ের কথা শুনবে? ও বাড়িতে কুমকুমের ঘরে এক দিন কী ঝামেলা হয়েছিল, পুলিশ এসে ওর কাছ থেকে আড়াই হাজার টাকা নিয়ে গেছে। সবাই বলে, বাঘে ছুঁলে আঠের ঘা, আর পুলিশ ছুঁলে বাহান্ন ঘা!

একটা রিকশা ডেকে দীপা বলল, চল, আমার সঙ্গে। পুলিশ তোমাদের কথা শুনবে না ভেবে নিয়ে ভয়ে ভয়ে থাক বলেই পুলিশ তোমাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে নিয়ে যায়। পুলিশের কাছে নালিশ জানাবার আমার যেমন অধিকার আছে, তোমারও সেইরকম অধিকার আছে।

থানা থেকে বেরিয়ে এসে চামেলি বলল, তুমি আমার সঙ্গে ছিলে বলে বড়বাবু সব কথা শুনল! আমি একলা এলে পাত্তাই দিত না।

দীপা বলল, এক দিন তুমি একলা এস। যদি পাত্তা না দেয়, আরও ওপর মহলে যাবে। খবরের কাগজে চিঠি লিখবে।

চামেলি ফ্যাকাসেভাবে হেসে বলল, হা কপাল! আমি কি লেখাপড়া জানি!

দীপা বলল, তোমার মেয়ে শিখছে। তাকে দিয়ে লেখাবে!

চামেলি হঠাৎ দীপার হাত জড়িয়ে ধরে বলল, ওগো দিদি, তোমরা আমাদের জন্য এত করছ, একটা ব্যবস্থা করে দাও না, আমি এ পাড়া

ছেড়ে চলে যাই। এ লাইনে আমার জীবন বিষময় হয়ে গেছে!

দীপা বলল, দেখ, সে সাধ্য আমাদের নেই। আমাদের ছোট্ট প্রতিষ্ঠান, তোমাদের রাখব কোথায়, কী কাজ দেব? সে অনেক টাকার ব্যাপার। আমরা শুধু চেষ্টা করছি, তোমাদের যথাসম্ভব স্বাস্থ্যের নিয়ম শেখাতে, আর তোমাদের ওপর যাতে কেউ অন্যায় অত্যাচার না করে সেটুকু দেখা! ভাল কথা, আমরা ছেলেমেয়েদের দিয়ে একটা নাটক করাচ্ছি। তোমার মেয়ে পার্ট করবে, তোমার আপত্তি নেই তো?

এক বছরের মধ্যে চাঁদনী দিব্যি বাংলা পড়তে-লিখতে শিখে গেছে। কোথায় যেন দলবেঁধে নাটকও করে এল। এখন তার আর সেই থমথমে ভাবটা নেই। ইস্কুলে কী কী পড়া হয়, তার গল্প শোনায় মাকে। কোনও একজন বড় দিদিমণি এসে বলে গেছে, এক দিন সবাইকে ডায়মন্ডহারবার বেড়াতে নিয়ে যাবে। এ বাড়িরই একটা ছেলে হাবু, সে ইংলিশ কবিতা মুখস্থ বলতে পারে।

হোল নাইটের বাবুরা চলে গেলেই সকালবেলা চাঁদনীকে নিজের ঘরে ডেকে আনে চামেলি। তাকে বই খুলে পড়তে বলে তার সামনে। চাঁদনী যখন জোরে জোরে পড়ে, তখন কেন যেন চোখে জল এসে যায় চামেলির। চাঁদনী কি উদ্ধার পাবে এখান থেকে? কে উদ্ধার করবে? চাঁদনী যে এখনও একবারও স্বপ্নপরীকে দেখেনি ঘুমের মধ্যে। এ সব বাড়িতে স্বপ্নেও ওরা আসে না?

দীপা এক দিন বলল, শোনো চামেলি, এই শনিবার সকাল দশটা থেকে শিশির মঞ্চে আমাদের একটা অনুষ্ঠান আছে। আমাদের স্কুলের ছেলেমেয়েরা যে-যার জীবনের কথা বলবে। একেবারে সত্যি কথা। তোমাকে কিন্তু যেতে হবে শুনতে। তুমি ওদের থিয়েটার দেখতে যাওনি।

চামেলি বলল, আমার যে ওসব জায়গায় যেতে লজ্জা করে। যদি লোকে চিনে ফেলে? চাঁদনীর মা কে, তা না হয় লোকে না-ই জানল!

দীপা বলল, এসব কথা লুকিয়ে রাখা যায়? লুকোবার চেষ্টার মধ্যেই দৈন্য ফুটে ওঠে। তুমি কি ইচ্ছে করে যৌন কর্মী হয়েছ? এই সমাজ তোমাকে ওই দিকে ঠেলে দিয়েছে। তারপর সমাজ তোমাদের দিকে চোখ বুজে থাকলেও তোমরা ছেড়ে দেবে কেন? বাঁচার জন্য তোমরা এই জীবিকা নিয়েছ, এর চেয়েও অনেক খারাপ জীবিকা সভ্যসমাজের অনেকে নেয়।

দশ বছর, এগারো বছর, বারো বছরের সব ছেলেমেয়ে, মঞ্চে এসে কিছু না-কিছু বলে যাচ্ছে। কেউ গান গাইছে, কেউ শোনাচ্ছে ছড়া। দু'একজন কিছুই বলতে না পেরে লজ্জায় পালিয়ে যাচ্ছে। চাঁদনীকে আজ শাড়ি পরিয়ে এনেছে চামেলি, তাকে দেখাচ্ছে কিশোরীর মতন।

মঞ্চে চাঁদনীর কথা শুনে চামেলি হতবাক। কোনও দ্বিধা নেই, আড়ষ্টতা নেই। এমন পরিষ্কার বাংলা বলতে সে শিখল কবে?

চাঁদনী বলল, আমার নাম চাঁদনী সাউ। আমার বাবা নেই, মা আছে। আমার বাবার কথা খানিকটা খানিকটা মনে আছে। বাবা বাড়ির মধ্যে খুব ভাল লোক ছিলেন, বাড়ির বাইরে খারাপ লোক ছিলেন। খারাপ লোকদের সঙ্গে মিশতেন। তারাই এক দিন বাবাকে মেরে ফেলেন। আমার মা আমার বাবার বউ ছিল, কিন্তু সে কথা কেউ মানে না। জ্যাঠামশাইরা আমাদের মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমার মা এখন একজন বারবনিতা। দীপামাসিরা অবশ্য বারবনিতা বলেন না, বলেন যৌন কর্মী। প্রতিদিন তিনজন কি চারজন পুরুষ আসে আমার মায়ের কাছে। যেদিন মোটে একজন কিংবা কেউই আসে না, সেদিন মাকে সবাই বকে। বাড়িউলি মাসি বলে, লোক না এলে খাবি কী! হরিয়া নামে একজন লোক আমাকে বলে, তুই তাড়াতাড়ি শুরু কর, মায়ের চেয়ে অনেক বেশি টাকা পাবি। হাবু আমাকে বলেছে, ছেলেরা ও বাড়ি থেকে ছিটকে বেরিয়ে যেতে পারে। মেয়েরা পারে না। বারবনিতার মেয়ে বারবনিতাই হয়। সমাজের সবাই আমাদের ঘেন্না করে, আমরা যেন নর্দমার প্রাণী।....

চাঁদনীর কথা শুনতে শুনতে চামেলির মতন আরও অনেকের চোখ সজল হয়ে এল।

শেষের দিকে, তখনও গানবাজনা চলছে, দীপা পেছন দিকের সিট থেকে চামেলিকে ডেকে নিয়ে গেল একেবারে সামনে। একজন বয়স্কা মহিলা প্রথম সারিতে বসে আছেন, ভারি চেহারা, মাথার অধিকাংশ চুলই সাদা, গায়ের রং একেবারে সোনার মতন, চক্ষু দুটি ভারি স্নিগ্ধ মায়াময়।

দীপা আলাপ করিয়ে দিয় বলল, চামেলি, ইনি হচ্ছেন মিসেস সোম। ইন্দ্রাণী সোম, খুব নামকরা বাড়ির মেয়ে, বিয়েও হয়েছে এক বিখ্যাত অধ্যাপকের সঙ্গে, এঁরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই দেশের অনেক কাজ করেন।

ইনি চাঁদনীর কথা শুনে খুব অভিভূত হয়েছেন। এখন থেকে ইনি চাঁদনীর লেখাপড়ার সব ভার নিতে চান। হস্টেলে থাকার খরচ দেবেন। তোমার আপত্তি নেই তো ?

ইন্দ্রাণী সোম স্মিতভাবে হাসলেন।

চামেলি কথা বলতে পারছে না। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার খালি মনে হচ্ছে, স্বপ্নপরীদেরও বয়েস বাড়ে, চামড়া কুঁচকে যায়, চুল পাকে ?

যৎসামান্য

একজন বসে প্রায় সর্বক্ষণ ক্যাশ মেলায়, আর একজন খবরের কাগজ পড়ে। বংশীবদন আর মুরলীধর। দু'জনেরই বয়েস উনচল্লিশ, ওদের নামের মানেও যে এক তা অবশ্য অনেক লোকই খেয়াল করে না। নাম একটা নাম, তার অর্থ নিয়ে ক'জন মাথা ঘামায়! চেহারা কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। বংশীবদনের মোটাসোটা ঘি খাওয়া চকচকে চেহারা, এর মধ্যেই মাথায় টাক পড়েছে, পেছনের চুল সামনের দিকে টেনে আঁচড়ায়। আর মুরলীধর ছিপছিপে ঢ্যাঙা, মাজা মাজা রং, মাথার ঝাঁকড়া চুল, ছ'মাসে ন'মাসে একবার কাটে। দু'জনের কারুকেই কলির কেষ্ট বলা যায় না।

ওরা দু'জন কাঠের কারবারের অংশীদার। বাগবাজারেব খালের ধারে ওদের অফিস কিংবা দোকান কিংবা গুদাম সব এক সঙ্গে। লোকে বলে ঠেক। বংশীবদন রোজ বাড়ি থেকে বেরুবার সময় বলে, দোকানে যাচ্ছি। আর মুরলীধর খেয়েদেয়ে, পান চিবুতে চিবুতে অফিসে বেরোয়। দোকান কথাটা তার স্ত্রী যমুনার পছন্দ নয়। অবশ্য কোনোটাই ভুল নয়। খালধারে অনেকখানি জায়গা তার দিয়ে ঘেরা, বড় বড় গাছের গুঁড়ি থেকে নানারকম কাঠ, তক্তা এক এক জায়গায় জড়ো করা। মস্ত বড় একটা দাঁড়িপাল্লাও মাটিতে গাঁথা আছে। এগুলো সব খোলা জায়গায়। তারপর টালি-ছাউনির বেশ বড় শেড। সামনের দিকটায় কয়েকখানা চেয়ার বেঞ্চ পাতা, পাইকার-খদ্দেররা এসে বসে, তারপর ক্যাশ কাউন্টার। একেবারে পেছন দিকে পুরনো আমলের কয়েকটা আরামকেদারা, তিনটি আলমারি

ও একটা ছোট টেবিলের ওপর টাইপ রাইটার। এই অংশটাকে অনায়াসেই অফিসঘর বলা যায়।

খদ্দেরদের জন্য কাঠ বাছাবাছি বা মাপামাপি করার জন্য দু'জন কর্মচারি আছে, মালিক দু'জনকে ওসব কাজে হাত লাগাতে হয় না। বংশীবদন বসে ক্যাশ কাউন্টারের উঁচু চেয়ারে, আর মুরলীধর পেছন দিকের ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে থাকে. খদ্দেরদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলে না। দু'জনেই সমান অংশীদার, কিন্তু দায়িত্বভাগ অসমান। বংশীবদন স্থূল চেহারা নিয়েও ছটফটে স্বভাবের. প্রথমে এসেই সে কুলুঙ্গিতে গণেশের মূর্তির সামনে ধূপধুনো দেয়, চৌকাঠে গঙ্গাজল ছিটোয়, ফুলঝাড়ু বুলোয় কাউন্টারে, সব খদ্দেরদের সঙ্গে সে-ই দরদাম করে, মাঝে মাঝে বাইরে গিয়ে স্টক মেলায়। আর প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সে ক্যাশের টাকা গোনে, পাঁচ টাকা-দশ টাকা পঞ্চাশ-একশো টাকার নোটগুলো আলাদা করে রাখে। টাকা ঘাঁটাঘাঁটি করতেই সে ভালোবাসে। দুপুরবেলা চা আনবার সময় সে অনেক বেছে বেছে সবচেয়ে ময়লা নোটটা বার করে দেয়। আর মুরলীধরের একমাত্র দায়িত্ব বড় বড় কোম্পানির অর্ডার এলে বিল টাইপ করা। তখন সে টাইপ মেশিনে বসে. আধ ঘণ্টার বেশি লাগে না। সে কাজও থাকে না প্রায় দিনই। সে ইজিচেয়ারে পা ছড়িয়ে আধশোওয়া হয়ে একটা বাংলা খবরের কাগজ পড়ে তন্নতন্ন করে। সমস্ত বিজ্ঞাপন, কর্মখালি, পাত্র-পাত্রী সংবাদ কিছুই বাদ দেয় না। একবার শেষ হয়ে গেলে আবার।

এই সামান্য কাজের জন্য মুরলীধরের তো রোজ না এলেও চলে। কিন্তু রোজ দুপুরে বাড়িতে শুয়ে শুয়ে কাগজ পড়লে মান থাকে না। পাড়া-পড়শিদের মধ্যে সমস্ত পুরুষ মানুষই অফিসে যায় কিংবা কাজে যায়। যমুনা তার স্বামীকে এক আধদিন ছুটি নিতেও দেয় না। সে রোজ না গেলে বংশীবদন যদি কারবারটা হাতিয়ে নেয়? মুরলীধরের তুলনায় বংশীবদন অনেক বেশি ধুরন্ধর, কাঠের কারবারের অন্ধিসন্ধি সব সে জানে। সব সময় চোখে-চোখে না রাখলে যে কোনোদিন সে মুরলীধরকে গলাধাক্কা দিতে পারে।

মুরলীধর প্রথম প্রথম যমুনাকে বোঝাবার চেষ্টা করতো যে বংশীবদন তার ন্যাংটো বয়েসের বন্ধু. দু'জনে একসঙ্গে খেলাধুলো করেছে, এক স্কুলে পড়েছে। সে কখনো মুরলীধরকে ঠকাবে না। তা শুনে যমুনা

হেসেছে। টাকা-পয়সার ব্যাপার নিয়ে কত বন্ধু যে বন্ধুকে পেছন থেকে ছুরি মারে, তাও মুরলীধর জানে না ? বন্ধুকে বেশি বেশি বিশ্বাস করলে একদিন হয়তো পথে বসতে হবে !

কারবারটা শুরু করেছিলেন অন্য দুই বন্ধু। এদের দু'জনের দুই বাবা। মুরলীধরের বাবা হরিদাস নিজে সুন্দরবনে নিয়মিত যাতায়াত করে·বড় বড় নৌকো ভরে কাঠ নিয়ে আসতেন। তখন বাগবাজারের খাল চালু ছিল। এই খাল দিয়ে লঞ্চ চলতো। এখন সে খাল মরে হেজে গেছে। নামেই শুধু খাল। বংশীবদনের বাবা মধুসূদন অফিসপাড়া ঘুরে ঘুরে জোগাড় করে আনতেন অর্ডার। অক্লান্ত পরিশ্রমে দুই বন্ধু ব্যবসাটা দাঁড় করিয়ে গেছেন, কেউ কারুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। তখনকার পুরুষরা বউদের কথায় কর্ণপাত করতো না।

দুই বাবাই গত হয়েছেন। আগেকার মতন কারবারের রমরমা আর নেই। কাঠের দাম খুবই বেড়েছে, সেই তুলনায় চালানি কম। একটা করাত বসানো হয়েছে, গুঁড়ির চেয়ে তক্তা বেচে মুনাফা বেশি। সারা মাসে যা লাভ হয়, তাতে মোটামুটি দুটো সংসার চলে যায়। প্রতিদিন ক্যাশ বন্ধ করার সময় মুরলীধর একবার জিজ্ঞেস করে, আজ কত হলো রে বংশে ? উত্তরটা শোনা না শোনা একই কথা। বংশীবদন যদি কমিয়ে বলে, তা সে ধরতেও পারবে না।

একদিন দুপুরবেলা আড়াইটের সময় মুরলীধরের জীবনে ওলটপালট ঘটে গেল।

মুরলীধর যথারীতি কাগজ পড়ছে, বংশীবদন বাইরের রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে একজন খদ্দেরের সঙ্গে কথার মারপ্যাঁচ সেরে সবে ফিরে এসেছে ক্যাশকাউন্টারের কাছে। এই সময় কম্পানির খরচে চা ও দুটি করে বিস্কুট আনানো হয়, খদ্দেরটির জন্যও চা আনাবে কি আনাবে না ভাবছে বংশীবদন, হঠাৎ মুরলীধর উত্তেজিতভাবে বলে উঠলো, ওরি ব্বাস, কী সাংঘাতিক ব্যাপার ! বংশে, একবার এদিকে আয়, এদিকে আয়

বংশীধর চমকে উঠে হন্তদন্ত হয়ে সে দিকে গিয়ে বসলো, কী হয়েছে, কী ব্যাপার ?

মুরলীধর খবরের কাগজটা তুলে ধরে বললো, এই জায়গাটা একবার পড় !

বংশীবদন ভুরু কুঁচকে তাকালো। খবরের কাগজটাও কেনা হয়

ম্পানির পয়সায়। বাবাদের আমল থেকেই চলে আসছে। বংশীবদন
কবার শুধু হেড লাইনগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নেয়, বেশি পড়ার
র্য তার নেই। মুরলীধরই কাগজের দাম উসুল করে নেয় সুদে আসলে।
বংশীবদন বললো, কোন্ জায়গাটা পড়বো? কী আছে?
মুরলীধর এক জায়গায় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললো, শুধু এই
াইনটা পড়।
বংশীবদন পড়লো, "ইন্দিরা গান্ধী দৃঢ়ভাবে বললেন, আমি আমার
াতাকে চিনি না, কে কে তেল দিয়ে ঘুমোয় অথচ সবজান্তার ভাব
রে, তা আমি তাঁর থেকে বেশি বুঝি। দলের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য...."
মুরলীধর বললো, ব্যস, ব্যস, আর পড়তে হবে না। ওতেই হবে।
বংশীবদন বিমূঢ়ভাবে বললো, তুই এটা হঠাৎ আমায় পড়তে বললি
কন?
মুরলীধর মুচকি হেসে বললো, কী বুঝলি?
বংশীবদন বললো, কী বুঝলুম মানে? যা লেখা আছে।
মুরলীধর বললো, এতে লেখা আছে, ইন্দিরা গান্ধী বলছেন, তিনি
ার বাপকে চেনেন না! এ কখনো হয়?
বংশীবদন চোখ বড় বড় করে একটুক্ষণ চিন্তা করার পর বললো,
াই তো, নিজের বাপকে চিনি না, এ কথা তো কেউ বলে না। মেয়ে
য়ে বাপকে চেনে না? নিশ্চয়ই কিছু ছাপার ভুল হয়েছে।
মুরলীধর বললো, ভুল তো হয়েছেই। কিন্তু কী ভুল বল তো!
াসল কথাটা কী হবে?
বংশীবদন কাগজটায় আর একবার চোখ বুলোলো। বুঝতে পারলো
া। এসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তার মাথা ঘামাতেও ইচ্ছে করে না।
সে চঞ্চল হয়ে বললো, মুরুলি, তুই এখন চা খাবি তো? চা আনাই!
মুরলীধর বললো, হ্যাঁ, চা খাবো। আমি পয়োঁরো মিনিট ধরে
াবছি, কী ছাপার ভুল হয়েছে। এই মাত্তর বুঝতে পারলুম! আসল
ান্টেন্সটা কী হবে জিনিস? ইন্দিরা গান্ধী দৃঢ় ভাবে বললেন, আমি
ামার পিতাকে চিনি, নাকে কে তেল দিয়ে ঘুমোয়—'
বংশীবদন বললো, ঠিক ঠিক। আমি আমার পিতাকে চিনি।
মুরলীধর হো হো করে হেসে উঠে বললো, কমা, একটা ছোট্ট কমা
দিক ওদিক হয়ে গেছে! তাতেই এই কাণ্ড!

বংশীবদন ফিরে গিয়ে ক্যাশ থেকে একটা জিরজিরে পাঁচ টাকার নোট বার করে হেঁকে বললো, জগুয়া, চায়ের কেটলিটা নিয়ে যা—

মুরলীধর একটু বাদে আবার বললো, দ্যাখ বংশে, একটা কমা, একতিলের মতন, কতটুকুই বা জায়গা নেয়, তার কী শক্তি ! বাপের নাম পর্যন্ত ভুলিয়ে দিতে পারে।

বংশীবদন একটু হে হে হাসি দিয়ে টাকা গোনায় মন দিল।

চা পর্ব শেষ হতে না হতে কাঠের চালানি এলো এক ট্রাক ভর্তি। বাইরে চলে গেল বংশীবদন, এখন সব মিলিয়ে নিতে হবে। মুরলীধরের ভ্রূক্ষেপ নেই, সে আবার কাগজ পড়ায় মন দিয়েছে।

বিকেলের দিকে মুরলীধর কাউন্টারের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললো, জানিস বংশে, আজ আমি যত কাগজ পড়ছি, তত মজা লাগছে। একটা কমা এদিক ওদিক হয়ে গেলে পুরো মানে বদলে যায় ! হ্যাঁ-টা না হয়ে যায় ; ভেরি ডেঞ্জারাস !

বংশীবদন বললো, হুঁ হুঁ।

মুরলীধর বললো, আর একটা কথা মনে পড়লো। আমাদের ছেলেবেলায় যে-কোনো লেখার মধ্যে কয়েকটা সেমিকোলন থাকতো মনে আছে ? সেই সেমিকোলনটা কোথায় গেল ? খবরের কাগজের লেখায় তো আর সেমিকোলন দেখি না !

বংশীবদন বললো, তা বটে !

মুরলীধর বললো, সেমিকোলনের দরকারটা কি ফুরিয়ে গেছে ?

বংশীবদন বেগুনভাজার মতন মুখ করে বললো, ওরে মুরলি, আমার অনেক কাজ, ভাউচারগুলো সব মেলাতে হবে। কথা বলার সময় নেই। তুই কাগজটা মুখস্থ করগে যা।

মুরলীধর বললো, আকাশে কোদালি মেঘ করেছে। চ আজ শিগগির শিগগির বাড়ি যাই ! আমাকে একশোটা টাকা দে তো !

বংশীবদন বললো, আবার অ্যাডভান্স ? সোমবার নিয়েছিস। হপ্তায় একবারের বেশি অ্যাডভান্স নেওয়া চলবে না। আমরাই নিয়ম করেছি। আজ তো ভাই হবে না !

মুরলীধর বললো, ধুত্তোর নিকুচি করেছে তোর নিয়মের। ক্যাশে যদি দুশো টাকা থাকে, তার হাফ আমি যে-কোনো সময় নিতে পারি। আমি হাফ-পার্টনার না ?

বংশীবদন এবার কান এঁটো করা চওড়া হেসে বললো, তোর মাথায় একটা কথা কিছুতেই ঢোকে না মুরুলি ! ক্যাশে যা থাকে, তার সবটাই প্রফিট নয়। মূলধন খেয়ে ফেললে ব্যবসা দু'দিনেই ডকে উঠবে। আজ যে মাল ডেলিভারি দিয়ে গেল, তার জন্য কাল সকালেই পেমেন্ট করতে হবে না ? ব্যাঙ্ক থেকে আরও তুলতে হবে।

মুরলীধর একটু দুর্বল হয়ে গিয়ে মিনমিনে গলায় বললো, একশোটা টাকা দিবি না ? যমুনা যে এক কৌটো পাউডার, কোয়ার্টার পাউন্ড মাখন আর আড়াই শো চা কিনে নিয়ে যেতে বলেছে। হাতে কিছু নেই।

এক তাড়া নোটের থেকে একটা ময়লা একশো টাকার নোট টেনে বার করে বংশীবদন বললো, এই নে, খাতায় সই কর।

কলমটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে মুরলীধর বললো, সেমিকোলনটা কেন উঠে গেল বল তো ?

বংশীবদন এবার ধৈর্য হারিয়ে বিকৃত গলায় বললো, ওরে শালা, আমি এসব কী জানি ? কেন আমায় জ্বালাচ্ছিস !

মুরলীধর বললো, তোর নাম বংশীবদন। যদি ভুল করে মাঝখানে একটা কমা পড়ে যায়, তা হলে দুটো মানুষ হয়ে যাবে। বংশী আর বদন ! কী ডেঞ্জারাস !

বংশীবদন বললো, ওরে ক্ষ্যামা দে ! ক্ষ্যামা দে ! আমি আর পারছি না।

মুরলীধর মাথা নাড়তে নাড়তে বললো, না, না, সিরিয়াস ব্যাপার, পুঁচকে ব্যাঙাচির মতন একটা কমা, তার কী ক্ষমতা রে বাপ রে বাপ !

ঠিক ছ'টার সময় ঝাঁপ বন্ধ হয়। দুটো তালা দেবার পর এক গোছা প্যাঁকাটি জ্বেলে সেখানে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বংশীবদন একটুক্ষণ কী যেন বিড়বিড় করে। একজন নেপালি দারোয়ান বাইরে খাটিয়া পেতে শোয়। দামি দামি কাঠ তো বাইরেই থাকে। পাশে পাশে আরও তিনটি এরকম কাঠের ঠেক, সব জায়গাতেই বন্দোবস্ত আছে পাহারার।

দু'জনে খানিকটা হেঁটে যাবার পর পথ আলাদা হয়ে যায়। বংশীবদন যায় শ্যাম পার্কের দিকে, মুরলীধরের বাড়ি হাতিবাগান পেরিয়ে ভীম ঘোষ লেনে। প্রায়ই যমুনার কিছু না কিছু ফরমাস থাকে, শ্যামবাজারের মোড় থেকে কেনাকাটি করে মুরলীধর হেঁটেই বাড়ি যায়।

আকাশে গুম গুম করে মেঘ ডাকলো।

স্টার থিয়েটারের কাছে কিসের যেন একটা জটলা বেঁধেছে, থেমে গেছে ট্রাম বাস। মুরলীধরের ভ্রূক্ষেপ নেই। সে ভিড় পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। কে যেন চেঁচিয়ে ডাকলো, ও মুরুলিবাবু, ও মুরুলিবাবু! তবু মুরলীধর মুখ ফেরালো না, কোনো লোকের সঙ্গেই তার এমন কিছু জরুরি বিষয়ের সম্পর্ক নেই, যাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে হবে। ভিড় তার সহ্য হয় না।

বাড়ি ফিরতে দেরি করলে যমুনা মুখ ভার করবে।

বউয়ের কাছে নানা ব্যাপারে মুরলীধর অপরাধী হয়ে আছে। কিংবা অপরাধ বোধ করাই তার স্বভাব। অনেক সময়েই মনে হয় কী যেন একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে, কী যেন একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে। কিছু একটা করা উচিত ছিল, সেটা মনে পড়ছে না।

যমুনা প্রায়ই বলে, তুমি যে সারাদিন বাড়িতে থাকো না, আমি সময় কাটাই কী করে বলো তো?

মুরলীধর এ কথার উত্তর খুঁজে পায় না। মা-মাসি-পিসিদের মুখে সে এরকম কথা কখনো শোনেনি। কর্তারা বাড়ির বাইরেই বেশিক্ষণ সময় কাটাতেন, আর মা-মাসি-পিসিরা সকাল থেকে রান্না-বান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। ঘোর দুপুরে ডাঁটা-চচ্চড়ি আর মাছের মুড়ো চিবিয়ে চিবিয়ে খেতেন অনেকক্ষণ ধরে। তারপর এক ঘুম, বিকেলে একটু ঝগড়াঝাঁটি, ছেলেমেয়েদের একটু চড়-চাপড়, তারপর আবার রান্নার তোড়জোড়। বাড়ি থেকে বেরুতেন কালেভদ্রে।

এখন দিন কাল পাল্টেছে। পরিবারটি ছোট হয়ে গেছে অনেক। মুরলীধরের ভাই নেই, দুই বোন ছিল, একজনের বিয়ে হয়েছে কানপুরে, আর একজন, মুরলীধরের বড় আদরের ছোটবোন বীণাপাণি মারা গেছে গাড়ি চাপা পড়ে। তার বিয়ের কথাবার্তা প্রায় ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল।

এখন বাড়িতে শুধু মা আর বউ। মা বড় বেশি বুড়িয়ে গেছেন, চোখে প্রায় দেখতেই পান না। বীণাপাণির শোক সামলাতে পারেননি, এখন প্রায়ই আপনমনে বিড়বিড় করেন, কান পাতলে বোঝা যায় বীণাপাণির সঙ্গে কথা বলছেন। যমুনাকে রান্নাবান্নার ঝামেলা বেশি পোহাতে হয় না, একজন ঠিকে মেয়ে মায়ের রান্না করে দিয়ে যায়, যমুনাকে শুধু মাছের ঝোল বা মাংস করে নিলেই চলে। দুপুরে ঘুমোয় না যমুনা, বই পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে যায়।

যমুনা গরিব বাড়ির লেখাপড়া জানা মেয়ে। বাপের বাড়ির দিকে সবাই বাঙাল, এ বাড়ির ধারার সঙ্গে অনেক কিছুই মেলে না। বিয়ের পর বছরখানেক বাদেই সে বায়না ধরেছিল চাকরি করবে। তখনো মুরলীধরের বাবা বেঁচে, তিনি এক কথায় উড়িয়ে দিয়েছিলেন। লোকে চাকরি করতে যায় অভাবে পড়লে। এ বাড়িতে ভাত-কাপড়ের অভাব নেই, তবু ঘরের বউ ট্রামে-বাসে গুঁতোগুঁতি করে চাকরি করতে যাবে কেন ? তা ছাড়া, এ দেশে তো অঢেল চাকরি নেই। যমুনা শখের চাকরি করতে গেলে আর একটি অভাবী মেয়েকে বঞ্চিত করা হবে।

বাবার মৃত্যুর পর নতুন করে যমুনা আবার দাবি তুলেছিল। মুরলীধর আপত্তি করেনি। কিন্তু যমুনা অনার্সহীন গ্র্যাজুয়েট, ভদ্রগোছের চাকরি জোটানো সহজ নয়। একটা সাবানের কম্পানিতে কেরানির চাকরি পেয়েছিল কোনওক্রমে, মাস তিনেক পরে একদিন কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলো। কী যে হয়েছিল কে জানে, আর যায়নি।

যমুনার আসল অভাবটি অবশ্য অন্য। বংশীবদন প্রায়ই বন্ধুকে বলে, ওরে মুরুলি, বউ সামলানো কি সোজা কথা ? ওদের সব সময় খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে হয়। শাড়ি কেনার টাকা দিবি, গয়না গড়িয়ে দিবি। মাঝে মাঝে বায়স্কোপ-থিয়েটারে নিয়ে যাবি, আর দু'তিন বছর পর পর কোলে একটা বাচ্ছা দিবি। ঐ শেষের উপহারটাই কিছুতে দেওয়া যাচ্ছে না। বারো বছর বিয়ে হয়েছে, এখনো যমুনার কোনও সন্তান হয়নি। মুরলীধরের দিক থেকে চেষ্টার কোনও ত্রুটি নেই।

বাড়ি ফিরে মুরলীধর দেখলো, বৈঠকখানায় দু'জন অতিথি বসে আছে।

বাড়িতে অতিথি এলে মুরলীধর খুশি হয়। যমুনা তবু কথাবার্তা বলার মানুষ পায়। যেদিন কেউ আসে না, সেদিন যে-কোনও ছুতোয় মুরলীধরের খানিকটা বকুনি প্রাপ্য থাকে।

বসবার ঘরে না ঢুকেও পাশের একটা দরজা দিয়ে ওপরে ওঠা যায়। ছোট বাড়ি, একতলায় ঐ বসবার ঘর আর রান্নাঘর, কলঘর, দোতলায় দু'খানি বেড রুম, তিনতলায় একটা ঘর আর ঠাকুর ঘর একসঙ্গে, মা থাকেন সেখানে। সেখানেও একটা বাথরুমের ব্যবস্থা করা আছে, মাকে আর নিচে নামতেই হয় না।

মুরলীধর আড়চোখে দেখে নিল, যমুনার বাপের বাড়ির লোক

এসেছে, তার মাসতুতো বোন শ্যামলী আর তার বর জগদীশ, যমুনা তাদের সঙ্গে কথা বলে চলেছে। মুরলীধর ওদের অলক্ষে দোতলায় উঠে গেল।

প্রতিদিন বাড়ি ফিরে সে একবার মায়ের সঙ্গে দেখা করে। সে যা জিজ্ঞেস করে আর মা যা উত্তর দেন, তার মধ্যে কোনও সঙ্গতি নেই, তবু তো দু'চারটে কথা হয়। তারপর সে কলঘরে হাতমুখ ধুতে যায়।

চৌবাচ্চায় জল ধরা থাকে, ঢুকলেই শ্যাওলার গন্ধ পাওয়া যায়। মুরলীধর জল ঢালতে ভুলে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। আজকের খবরের কাগজে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্পর্কে একটা আর্টিকেল বেরিয়েছে। তার একটা বাক্য অনবরত ঘুরছে মুরলীধরের মাথায়। খুব খটকা লেগে আছে। 'দেবতার পায়ের কাছে শুধু গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল, দিও না নিজের অন্তরের সব ভক্তি উজাড় করে, বরং নিজেকেই প্রস্ফুটিত করে তোলো।' এ বাক্যটার মানে কী? রামকৃষ্ণদেব দেবতাকে শুধু ফুল দিয়ে অন্তরের ভক্তি উজাড় করে দিতে নিষেধ করছেন? এ কখনও হতে পারে? নিশ্চয়ই কমার গোলমাল আছে। কিন্তু গোলমালটা কোথায়?

হঠাৎ সব সরল হয়ে গেল। প্রথম কমাটা ফুলের পর বসবে না, দিও না'র পরে হলেই সব ঠিকঠাক হয়ে যায়। দেবতার পায়ের কাছে শুধু গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল দিও না, নিজের অন্তরের সব ভক্তি উজাড় করে, বরং নিজেকেই প্রস্ফুটিত করে তোলো। হ্যাঁ, এটাই ঠিক। কী অলক্ষুণে কাণ্ড, অ্যাঁ? রামকৃষ্ণদেবের কথা পর্যন্ত উল্টে দেবার শক্তি ধরে একটা ঐ একরত্তি কমা! দ্বিতীয় কমাটা না হলেও চলতো। উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। ছাপাখানার লোকেরা অতি সাবধান না হলে যে একটা কমার জন্য উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপতে পারে।

সমস্যাটার সমাধান হয়ে যাবার পর বেশ প্রফুল্ল বোধ করল মুরলীধর। তখনই বাথরুমের টিনের দরজায় ধাক্কা। যমুনা বলল, জলের শব্দ নেই, কোনও শব্দ নেই, বাথরুমে ভূতের মতন দাঁড়িয়ে কী করছো?

দরজা খুলে মুরলীধর বলল, এই তো হয়ে গেছে।

প্রতিদিন সন্ধেবেলা যমুনা একটু সেজেগুজে থাকে। গা ধুয়ে পাউডার মাখে, খোঁপা বাঁধে, পাট ভাঙা শাড়ি পরে। শরীরের গড়ন ভালো, এখনো তাকে নতুন বউটির মতন দেখায়।

ধারালো জিভে সে জিজ্ঞেস করল, চা আনতে বলেছিলাম, নিশ্চয়ই ভুলে গেছ ?

মুরলীধর বলল, না গো, এনেছি। চা, তোমার পাউডার, মাখন।

যমুনা বলল, জগদীশরা এসেছে, তাদের সঙ্গে একবার দেখাও করলে না ? কী আক্কেল গো তোমার ?

মুরলীধর অপরাধীর মতন বলল, যাচ্ছি গো, এই এখনই যাচ্ছি। জামাটা ঘেমো হয়ে গেছে, পাল্টে নিয়ে—

যমুনার বাপের বাড়ির লোকদের সঙ্গে কী যে কথা বলবে তা ভেবে পায় না মুরলীধর। জগদীশ কী একটা ওষুধ কোম্পানির দালালি করে, কথায়-বার্তায় অতি তুখোড়। সারা শহর চষে বেড়ায়, মফস্বলেও যায়। রোজগারপাতি ভালোই মনে হয়। জগদীশের তুলনায় তার বউ শ্যামলী যেন নিষ্প্রাণ ধরনের। কথা বলতে চায় না, মুখখানা ফ্যাকাসে, হাসতেও যেন তার কষ্ট হয়।

মনে হয়, বেশ কিছুক্ষণ আগেই এসেছে ওরা। সামনে দুটি প্লেট, আধভাঙা সিঙ্গাড়া আর সন্দেশের গুঁড়ো পড়ে আছে। একবার চাও দেওয়া হয়ে গেছে। জগদীশ সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে বলল, নিন, কাঠের কারবার কেমন চলছে বলুন ?

মুরলীধর যে ধূমপান করে না, এতবার এসেও তা মনে রাখতে পারে না জগদীশ।

মুরলীধর বলল, মন্দ না। দিনকাল যে-রকম পড়েছে, তারই মধ্যে কোনও রকমে—। তা আপনার কাজ-কর্ম সব চলছে ঠিকঠাক ?

এর মধ্যে যমুনা ঘরে ঢুকে তার কোন্ মাসি বেহালায় জমি কিনছে, সেই আলোচনা শুরু করল। এ বিষয়ে মুরলীধরের কিছু বলার নেই। সে চুপ।

খানিকক্ষণ বাদে যমুনা বলল, তুমি কোনও কথা বলছ না কেন ?

মুরলীধর যেন ঘুম ভেঙে হঠাৎ জেগে উঠে বলল, ও হ্যাঁ। এই তো ? আচ্ছা জগদীশবাবু, আপনার মনে আছে, আগে বাংলা লেখার মধ্যে অনেক কমা আর সেমিকোলন থাকত। এখন সেমিকোলন প্রায় দেখাই যায় না, তাই না !

জগদীশ চোখ সঙ্কুচিত করে কয়েক পলক তাকিয়ে রইল মুরলীধরের দিকে। তারপর বলল, হ্যাঁ, তা যা বলেছেন !

মুরলীধর বলল, সেমিকোলন মানে আদ্ধেক কোলন। ফুটকি আর কমা। আর কোলন হচ্ছে দুটো ফুটকি। সেই কোলনও কি আজকাল চোখে পড়ে ? আজকের আনন্দবাজার খুলে দেখুন, একটাও সেমিকোলন নেই, শুধু কমা, অনেক কমা। কমা ওদের হঠিয়ে দিয়েছে।

জগদীশের এবার চোখ বড়বড় হয়ে গেল। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এ তো মশাই খুব জ্ঞানের কথা। আপনি লার্নেড লোক। ওগো, ওঠো, বাড়ি, যাবে না ? শ্যালদায় গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে।

জগদীশরা বিদায় নেবার পর যমুনা জিজ্ঞেস করল, তুমি কমা, সেমিকোলন এসব কী বলছিলে ?

মুরলীধর গম্ভীরভাবে বলল, কোলন, সেমিকোলন উঠিয়ে দিয়ে শুধু কমা দিয়ে সব কাজ চালানো খুব ডেঞ্জারাস, কখন যে কী হয়ে যায় !

সেদিন থেকে মুরলীধরের মাথায় যেন ভূত চাপল। সর্বক্ষণ ঐ এক চিন্তা। অন্য যে-কোনও প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কমা-সেমিকোলনের কথা এসে পড়ে। তার মনে অনেক প্রশ্ন, কেউ তার উত্তর দিকে পারে না। খবরের কাগজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, কমার ব্যবহার ঠিক হয়েছে কি না। অকালমৃতা ছোটবোন বীণাপাণির খুব বই পড়ার শখ ছিল, তার সংগৃহীত বইগুলি এখনও রয়ে গেছে, মুরলীধর সেইসব বইও বারবার পড়ে।

রূপবাণী সিনেমার পাশের বড় ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকেন বাংলার অধ্যাপক চারুচন্দ্র মিত্র। মুরলীধরের সঙ্গে মুখ চেনা আছে। একদিন বাস স্টপে চারুচন্দ্রকে দেখে মুরলীধর বিনীতভাবে বলল, চারুবাবু, আপনার শরীর গতিক ভাল আছে তো ? একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?

চারুচন্দ্র উদারভাবে বলল, হ্যাঁ ভাল আছি। তবে মশাই, যা খুশি জিজ্ঞেস করতে পারেন, কিন্তু ছেলেকে কলেজে ভর্তি করাবার অনুরোধ করবেন না। ওটা আমি পারব না।

মুরলীধর লজ্জা পেয়ে বলল, না, সেরকম কিছু না। আমি জানতে চাইছিলুম, কমা আর সেমিকোলনের মধ্যে আজকাল আর সেমিকোলন কেউ ব্যবহার করে না কেন ?

চারুচন্দ্র পান চিবুতে চিবুতে অবহেলার সঙ্গে বলল, ওটা আর তেমন কাজে লাগে না।

মুরলীধর বলল, আগে কাজে লাগত। আচ্ছা, কমা আর

সেমিকোলনের মধ্যে তফাত কী? কোথায় কমা আর কোথায় সেমিকোলন বসানো উচিত?

চারুচন্দ্র বলল, এই আর কী। মানে, কোথাও কমা, কোথাও সেমিকোলন বসালেই হল। তবে, ঐ যে বললাম, সেমিকোলনটা এখন আর তেমন দরকার লাগে না।

মুরলীধর বলল, তবু দুটো যখন আলাদা চিহ্ন, তখন ব্যবহার করারও তো একটা নিয়ম থাকবে?

চারুচন্দ্র বলল, সেমিকোলনটা বাদ দেওয়াই ভাল। আমি তো ব্যবহার করি না। কমাতেই কাজ চলে যায়।

মুরলীধর বলল, ইংরিজিতে যেটা ফুল স্টপ, বাংলায় সেটা পূর্ণচ্ছেদ। এখন সবাই দাঁড়ি বলে। প্রশ্নবোধক চিহ্ন, বিস্ময়বোধক চিহ্নও আছে। কিন্তু কমা আর সেমিকোলন আর কোলন এগুলোর বাংলা নাম হলো না কেন?

চারুচন্দ্র বলল, কী জানি! দরকার হয়নি। কী ব্যাপার বলুন তো মুরলীবাবু, কাঠের কারবার ছেড়ে এখন কি সাহিত্য রচনা শুরু করেছেন না কি?

মুরলীধর লজ্জা পেয়ে বলল, কী যে বলেন! কিছুই শিখিনি। দু'লাইন চিঠি লিখতে গেলে কলম ভেঙে যায়। এমনিই নানা কথা মনে আসে। রোজ কাগজ পড়তে গিয়ে আমি আরও একটা জিনিস লক্ষ করেছি জানেন। খবরের কাগজে অনেক প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকে, কিন্তু বিস্ময়বোধক চিহ্ন তো দেখি না! খবরের কাগজে বুঝি বিস্ময় চিহ্ন ব্যবহার করতে নেই?

চারুচন্দ্র পানের পিক ফেলে হাত তুলে বলল, ঐ যে আমার বাস এসে গেছে। আজ চলি, কেমন?

মুরলীধর একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে অনেক প্রশ্ন, একজন বাংলার অধ্যাপকও তার উত্তর দিতে পারল না, অন্য কেউও পারে না। মনের মধ্যে এত সব প্রশ্ন গজগজ করলে কি ভাত হজম হয়?

বাজার থেকে ফেরার পর শরীরটা ম্যাজম্যাজ করতে লাগল। আজ কাঠগোলায় না গেলে কী হয়? যমুনা তা শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে কপালে হাত দিল, বুকে হাত দিল। না, জ্বর নেই। একটা দুপুর বিশ্রাম নিলেই

ঠিক হয়ে যাবে। যমুনা বলল, অফিসে গিয়ে তুমি তো ইজি চেয়ারেই শুয়ে থাকো। সেটাও বিশ্রাম। আজ হেঁটে না গিয়ে রিকশায় যাও! তোমার ঐ বংশীবাবুর ওপর থেকে একটু নজর সরালেই কী যে করবে তার ঠিক নেই! ঐ ব্যবসা চলে গেলে তুমি কি আর কিছু করতে পারবে?

সত্যিই জ্বর এলো না, বিকেলের দিকে শরীরটা ঝরঝরে হয়ে গেল। কাঠগোলা থেকে বাড়ি ফেরার পর মুরলীধর বৈঠকখানায় হালকা সিগারেটের গন্ধ পেল। ঘরে অ্যাসট্রে নেই, সিগারেটের টুকরোও পড়ে নেই। জীবনে কখনও ধূমপান করেনি বলে মুরলীধরের ঘ্রাণশক্তি তীক্ষ্ণ, বাতাসে অনেকক্ষণ আগে ছড়ান সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধও সে পায়। কেউ এসেছিল।

ওপরে গিয়ে দেখল, টেবিলের ওপর সাজানো গোটা তিনেক ওষুধের ফাইল। সেদিকে সে মন দিল না। আজও খবরের কাগজে দুটো কমার ভুল পেয়েছে। একটা কমার এদিক ওদিকে একজনের নামে খুনের অভিযোগ চলে গেছে অন্য একজনের নামে।

যমুনাই বলল, আজ দুপুরে জগদীশদা এসেছিল। হাতিবাগানে কী যেন কাজ ছিল। তোমার জন্য কয়েকটা ওষুধের স্যাম্পল শিশি চেয়ে রেখেছি। তোমার শরীরটা খারাপ হচ্ছে, টনিক খেলে গায়ে জোর বাড়বে।

বেশ, বেশ। জগদীশ মাঝে মাঝে এলেই তো পারে। যমুনার সময় কাটবে। মুরলীধর আজকাল বাড়ি ফিরেই বীণাপাণির ঘর থেকে এক একখানা বই নিয়ে পড়তে বসে। খবরের কাগজে বিস্ময়চিহ্ন থাকে না, গল্পের বইতে থাকে। খবরের কাগজের লোকেদের অবাক হতে নেই?

একদিন কাঠগোলায় বসে থাকতে থাকতে মুরলীধর জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁরে, বংশো, তুই বুদ্ধদেব বসুর নাম শুনেছিস?

বংশীবদন টাকা গুনতে গুনতে বলল, হ্যাঁ শুনেছি। মানস সরোবরের অনেক ছবি তুলেছে। বাগবাজার জিমনেশিয়ামে সেই বুদ্ধ বোস ফিলিম দেখাল, আমি দেখেছি।

মুরলীধর বলল, ঐ বুদ্ধ বোস না, রাইটার বুদ্ধদেব বসু। অনেক বই আছে। এই রাইটার যা কমা ব্যবহার করে না, তোকে কী বলব! এক একটা সেন্টেন্সে চারটে পাঁচটা, কখনও ছ'টাও হয়! এত কমা আর কোনও রাইটার দেয় না! যদি একটা এদিক ওদিক হয়ে যায়—

বংশীবদন বলল, দ্যাখ মুরুলি, আমরা ছাপোষা লোক, ব্যবসাটা

চালু রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি। আমাদের কি আর ঐসব বইটই নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আছে? ওসব কলেজের ছেলেছোকরা আর বেকারদের জন্য। তুই খবরের কাগজে খবর পড়বি, তোর অত কমা ফুলস্টপ গোনার দরকার কী? তুই বরং এক কাজ কর, গোটা কতক বিল আছে, টাইপ করে ফ্যাল!

মুরলীধর টাইপ মেশিনে গিয়ে বসল। এ কাজ সে ভাল পারে। সাত-আটখানা বিল-ভাউচার জমে গেছে। ফিতেটা বদলানো দরকার, যা হোক আজ চলে যাবে।

বংশীবদন ক্যাশ কাউন্টার থেকে মুখ ফিরিয়ে বলল, হ্যাঁরে মুরুলি, বউমাকে ডাক্তার দেখাবি না? বলিস তো, আমি ঠিক করে দিতে পারি, আমার চেনা ডাক্তার আছে।

মুরলীধর চমকে উঠে বলল, কেন? ডাক্তার দেখাতে হবে কেন?

বংশীবদন বলল, এত বছরেও খোকা-খুকু এলো না, একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে না?

মুরলীধর লজ্জা পেয়ে বলল, না, না, সেসব ঠিক আছে। ডাক্তারের দরকার নেই।

বংশীবদন বলল, তুই কি বংশ রক্ষার কথাও ভাবিস না? কী যে আজকাল ফেশিয়ান হয়েছে। তিনকাল গিয়ে এক কালে ঠেকে, তখনও লোকে ছেলেমেয়ে চায় না! তোর বউমাকে আমি নিজে গিয়ে একদিন বলব!

মুরলীধর মুখ নিচু করে রইল। ডাক্তার দেখাবার কথা আরও কেউ কেউ বলেছে। মুরলীধর রাজি নয়। ডাক্তার যদি বলে দেয়, যমুনার সন্তান ধারণের ক্ষমতা নেই, তা হলে কী বিচ্ছিরি হবে। কোনও স্ত্রীলোক বাঁজা, এ কথা যদি একবার রটে যায়, তা হলে সেটা তার পক্ষে বড় লজ্জার কথা। আর ডাক্তার যদি মুরলীধরকেই বলে যে সে পুরুষত্বহীন, তা হলে সে-ই বা লোকের কাছে মুখ দেখাবে কী করে? তার থেকে, যেমন চলছে তাই চলুক। ভাগ্যে যদি থাকে, সন্তান একদিন আসবেই।

কত সামান্য একটা বিন্দু থেকে মানুষের জন্ম! লক্ষ লক্ষ শুক্রবীজ, কমা-ফুলস্টপের চেয়েও ছোট, তারই একটা থেকে আসে মানুষের প্রাণ, আসতেও পারে, নাও আসতে পারে। বটগাছের ফল কত ছোট, তারও মধ্যে থাকে ক্ষুদে ক্ষুদে বীজ, সেই বীজ থেকে অতবড় একটা বটগাছ আবার জন্মায়। ছোট জিনিসের কী ক্ষমতা!

বিলগুলো টাইপ হয়ে যাবার পর বংশীবদন বলল, একবার দে তো দেখি।

মুরলীধর বলল, দেখতে হবে না। কাল সকালেই পাঠিয়ে দেব।

দেরাজের মধ্যে রাখা বিলগুলোতে তবু চোখ বুলোতে লাগল বংশীবদন। দেখতে দেখতে তার নাকের ফুটো স্ফীত হল, চোখ মুখ লাল হয়ে গেল। সে বলে উঠল, এ কী করেছিস!

মুরলীধর বলল, কেন রে, কিছু ভুল হয়েছে?

বংশীবদন বলল, ভুল মানে? মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। হবে টাকা 795.85, আর তুই টাইপ করেছিস 795,85! ওপরে ফুটকির বদলে তলায় কমা? এর মানে কী হয় তুই জানিস না? আর এটা? 8189.00 হবে, তুই সেটা করেছিস 818,900! তুই আমাদের পথে বসাবি? কাজে একটুও মন নেই?

মুরলীধর হাসতে হাসতে বলল, এই রে, কমার উৎপাত! তোকে বলেছি না, কমাগুলো খুব ডেঞ্জারাস, কী করে উড়ে এসে জুড়ে বসে। ফুটকিগুলোকে হাটিয়ে দিয়েছে। ফুটকি দিলে টাকাটা কম যাচ্ছে, আর কমা দিলে বেড়ে যাচ্ছে।

বংশীবদন এখন সত্যিকারের রেগে গেছে। গর্জন করে সে বলল, তুই হাসছিস? তোর লজ্জা করে না! ব্যবসাটার জন্য আমি খেটে খেটে মরি, তুই শুধু লেজ নাড়িস বসে বসে! শুধু বিল টাইপ করা, তাতেও এরকম ভুল? দিন রাত কমা আর সেমিকোলন আর গুষ্টির পিণ্ডি! মাথাটা খারাপ করে দিলে একেবারে! তোকে এই বলে রাখছি মুরুলি, তুই খবরদার আর কমা ফমার কথা আমার সামনে উচ্চারণ করবি না। চল আজ তোর বাড়ি যাব, বউমাকে সব বলব। নির্ঘাৎ তোর মাথার রোগ হয়েছে।

বংশীবদনের গজগজানি আর থামেই না। চুপসে গিয়ে মুরলীধর থুতনি ঠেকিয়ে রাখল বুকে। এবং সত্যিই ছুটির পর বংশীবদন চলে এলো মুরলীধরের বাড়িতে।

দু'জনের একই বয়েস, একই কারবারের সমান অংশীদার, এমনকি দু'জনের নামের অর্থও এক। তবু জীবনযাপনের কত তফাত! বংশীবদনের পর পর তিনটি ছেলেমেয়ে, তারা এক রকম পোশাক পরে কী সুন্দর ইস্কুলে যায়। বংশীবদন নিজের বাড়ির ছাতে একখানা ঘর

তুলেছে। শেয়ার মার্কেটে টাকা খাটায়। মুরলীধর এসব কিছুই পারে না।

দু'জনেই দু'জনের স্ত্রীকে বউমা বলে। যমুনা বংশীবদনকে তেমন পছন্দ না করলেও এখন তার অভিযোগের সঙ্গে গলা মেলাল। বাড়িতেও মুরলীধর কমা-সেমিকোলনের কথা বলে বলে কান ঝালাপালা করে দিয়েছে। অতিথি এলে বেমক্কা প্রশ্ন করে। এটা মাথার গোলামাল ছাড়া আর কী? যমুনা কতবার তাকে টনিক খেতে বলে, তবু সে খায় না।

বংশীবদন যমুনার সামনে মুরলীধরকে দিয়ে শপথ করাল, সে আর ঐ সব এলেবেলে কথা একদম উচ্চারণ করতে পারবে না। ফের ঐ প্রসঙ্গ তুললেই তাকে পাগলের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। এখন কিছুদিন বইটই পড়াও বন্ধ। কাঠগোলাতেও আর খবরের কাগজ রাখা হবে না।

মুরলীধর বাধ্য ছেলের মতন সব মেনে নিল।

দিন কাটতে লাগল আগের মতন। কাঠগোলাতে নিয়মিত যায় মুরলীধর, ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকে, ঘুমোয় না, কী যে চিন্তা করে তা সে-ই জানে। বিল টাইপ করার সময় সে আর ভুল করে না।

বাড়িতে ফিরে সে মাঝে মাঝে সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ পায়। একদিন একটা চিঠিও দেখতে পেল।

যমুনা ঘুমিয়ে আছে, মাঝরাতে বিছানা ছেড়ে ছাদে চলে এল মুরলীধর। পরিস্কার আকাশ, অসংখ্য তারা ফুটে আছে। রাত্তিরের আকাশের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকতে তার ভাল লাগে। যমুনা মাঝে মাঝে সিনেমা দেখার জন্য বায়না ধরে। নাইট শো-তে নিয়েও যায় মুরলীধর, এ পাড়ায় সিনেমা হলের অভাব নেই। কিন্তু সিনেমার পর্দায় মানুষজনের নড়াচড়া বেশ কিছুক্ষণ দেখলে তার চোখ ব্যথা করে। ফিরে আসার পর, পাড়ার সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আকাশের দিকে চেয়ে থাকলে তার চোখ জুড়োয়।

এই আকাশ মহাকাশের যাত্রা পথ। মহাকাশের কোথায় শুরু, কোথায় শেষ কেউ জানে না। অনন্ত কাল ধরে চলেছে কালের এই যাত্রা, মাঝখানে এই গ্রহ নক্ষত্রগুলো কি কমা-সেমিকোলনের মতন যতি চিহ্ন? অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলে মনে হয়, এক একটা ঐ ক্ষুদে চিহ্ন যেন সাঁ করে সরে যাচ্ছে, জায়গা বদলাচ্ছে।

ঘরে ফিরে এসে মুরলীধর চিঠিটা আবার দেখল। আলমারিতে একটা লম্বা সাবানের বাক্সের নিচে লুকোনো ছিল। মুরলীধর ইচ্ছে করে দেখেনি, একটা পুরোনো ইলেকট্রিকের বিল খুঁজতে গিয়ে চোখে পড়ে গেছে।

চিঠিখানা সিগারেটের ধোঁয়াকেই লেখা। যমুনা লিখেছে,....অনেক ভেবে দেখলাম, তোমার কাছেই আমি সব কথা বলতে পারি। মাঝে মাঝে দুর্বল হয়ে পড়ি আমি। একটা সন্তানের জন্য আমার লোভ আছে ঠিকই, তুমি তা আমাকে দিতে পার তাও জানি। ও মনে আঘাত পাবে। না, আমি মন ঠিক করে ফেলেছি। তুমি কিন্তু আসা বন্ধ করবে না। তোমাকে মাঝে মাঝে দুপুরবেলা আসতেই হবে, না হলে আমি মরে যাব—।

বার বার চিঠিখানা পড়তে লাগল মুরলীধর। একটা কথাই তার মাথায় ঘুরছে। একটা মাত্র দাঁড়ি। সেটা সরে গেলেই পরের কমাটা কত শক্তিশালী হয়ে যায়। পুরো চিঠিটার অর্থই পাল্টে যাবে। পূর্ণচ্ছেদের কী দরকার ? জীবন গতিময়, আরও কত বাকি আছে এ জীবনের, মাঝে মাঝে কমা বা সেমিকোলনের মতন ছোটখাটো বিরতি হতে পারে। যমুনার মনে দুঃখ রেখে লাভ কী ? 'ও মনে আঘাত পাবে', এর পর দাঁড়িটা তুলে দিলেই তো হয় ! পরের কমাটাই আসল, 'ও মনে আঘাত পাবে না'—

চিঠিখানা যথাস্থানে রেখে দিয়ে মুরলীধর একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

দরজা খোলার পর

একদিকে টুং করে দরজার বেল বাজল। অন্যদিকে ঝনঝন করে টেলিফোন।

টেলিফোনটা খাবারের টেবিলের কাছেই, সুশোভন চেয়ারটা একটু সরিয়ে এনে টেলিফোনটা ধরলেন। দেবযানী তাকালেন বাইরের দরজার দিকে। স্বামীকে মাছের ঝোল তুলে দিচ্ছিলেন দেবযানী, এক হাতে ঝোল শুদ্ধু হাতা। একটু আগে যোগব্যায়াম করেছেন, এখনও স্নান হয়নি, মুখখানা ঘামে তেলতেলে, স্বচ্ছ রাত্রিবাস পরা, বুকে একটা তোয়ালে জড়ানো। এই অবস্থায় বাইরের লোকের সামনে যাওয়া যায় না, তবে দরজা কে খুলবে ? দিলীপকে দই কিনে আনবার জন্য পাঠানো হয়েছে বাইরে।

দেবযানী মুখ ফেরালেন স্বামীর দিকে। সুশোভন টেলিফোন কানে দিয়ে ও, আচ্ছা বলে যাচ্ছেন, মুখে ঈষৎ হাসি, স্ত্রীর চোখে চোখ পড়ল না।

বাইরে যে এসেছে, সে অধৈর্য হয়ে আর একবার বেল বাজাল। দেবযানী হাতাটা নামিয়ে রেখে শয়নকক্ষে গিয়ে তোয়ালেটা খুলে দ্রুত একটা শাড়ি জড়িয়ে নিলেন। রাত-পোশাকের হাতা থাকে না, দু' কাঁধের কাছে এমন গোল গোল করে কাটা যে স্তনের আভাস চোখে পড়ে, কোনওক্রমে ঢাকাঢুকি দিয়ে দৌড়ে গিয়ে দরজা খুললেন।

প্রত্যেকবারই দরজা খোলার আগে পর্যন্ত মনে হয়, এমন কেউ এসেছে যাকে বেশিক্ষণ বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা যায় না। কোনও মানী

লোককে অপমান করা হয় কিংবা কোনও প্রিয়জনের প্রতি দেখানো হয় অবজ্ঞা। অধিকাংশ সময়েই অবশ্য এ ধারণা মেলে না। ফ্ল্যাট বাড়িতে যে-কোনও ফেরিওয়ালা বা চাঁদা প্রার্থী সেও বেল বাজাতে পারে। এখন এসেছে কুরিয়ার সার্ভিসের একজন লোক।

ইদানীং ডাক বিভাগের ওপর অনেকেরই আস্থা নেই। কচ্ছপ আর খরগোশের দৌড়ের নীতি গল্পটা এখন আর মেলে না। খরগোশ অনেক আগে পৌঁছে যায়, কচ্ছপই মাঝপথে ঘুমিয়ে পড়ে। কুরিয়ার সার্ভিসে খরচও এমন কিছু বেশি না, ওদের লোকগুলো খরগোশের মতোই দরজার সামনে অস্থির থাকে।

দেবযানী সই করে নিলেন। এমন কিছু জরুরি চিঠি নয়, খামটা দেখলেই বোঝা যায়। খুব সম্ভবত কোনও কবি যশোপ্রার্থী একটা লেখা পাঠিয়েছে সুশোভনের কাছে। সই করে নেওয়া চিঠি, বলা যাবে না যে পাইনি।

সুশোভনের ফোনে কথা বলা এখনও শেষ হয়নি। একটি মেয়ে, নিজের নাম জানাবে না, সে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছে, মানুষকে বিশ্বাস করা কি ভুল ? কোনও মানুষকে গভীরভাবে বিশ্বাস করে সব কিছু দিতে গেলেও সে কেন হৃদয়হীন অমানুষ হয়ে ওঠে ? কীভাবে খাঁটি মানুষ চেনা যায় ? আপনি সাহিত্যিক, আপনি নিশ্চয়ই এসব বলতে পারবেন। আপনার লেখার মধ্যে....

সুশোভন খেতে বসেছেন, এখন দুপুর সাড়ে বারোটা, খেয়ে উঠেই তাঁকে বেরুতে হবে, এই সময় এই ধরনের ছেঁদো কথাবার্তা শুনতে কারুর ভাল লাগে ? মেয়েটি হয়তো কোনও পুরুষের কাছ থেকে আঘাত পেয়েছে, কিন্তু কারুর ব্যক্তিগত সমস্যা কি লেখকদের পক্ষে সমাধান করা সম্ভব ? লেখকরা নিজেদের সৃষ্টি করা চরিত্রগুলির সমস্যা মেটাতেই হিমশিম খেয়ে যান, কারুর বাস্তব সমস্যার কাছে তাঁরা অসহায়। তবু অনেকে মনে করে, তার গোপন দুঃখের কথা আর কারুকে বলা না গেলেও একজন লেখককে জানানো যায়। সেই লেখক তখন খেতে বসেছেন, কিংবা লিখছেন কিংবা অন্য জরুরি কাজে ব্যস্ত কি না, সেসব কেউ খেয়াল করে না।

তবু রূঢ়ভাবে আমি এখন ব্যস্ত বলে ফোন রেখে দেওয়া যায় না। দু'চারটি মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতেই হয়। রূঢ় ব্যবহার করা স্বভাবও নয়

সুশোভনের। তিনি হ্যাঁ, তাতো বটেই, মানুষ চেনা শক্ত, তবু মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাতে নেই, এই ধরনের মামুলি উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন।

ফোনটা রাখার পর তিনি আপন মনে বললেন, ভাত ঠাণ্ডা হয়ে গেল!

দেবযানী বললেন তুমি আর একটা মাছ নেবে? সুশোভন বললেন, না থাক। দিলীপ এখনও দই আনল না? কে বেল দিয়েছিল?

টেবিলের ওপর খামটা রাখলেন দেবযানী। চিঠি জমে যাওয়া নিয়ে দেবযানীর অভিযোগ আছে। প্রতিদিনই বেশ কয়েকটি চিঠি ও পত্রপত্রিকা আসে। সুশোভন প্রত্যেকটা খুলে পড়েন, কিন্তু উত্তর দেওয়া হয় না, এক দেড় মাস অন্তর অন্তর চিঠির উত্তর দেবার সময় আসে, এর মধ্যে সারা বাড়িতে ছড়িয়ে থাকে চিঠি।

খেতে খেতেই অন্যমনস্ক ভাবে বাঁ হাতে খামটা খুললেন সুশোভন। হ্যাঁ, কবিতাই। বাঁকুড়ার গ্রাম থেকে একজন সুশোভন সম্পর্কে উচ্ছ্বাস ভরা খানিকটা প্রশস্তির সঙ্গে চারখানা কবিতা পাঠিয়েছে। প্রতিটি কবিতাই প্রথম দু'তিন লাইন পড়লেন। একেবারেই নিরেস। কবিতার আঙ্গিক, ভাষা ব্যবহার না শিখেই কিছু একটা লিখে ফেলে এর ছাপাবার জন্য ব্যস্ত। যেন কবিতা লেখা খুব সহজ কাজ।

মুঠো করে সব শুদ্ধু দুমড়ে সুশোভন ছুঁড়ে দিলেন ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের দিকে। সেখানে পড়ল না, ঢুকে গেল ফ্রিজের তলায়।

দেবযানী জিজ্ঞেস করলেন, আজ তোমার কী প্রোগ্রাম?

সুশোভন বললেন, দুপুর দুটোয় সেই ইতালিয়ান মেয়েটি দেখা করতে আসবে অফিসে, আমার একটা উপন্যাস অনুবাদ করতে চায়, আজ কন্ট্রাক্ট সই করাবে, মেয়েটির ব্যবহার ট্যাবহার ভারি সুন্দর। ঠিক সময়ে পৌঁছোতে হবে, আজ আর দই খাওয়া হবে না।

দেবযানী আবার জিজ্ঞেস করলেন, তারপর, বিকেলে?

সুশোভন অন্যমনস্কভাবে বললেন, অফিসে একটা সম্পাদকীয় লেখা আছে, লিখে ফেলতেই হবে আজ, বিকেল পাঁচটায় ওরা নিতে আসবে।

দেবযানী বললেন, ওরা মানে কারা? কোথায়?

সুশোভন বললেন, তোমায় আগে বলিনি? আজ ব্যারাকপুরে আমার একটা সম্বর্ধনা আছে। একটা লাইব্রেরির শতবর্ষপূর্তি। দেবযানী বললেন, না, আমাকে আগে বলনি।

সুশোভন বললেন, বলিনি ? নিশ্চয়ই বলেছি, দশ-বারো দিন আগে, তোমার খেয়াল নেই। এই সব সম্বর্ধনা, ফম্বর্ধনা আমার একদম পছন্দ হয় না, কিন্তু বিমলেন্দুর ভাই খুব করে ধরেছে, একেবারে নাছোড়বান্দা যাকে বলে। তুমি ব্যারাকপুরে যেতে চাও ? তাহলে ওদের বলতে পারি গাড়িটা আগে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়—।

দেবযানী বললেন, না।

সুশোভন কই মাছের কাঁটা বাছতে বাছতে বললেন, ফিরতে কিছুটা দেরি হবে, ওদিকের রাস্তা ভাল নয়, তবে রাত দশটার মধ্যে ফেরার খুব চেষ্টা করব।

দেবযানী বললেন, একদিন বাড়ি ফিরে যদি দেখো যে আমি নেই, তাহলে তোমার কেমন লাগবে ?

সুশোভন বললেন, তার মানে ? আজ কোথাও তোমার যাবার কথা আছে ? আমার গাড়ি তো ফেরত পাঠিয়েই দিচ্ছি।

দেবযানী বললেন, কোথাও যাবার কথা নেই। তোমার গাড়িও লাগবে না। আমি এমনি কোথাও চলে যাব ! হ্যাঁ চলেই যাব। কেউ আমাকে আর খুঁজে পাবে না। না, ভুল বললাম, কেউ খুঁজতে যাবেও না।

খাওয়া বন্ধ করে সুশোভন মুখ তুলে তাকালেন। দেবযানীর গায়ে আলুথালু ভাবে শাড়িটা জড়ানো, চুল আঁচড়ানো নেই, ঠোঁটে ক্ষীণ হাসির রেখা, চোখের কোণে টলটল করছে অশ্রু।

সুশোভন বিস্মিতভাবে বললেন, আজ আবার কী হল ?

দেবযানী বললেন, কিছু হয়নি। এ বাড়িতে আমার তো কোনও প্রয়োজন নেই। আমি টেক্‌ন ফর গ্রান্টেড। থাকা না থাকা সমান। তোমার খাওয়া দাওয়া, ঠিক সময়ে ওষুধ দেওয়া এসব দিলীপই করতে পারবে। কিংবা তোমার কত মেয়ে ভক্ত আছে, তারা এসে তোমার যত্ন করবে। আমি বুড়ি হয়ে গেছি।

সুশোভন খানিকটা অস্থিরতা গোপন করে বললেন, হঠাৎ এসব কথা শুরু করলে কেন ? আজ সকাল থেকে আমি কি কোনও দোষ করেছি ?

দেবযানী বললেন, না, দোস করবে কেন ? তুমি তো কোনও দোষ করো না, সব দোষ আমার। আমি যা করি সেটাই দোষের হয়ে যায়।

তোমার লেখার সময় আমি বিরক্ত করি, তুমি ব্যস্ত মানুষ, তোমার কথা বলার সময় নেই, আমার কথা বলতে যাওয়াটাই অন্যায়। বাইরের সকলের কাছে তুমি পারফেক্ট জেন্টল্‌ম্যান।

সুশোভন বললেন, যতই ব্যস্ততা থাক, তোমার সঙ্গে কথা বলি না? তোমার কথা ভাবি না?

দেবযানী বললেন, কাল দুপুরে আমরা একসঙ্গে খেতে বসেছিলাম, তুমি নিজে থেকে আমার সঙ্গে একটাও কথা বলনি।

সুশোভন বললেন, যাঃ, সে কি। কাল তো আমার অনেক কথা বললাম, সুভদ্রা মাসির মেয়ের বিয়েতে যেতে হবে—

দেবযানী বললেন, আমি যা যা জিজ্ঞেস করেছি, তুমি উত্তর দিয়েছ। আমি লক্ষ করছিলাম, তুমি নিজে থেকে একটাও কথা বল কি না। বলনি।

সুশোভন বললেন, হয়তো কাল অন্যমনস্ক ছিলাম, লেখার কথা মাথায় ঘুরছিল। একটা গল্প কিছুতেই শেষ করতে পারছি না।

দেবযানী বললেন, হ্যাঁ। লেখার চিন্তা, তোমার কত বান্ধবী, তাদের নিয়ে চিন্তা। বউকে নিয়ে চিন্তা করতে যাবে কেন? বউ তো পুরনো হয়ে গেছে। টেলিফোন এলে তোমার সব লেখার চিন্তা চলে যায়, আমি ধরার আগে তুমি খপ করে তুলে নাও। পাছে আমি কোনও মেয়ের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করি, তাই সবসময় তুমি আগ বাড়িয়ে নিজে ফোন ধরো। অনেকবার আমি দেখেছি, আমি ফোন তুলে হ্যালো বললে ওপাশ থেকে কোনও উত্তর আসে না। স্পষ্ট বুঝতে পারি নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে, তোমার কোনও বান্ধবী আমার গলা শুনে উত্তর দেয় না।

একটু হালকা করার জন্য সুশোভন বললেন, সে তো আমিও অনেকবার দেখেছি, ফোন তুললে ওপাশে চুপ করে থাকে। তোমার কোনও বন্ধু, তোমার সঙ্গে প্রেম-ট্রেম করতে চায় বোধহয়।

দেবযানী বললেন, সে আগে হয়তো হত, কেউ কেউ আমার সঙ্গেই গল্প করতে চাইত। এখন আমি তো বুড়ি, বিচ্ছিরি দেখতে হয়ে গেছি!

সুশোভন বললেন, আর আমার বুঝি বয়েস কমছে?

দেবযানী বললেন, তোমাদের বেশি বয়েস হলেও কিচ্ছু যায় আসে না। তোমরা যে পুরুষ। পঞ্চান্ন-ষাট বছরের পুরুষ অনায়াসে চব্বিশ-পঁচিশ বছরের কোনও মেয়ের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করতে পারে, প্রেম করতে

পারে। তোমাকেও তো দেখেছি, ওই বয়েসের মেয়েদের দেখলে তুমি গদোগদো হয়ে যাও, দিব্যি ন্যাকামি করো। আর, আমরা,-আমার এখন বাহান্ন, পঁচিশ-তিরিশ বছরের ছেলেদের কাছে মাসি-পিসি সাজতে হয়। সেটাই তো নিয়ম!

সুশোভন বললেন, তুমি মোটেই বুড়ি হওনি। পার্টিতে সেজেগুজে গেলে অনেকেই তোমার দিকে তাকায়, চল্লিশের বেশি মনে হয় না। আমার চোখে তুমি এখনও খুব সুন্দর।

স্বামীর দিকে জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে উনুনের আঁচের মতো গলায় দেবযানী বললেন, হ্যাঁ, সেইজন্যই তো বাড়িতে যখন আমি বিচ্ছিরি ভাবে থাকি, শাড়িটাও পরা নেই, তখন দরজায় বেল বাজালে আমাকেই যেতে হবে। পিওন, ম্যাথর, ফিল্মের প্রোডিউসার যে-ই হোক, তার সামনে আমাকে ওইভাবে দাঁড়াতে হবে। আর তুমি তখন ফোনে কোনও বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি হেসে গল্প করবে। তুমি দরজা খুলতে যাবে কেন, তোমাকে ইমেজ রাখতে হবে তো!

সুশোভন কয়েক মুহূর্ত মুখ নিচু করে রইলেন। বুঝতে পারলেন আজকের কলহের উৎস। দেবযানী ঠিকমতো সাজ-পোশাক করে নেই, মুখখানায় তেলতেলে ঘাম, এই অবস্থায় এঁটো হাতেও উঠে গিয়ে সুশোভনেরই দরজা খোলা উচিত ছিল। সেই সময়েই টেলিফোন বাজল, কানের কাছে ফোন বাজলে, ছেলে বা মেয়ে যারই হোক, অধিকাংশ ফোনই আসে অন্যের স্বার্থকথা নিয়ে, অনেকগুলিই বিরক্তিকর, তবু ফোনের আওয়াজের মধ্যে এমন একটা অজ্ঞাত জরুরি ভাব থাকে যে না ধরে পারা যায় না। দরজার বেলটা তিনি খেয়াল করেননি, দিলীপ যে বাড়িতে নেই, সেই মুহূর্তে সেটাও ভুলে গিয়েছিলেন। এটা দোষই হয়েছে, নির্ঘাত তাঁর দোষ।

সুশোভন একবার দেয়ালঘড়ির দিকে তাকালেন। আর অপেক্ষা করা যায় না।

দেবযানীর একটা হাত চেপে ধরে তিনি বললেন, আই অ্যাম সরি, সত্যি আমার দোষ হয়ে গেছে। আজ আমারই দরজাটা খোলা উচিত ছিল।

এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে, দূরে সরে গিয়ে দেবযানী তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন, শুধু আজ? এই রকম দিনের পর দিন। আমি কী ভেবে

বিয়ে করেছিলাম, আর কী পেলাম ? সব নষ্ট হয়ে গেল ! বাবা মায়ের অমতে....তখন আমি ভেবেছিলাম বিয়ে করতে যাচ্ছি একজন তরুণ কবিকে, দুজনে মিলে দুঃখ-কষ্ট-আনন্দ সব ভাগ করে নেব, ভুল, সব ভুল ! আজ তুমি বিখ্যাত লোক, ব্যস্ত লোক, সব সময় তোমাকে অন্যরা ফিরে থাকে, অনেক মেয়ে তোমাকে পছন্দ করে, আমি দেখেছি, আমি কাছে থাকলে তাদের অস্বস্তি হয়, আমাকে কেউ পছন্দ করে না, আমি না থাকলে তুমিও খুশি হও, তারাও খুশি হয়।

রসিকতা করার চেষ্টা করে সুশোভন বললেন, আমার বিখ্যাত হওয়াটাই তোমার রাগের কারণ ? তা হলে বল, টাইম মেশিনে আবার উল্টো দিকে ফিরে যাই। আবার শুরু হোক—

দেবযানী ওসব কথা একেবারে না শুনে আপন মনে বললেন, তোমার জন্য আমার সব কিছু নষ্ট হয়ে গেছে। গান ভালবাসতাম, ভাল করে শিখলে খুব একটা খারাপ গাইতাম না। দেবব্রত বিশ্বাস বলেছিলেন....। জার্মান ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলাম, দু' বছর টানা ক্লাস করেছি, ফার্স্ট হতাম, বিশাখাকে জিজ্ঞেস করে দেখ, সেই জার্মান ক্লাসও কনটিনিউ করা হল না। বিশাখা স্কলারশিপ পেয়ে....

সুশোভন বললেন, আমার জন্য হল না ? আমি তোমাকে বারণ করেছি কখনও ?

দেবযানী বললেন, তুমি মুখে বারণ করবে কেন ? তুমি যে উদার, তুমি যে মহৎ ! ছেলের লেখাপড়া কে দেখত ? তুমি একদিনও তাকে নিয়ে বসেছ ? আমি বছরের পর বছর বিল্টুর সঙ্গে সারাক্ষণ, তার পড়াশুনোর যাতে ক্ষতি না হয়, বাজে ছেলেদের সঙ্গে যাতে না মেশে, আমি কোথাও যাইনি, সিনেমা দেখিনি, পার্টিতে যাইনি, নিজের গানটান তো একেবারে বন্ধ ! আর তুমি তখন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা আর হই-হল্লা করে বেড়িয়েছ, মাঝরাতের আগে কখনও বাড়িতে ফিরতে না।

সুশোভন এবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, শুধু হই-হল্লা করে বেড়িয়েছি ? ঘাড় গুঁজে যে অক্লান্তভাবে লিখে গেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা, তার কষ্ট ছিল না ? আমি তো বাবার সম্পত্তি পাইনি। গরিবের ছেলে, তখন ছিল বাঁচা-মরার প্রশ্ন। না লিখলে খেতে পেতাম না। সংসার চালাবার জন্য কত আজেবাজে লেখা লিখতে হয়েছে, কবিতা ছেড়ে

গদ্য, লিখতে লিখতে চোখ ক্ষয়ে গেছে, আঙুল টনটন করেছে, তা কিছু না ? এখনও যে কত রকম লিখতে হয়, এই উপন্যাসটা লেখার জন্য কত পড়তে হচ্ছে, এত পড়া, এত লেখা, এর পরিশ্রম নেই, কষ্ট নেই ?

দেবযানী বললেন, সবাই জানে লিখতে গেলে কষ্ট হয়। তুমি পরিশ্রম করেছ, কষ্ট করেছ, তার বদলে পেয়েছ অনেক কিছু। এখনও পাও। খ্যাতি, কিছু লোক তোমাকে নিয়ে নাচানাচি করে, এখান থেকে সেখান থেকে নেমন্তন্ন পাও, মেয়েরা তোমার কাছে আসে, প্রেম প্রেম ভাব করে। আমি কি পেয়েছি ? কিচ্ছু না ! তুমি আসলে স্বার্থপর, ভীষণ স্বার্থপর !

সুশোভন গলা চড়িয়ে বললেন, সব সময় খালি মেয়ে মেয়ে করো। কোথায় মেয়ে, আমার কি মেয়েদের সঙ্গে মেশার সময় আছে ? আমার স্বার্থপর বললে, তুমি কিছু পাওনি ? আমার খ্যাতিতে তোমার আনন্দ হয় না ? পৃথিবীর কত দেশে তোমাকে নিয়ে গেছি, তুমি বেড়াতে ভালবাসো, যতদূর সম্ভব তোমার শখ মিটিয়েছি, কত নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, অল্প বয়েসী অনেক ছেলেমেয়ে তোমারও ভক্ত হয়েছে, আমার থেকেও তোমাকে খাতির করেছে বেশি ! কিছুই পাওনি, এ কথা বলতে পারলে ?

দেবযানী বললেন, রিফ্লেকটেড গ্লোরি ! আসলে তারা তোমাকেই চায়। আমার অসুখ হলে কেউ খবর নেয় ? তোমার দু'দিন জ্বর হলেই সবাই আহা উহু শুরু করে দেয়। আমার অসুখ হলে তুমিও গ্রাহ্য কর না। তোমার তো সময়ই নেই আমার দিকে তাকাবার। ডাক্তার দেখানো হয় না....আমার দরকার নেই। আমি কিচ্ছু চাই না। আমি চলে যাব। জঙ্গলের ধারে একটা নদী, কাছাকাছি কোনও মানুষজন নেই, একটা ছোট্ট কুঁড়েঘর বেঁধে আমি থাকব, কেউ আসবে না, কেউ আমাকে বিরক্ত করবে না।

সুশোভন বললেন, ওরকম কোনও জায়গা নেই পৃথিবীতে। একা একটা কোনও মেয়ে ও ভাবে থাকতে পারে নাকি ?

দেবযানী বললেন, না হয় মরে যাব। আমার আর একটুও বাঁচতে ইচ্ছে করে না। আমি যা চেয়েছিলাম. তুমি ভালোবাসার মর্ম বুঝলে না, আমাকে তুমি মনে করো বাড়ির একটা ফার্নিচার, আমার জন্য তোমার আলাদা কোনও সময় নেই।

সুশোভন একঝলক ঘড়ি দেখলেন। এখনো উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োলে দুটোর মধ্যে পৌঁছানো যায়।

মিনতি করে বললেন, মিলি, আমরা পরে এ নিয়ে কথা বলব। আমি আর দেরি করতে পারছি না, ইতালিয়ান মেয়েটি অপেক্ষা করে চলে যাবে।

দেবযানী বললেন, যাও না, কে তোমাকে আটকে রেখেছে। একজন সুন্দরী মেয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে, বাড়িতে থাকতে ভাল লাগবে কেন?

সুশোভন এবার প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললেন, আবার মেয়ে মেয়ে করছ? সে আমার বই অনুবাদ করছে, মেয়ে কিংবা পুরুষ, তাতে কী আসে যায়। একটা উপন্যাস অনুবাদ করবে, বেশ কিছু টাকা পাওয়া যেতে পারে।

দেবাযানী বললেন, এক্ষুণি ছুটে চলে যাও। আমার সঙ্গে তোমার আর কোনও কথা তো নেই, কোনও কথা নেই। দেবযানী নিজেই দৌড়ে গিয়ে বাথরুমে ঢুকে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

সুশোভন বিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন একটুক্ষণ। দেবযানীর একবার মেজাজটা খারাপ হয়ে গেলে অভিযোগের পর অভিযোগ শুরু হয়ে যায়। দশ বছর-কুড়ি বছর আগের কোনও কোনও ভুলের কথা আবার এসে পড়ে। এরকম সময় চলে যাওয়া কি ঠিক? দেবযানী একবার বাথরুমে ঢুকলে সহজে বেরুবে না।

রান্নাঘরের সিংকে সুশোভন হাত ধুয়ে নিলেন। একটা উপন্যাস অনুবাদ হলে কী আর এমন হাতি-ঘোড়া হবে, কত টাকাই বা পাওয়া যাবে? এমন কিছু না, কিছু যায় আসে না, সুশোভনের সেরকম কোনও মোহ নেই। তবু, সময় রক্ষা করা সুশোভনের অনেক দিনের অভ্যেস। কাউকে আসতে বলে দেখা করতে না যাওয়া চরম অসভ্যতা। বিশেষত একজন বিদেশির সঙ্গে এরকম ব্যবহার করা যায় না। কাউকে কি বলা যায় যে আমার বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া হচ্ছিল বলে আমি আসতে পারিনি!

দিলীপের কাছে চাবি থাকে, সে দরজা খুলে দইয়ের ভাঁড় নিয়ে ঢুকতেই সব রাগ পড়ল তার ওপর। চোখ গরম করে বললেন, দই আনতে এতক্ষণ সময় লাগে? লোকে এসে দরজায় বেল দেয়, এঁটো হাতে এসে দরজা খুলব? দই খাব না! বউদিকে বলিস, আমি অফিসে চলে যাচ্ছি।

সুশোভন নিজে গাড়ি চালান না অনেকদিন। যখন নিজের গাড়ি ছিল না, গাড়ি কেনার কথা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, তখন ড্রাইভিং শিখেছিলেন। এম এ পাস করে টানা চার বছর বেকার থাকার সময় একবার ভেবেছিলেন, ট্যাক্সি চালিয়ে সংসারের খরচ জোটাবেন। সেসব অনেক দিন আগেকার কথা।

ড্রাইভারকে বললেন, তাড়াতাড়ি চল!

দেবযানী তাকে বলল, স্বার্থপর। সুশোভন যে এত খাটাখাটি করছেন, এত লেখালেখি, সব নিজের স্বার্থের জন্য? এ কথা ঠিক, লেখার চিন্তাই তাঁর অনেক সময় খেয়ে নেয়। এক একসময় লেখার মধ্যে একটা সঙ্কট আসে, একটা গল্প লেখার মাঝপথে থমকে যেতে হয়, এরপর গল্পটা কোন্ দিকে যাবে কিছুতেই ঠিক করা যায় না, তখন কী যে অস্বস্তি, কী যে যন্ত্রণা হয়, তা কাউকে বলে বোঝানো যায় না। তখন সত্যিই নিজের স্ত্রীর দিকেও মনোযোগ দেওয়া যায় না, বাড়িতে কী ঘটছে না ঘটছে কিছু খেয়াল থাকে না।

লেখাটা কী শুধু তাঁর শখ? কিংবা শুধু জীবিকা? একটা গল্প না লেখা হলে কী ক্ষতি হবে? বাংলা ভাষায় কত কী লেখা হচ্ছে, তার মধ্যে সুশোভন দাশগুপ্ত একটা গল্প না লিখলে কেউ মাথা ঘামাবে না। সুশোভনকে তবু সেই গল্পটা শেষ করার জন্য মাথা খুঁড়তে হবে কেন? গল্পটির বিনিময়ে যে টাকা পাওয়া যাবে, সেটা এখন তুচ্ছ। তিরিশ বছর আগে সুশোভনের কাছে টাকার প্রয়োজন বা মূল্য যতখানি ছিল, এখন তা নেই। এক পয়সাও দেয় না এমন কিছু কিছু পত্রিকাতেও তিনি লেখা দেন; সেই লেখার সময়েও যে দুশ্চিন্তা, যে আয়ুক্ষয়, সংসারের প্রতি অমনোযোগ, ভিতরে ভিতরে রক্তক্ষয়ের মতো ছটফটানি, তার ব্যাখ্যা কি? খ্যাতির জন্য লোভ? দু'পাঁচটা গল্প কম লিখলে খ্যাতির কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হয়? খ্যাতিই বা এমন কী, কেউ কেউ খুব উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে, কেউ খুব গালাগালি দেয়। কেউ চিঠিতে লেখে, আপনার একলাইনও উত্তর পেলে জীবন ধন্য হয়ে যাবে। সদ্য কবিতার বই বেরুবার পরও কেউ কেউ বলে আপনি আজকাল আর কবিতা একেবারেই লেখেন না? কেউ বলে, আপনার অমুক উপন্যাসটা এত ভাল লাগল! সেটা সুশোভনের লেখাই নয়। এই তো খ্যাতির ধরন! কী হয় এখন থেকে লেখা একেবারে ছেড়ে দিলে? নিজেকে একবার বাজিয়ে দেখা দরকার।

সুশোভন যখন পত্রিকার অফিসে পৌঁছোলেন, ঠিক তখনই ইতালিয়ান মেয়েটি নাম লেখাচ্ছে রিসেপশান কাউন্টারে। সুশোভনের মুখখানা থমথমে হয়ে ছিল, জোর করে হাসি ফোটালেন, মেয়েটিকে নিয়ে এলেন নিজের ঘরে।

মেয়েটির নাম সিলভিয়া, বছর পঁয়তিরিশেক বয়েস, মাথার চুল সোনালি। বব করা নয়, লম্বা চুল পিঠের ওপর ছড়ানো। মেয়েটির মুখখানি ভারি নরম, স্নিগ্ধ চোখ দুটি, কথা বলে খুব আস্তে আস্তে। তার উপস্থিতির মধ্যেই রয়েছে কোমলতা, যদিও সে একা একা দু' মাস ধরে ভারতের নানা জায়গায় ঘুরেছে। নিজে লেখে টেখে, ইতালির একটি ছোট প্রকাশনা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত।

সিলভিয়া বাংলা জানে না। একজন নাম করা পরিচালক সুশোভনের একটি উপন্যাস অবলম্বনে ফিল্ম তুলেছেন, সেই ফিল্ম দু'একটা আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছে, সিলভিয়া দেখেছে সেই ফিল্ম। সুশোভনের উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদ পাওয়া যায়, সেই অনুবাদ থেকে সিলভিয়া ইতালিয়ান ভাষায় অনুবাদ করতে চায়।

সুশোভন জিজ্ঞেস করল, তুমি যে এই বইটির অনুবাদ ছাপবে, বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে কি ইতালিয়ান পাঠকদের আগ্রহ আছে?

সিলভিয়া বলল, সত্যি কথা বলতে কী, বাংলা ভাষা সম্পর্কে ইতালিয়ানরা বিশেষ কিছুই জানে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও এ কালের পাঠকরা চেনে না! আমি চেষ্টা করছি, কিছু কিছু ভারতীয় সাহিত্য আমাদের ভাষায় প্রকাশ করবার জন্য। আমাদের প্রকাশনা সংস্থাটি ছোট, নানরকম পরীক্ষামূলক বই ছাপে, খুব বেশি বিক্রি না হলে, তুমি টাকাপয়সা বিশেষ পাবে না, তবু আমাদের এই প্রচেষ্টায়....

সুশোভন কন্ট্রাক্ট ফর্মে সই করে দিল। রয়ালটি মাত্র পাঁচ শতাংশ। এই বই কবে অনুবাদ হবে, কবে ছাপা হয়ে বেরুবে ঠিক নেই, ছাপা হলেও সুশোভন দু' এক হাজারের বেশি টাকা পাবে না। এর আগেও অন্য ভাষায় অনুবাদের দু'একটা প্রস্তাব কার্যকর হয়নি শেষ পর্যন্ত। প্রাগ শহর থেকে এক প্রকাশক চিঠি দিয়েছিল, তারা সুশোভনের একটি কবিতা সংগ্রহ ছাপতে আগ্রহী, পঞ্চাশটি কবিতা মূল বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ পাঠালে ভাল হয়। কে আর অত জেরক্স ফেরক্স করে তাই সে চিঠির উত্তরই দেওয়া হয়নি।

সিলভিয়াকে লিফ্‌টের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলো সুশোভন। শেষ মুহূর্তে সিলভিয়া হাত বাড়াতে সুশোভন আলতোভাবে স্পর্শ করল, কী নরম হাত। ভারি সুন্দর মেয়েটি।

নিজের চেয়ারে ফিরে এসে একটুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে গেল সুশোভন।

দেবযানীকে সে বলেছিল, একজন তার বই অনুবাদ করতে চায়, সে মেয়ে না পুরুষ, তাতে কিছু আসে যায় না। কথাটা কি সত্যি? অন্য কেউ বিশ্বাস না করুক, সুশোভন নিজে ভালই জানে, অনুবাদের প্রতি তার কোনও মোহ নেই। কেউ অনুবাদ করতে চায় করুক, না করলে বয়ে গেল, এইরকম তার মনোভাব। অনুবাদ ছাপা হলেই তো হাতে স্বর্গ পাওয়া যাবে না, তার পাঠক দরকার। পৃথিবীর অনেক দেশ ঘুরেছে সুশোভন, সে জানে, বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে বেশির ভাগ লোকেরই কোনও আগ্রহ নেই। ভারতীয় সাহিত্য বলতে এখনও অনেকে বোঝে বেদ-উপনিষদ। ছুটকো ছাটকা দু'চারটে আধুনিক সাহিত্যের অনুবাদ বেরোয়, বিশেষ কেউ পড়ে না।

তা হলে? সিলভিয়ার বদলে যদি একজন হুমদো চেহারার পুরুষ হতো, তা হলেও, কি সুশোভন নিজের স্ত্রীর মন খারাপের দিনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রক্ষা করার জন্য ছুটে আসত? অফিসে টেলিফোন করে বলে দিতে পারত না যে আজ সে আসতে পারবে না?

নিজের কাছে অন্তত স্বীকার করা উচিত, সিলভিয়া একটি মেয়ে এবং সুন্দরী বলেই সুশোভন আকৃষ্ট হয়েছে। এটা কি অপরাধ? অন্য কোনও মেয়ের সান্নিধ্য কিছুক্ষণের জন্য ভাল লাগা মানেই কি নিজের স্ত্রীকে কম ভালবাসা? একজন লেখক নিজের স্ত্রী ছাড়া আর কোনও মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করবে না, কাছাকাছি যাবে না, রঙ্গ রসিকতা করবে না, তারপরেও সে লেখক কি লেখক হয়ে বেঁচে থাকতে পারে?

কতখানি কাছাকাছি? সিলভিয়ার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছিল নন্দনে এক চলচ্চিত্র উৎসবে। সেদিনই সুশোভনের উপন্যাসের চিত্ররূপটি দেখানো হচ্ছিল। কেউ একজন আলাপ করিয়ে দেয়। চোখে পড়বার মতো মেয়ে ঠিকই। সিলভিয়া তারপর চলে যায় দক্ষিণ ভারতে। পরশু ফিরে এসে একটা হোটেলে উঠেছে। সেখান থেকে সে টেলিফোন করেছিল, কলকাতার রাস্তাঘাট সে চেনে না, সুশোভন যদি তার হোটেলে

আসে, তাহলে অনুবাদ বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

একটি সুশ্রী বিদেশিনী তার হোটেল কক্ষে ডেকেছে। লেখক না হয়ে সুশোভন যদি শুধু একজন পুরুষ মানুষ হত, তা হলে তার ছুটে যাওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। প্রথম আলাপেই হয়তো ব্যভিচারের প্রশ্ন ওঠে না, কিন্তু নিরালা ঘরে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ সময় কাটানোও তো কম আনন্দের নয়। সুশোভন যেতে রাজি হয়নি, কারণ সে লেখক, একজন প্রকাশক যদি তার অনুবাদ ছাপতে চায়, তাহলে প্রকাশককেই লেখকের কাছে আসতে হবে, লেখক যাবে কেন ? এটা তার অহংকারের জায়গা। সে বলেছিল, ট্যাক্সিতে আমাদর পত্রিকা অফিসের নাম বললেই ঠিক নিয়ে আসবে।

অফিসে তার পাঁচজন লোকের ঘোরাঘুরির মধ্যেও যে সিলভিয়া খানিকক্ষণ বসে ছিল, তাও একেবারে অকিঞ্চিৎকর নয়। খুব সম্ভবত ওই মেয়েটির সঙ্গে জীবনে আর কখনও দেখা হবে না, তবু খানিকটা মৃদু সৌরভ যেন রয়ে গেল। সিলভিয়াকে নিয়ে সুশোভন কোনও দিন কিছু লিখবেন না। কিন্তু ওই সৌরভটুকু তার লেখায় সাহায্য করবে।

যত নারী-পুরুষের সঙ্গে দেখা হয়, কথা হয়, মেলামেশা হয়, তারা সকলেই লেখায় কিছু না কিছু সাহায্য করে। শুধু মেয়েদের নিয়ে তো সাহিত্য হয় না, অসংখ্য পুরুষ চরিত্র থাকে, পুরুষদেরও পর্যবেক্ষণ করতে হয়। লেখক যদি পুরুষ হয়, তা হলে মেয়েদের সান্নিধ্য পাবার আকাঙ্ক্ষা একটু বেশি হওয়াই স্বাভাবিক নয় কি ? লেখিকাদেরও বোধহয় এর উল্টোটাই হয়।

অন্য মেয়েদের সান্নিধ্য পেলে স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা কমে যায় ?

দেবযানীও যে স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের সান্নিধ্যে খুশি হয় না ? বয়েসের নিয়মে বয়েস বেড়েছে, কিন্তু দেবযানীর রূপ এখনও ঝরে যায়নি। একটু সাজগোজ করলে এখনো সত্যিই তাকে বেশ কম বয়েসী মনে হয়। কোনও কোনও পার্টিতে, দেবযানী যখন দূরে দাঁড়িয়ে অন্যদের সঙ্গে গল্প করে। তখন একসময় সুশোভনের মনে হয়, আমার বউটি তো অনেকের চেয়েই সুন্দর ! না সাজলেও সে অসুন্দর নয়। মেয়েরা সাজগোজ করে কেন, স্বামীকে মুগ্ধ করার জন্য ! দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে এটা একেবারেই ঠিক নয়। বাড়িতে যেমন তেমন, বাইরে বেরুবার সময়ই প্রসাধন ও সাজের বাহার। বন্ধু-স্থানীয়রা কয়েকজন দিব্যি ফ্ল্যার্ট করে

দেবযানীর সঙ্গে, দেবযানীও তো বেশ পছন্দ করে। কিন্তু তার একটা সীমারেখা টানা আছে। সুশোভনের নেই ?

অন্তত একজন বন্ধুর সঙ্গে দেবযানীর ব্যবহার সুশোভন ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারে না। চিত্রভানু বিখ্যাত লম্পট, দেবযানীও তা ভালই জানে। চিত্রভানুর অনেক গুণ, যেমন সুপুরুষ, তেমনই পড়াশুনোয় মেধাবী, বড় চাকরি করে, প্রচুর মদ খায়, আর মেয়েদের প্রতি দুর্বলতা সাঙ্ঘাতিক। নিজের স্ত্রীকে সে গ্রাহ্যই করে না, একের পর এক মেয়ের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়েছে, প্রকাশ্যে তাদের নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, নিজের বাড়ি ছেড়ে অন্য মহিলার সঙ্গে কয়েকদিন কাটিয়ে আসতেও সে দ্বিধা করে না। কথাবার্তায় যে-কোনও মেয়েকে সে ভুলিয়ে দিতে পারে। সুশোভনের বাড়িতে এসে সে দেবযানীর সঙ্গেও নানারকম ফস্টিনস্টি করে, তাতে বেশ মুগ্ধ হয় দেবযানী। সুশোভন খুব ভালভাবেই জানে, চিত্রভানু তার স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক পাতাবে না। দেবযানীও সীমারেখাটা ঘুচিয়ে গোপনে চিত্রভানুর সঙ্গে দেখা করবে না। কিন্তু চিত্রভানু নিজের স্ত্রীকে কষ্ট দিয়ে অন্য মেয়েদের সঙ্গে শোয়া-বসা করে জেনেও তাকে কেন পছন্দ করে দেবযানী ?

এবার সম্পাদকীয় লিখতে হবে। কলমটা হাতে নিয়েই সুশোভনের মনে পড়লো, দেবযানী তাকে স্বার্থপর বলেছে। সে সত্যিই স্বার্থপর ? টাকাপয়সা রোজগার করতে হয় নিজের জন্য ? স্বামী-স্ত্রীর সংসারে স্বামী না স্ত্রী, কার জন্য বেশি টাকা খরচ হয় ? খ্যাতি তার নিজস্ব ? এর ভাগ নিতে দেবযানী চায় না ?

কেউ কেউ বলে, শিল্পী মাত্রই স্বার্থপর। অনেকেই এ ধরনের গোলমেলে কথা বলে মন বিষিয়ে দেয়। অনেকদিন আগে চিত্রভানু বলেছিল, মিলি, বিখ্যাত লোকের বউ হওয়া যে কত বিপদের তা তুমি এখনও বুঝছ না। ওই সুশোভনটা যত বিখ্যাত হবে, তত তুমি একা হয়ে যাবে !

এই কথাটা দেবযানীর মনে গেঁথে আছে, ঝগড়ার সময় প্রায়ই বলে। এটা কি একটা আপ্তবাক্য ? চিত্রভানুকে তার বন্ধুবান্ধবের গন্ডির বাইরে বিশেষ কেউ চেনে না, সে বিখ্যাত ব্যক্তি নয়, কিন্তু সে তার স্ত্রীকে একা করে দেয়নি ? অনেক স্বামী-স্ত্রীকে দেখেছে, যারা নেমন্তন্ন বাড়িতে একসঙ্গে যায়, বাড়িতে অতিথিদের ডাকে, বাইরে থেকে কিছু বোঝা

যায় না, কিন্তু আসলে তাদের মধ্যে কোনও সম্পর্কই নেই। শুধু চকচকে হাসিখুশি মলাট, ভেতরটা সাদা। এই ধরনের ব্যাপারকে খুব ভয় পান সুশোভন। প্রথম বয়েসের প্রেম পরবর্তী জীবনে দয়া, মমতা, স্নেহ, পারস্পরিক নির্ভরতা এইসব কিছুর মধ্যে ছড়িয়ে থাকে। যতই বয়েস হোক, ইয়ার্কি-খুনসুটির ভাবটাও প্রেমেরই একটা প্রকাশ।

কেন একা হয়ে যাবে দেবযানী? সুশোভন সচেতনভাবেই দেবযানীকে নিজের দিকে টেনে রাখে। এই বয়েসে রাস্তায় হাত ধরাধরি করে বেড়ানো যায় না, কিন্তু একটা বই পড়তে পড়তে দেবযানীকে ডেকে শোনায়। নিজের লেখার ব্যাপারে দেবযানীর মতামতের গুরুত্ব দেয়। আজকাল আর মাঝরাত পর্যন্ত বন্ধুদের সঙ্গে থাকে না, বন্ধুর সংখ্যা কমে গেছে অনেক, কমতে কমতে প্রায় শূন্যতার কাছাকাছি এসে যাচ্ছে। কোথাও গেলে দেবযানীকে সঙ্গে নিতে চায়, কিংবা বাড়িতেই বেশিরভাগ সময় থাকে। অবশ্য লেখার সময়টায় দেবযানীর দিকে মনোযোগ দিতে পারে না। লেখার সময়টাই যে তার জীবনের বেশির ভাগ অংশ দখল করে নিচ্ছে।

বাড়িতে একটা ফোন করলেন সুশোভন। দিলীপ তুলে বলল, বউদি ঘুমোচ্ছেন বোধহয়, দরজা বন্ধ। ডাকব?

সুশোভন জিজ্ঞেস করলেন, বউদি খেয়েছে? আচ্ছা ঠিক আছে, ডাকতে হবে না!

একটা সম্পাদকীয় লিখতে বড়জোর এক-দেড় ঘণ্টা লাগে, আজ আর কলম চলছেই না। বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছেন সুশোভন। সমস্ত যুক্তি-তর্কের পরও একটা সত্য জেগে থাকে, দেবযানীর আজকাল প্রায়ই মন খারাপ হয়, নিজেকে সে নিঃসঙ্গ ও অবহেলিত মনে করে, এজন্য সুশোভন নিশ্চয়ই কিছুটা দায়ী! তার কী করা উচিত? ছেলে থাকে বিদেশে, সুশোভনের মা থাকেন অন্য ভাইয়ের কাছে, দেবযানীর মা-বাবা দু'জনেই খুব কাছাকাছি সময়ের মধ্যে চলে গেছেন। বাড়িতে শুধু এখন স্বামী-স্ত্রী। সুশোভনকে ব্যস্ত থাকতেই হয়, বড় বেশি ব্যস্ততা, কিছুটা অকারণেও বটে, নানা লোকের উপরোধ-অনুরোধ রাখতেও অনেক সময় চলে যায়। তা ছাড়া ছোটবেলা থেকে এমনই অভ্যেস করে ফেলেছেন সুশোভন যে চোখের সামনে অক্ষর ছাড়া থাকতে পারেন না। হয় লিখছেন, অথবা বই পড়ছেন। খাবার টেবিলও বই পাশে খুলে

রাখেন। দেবযানী তাই বলেন, তোমার সঙ্গে কথা বলব কখন, সর্বক্ষ
তোমার লেখা আর বইপড়া।

দেবযানী নিজেও একসময় বই পড়তে খুব ভালবাসতেন। ম
অশান্ত থাকলে কিছু পড়া যায় না।

অন্য মেয়েদের সম্পর্কে দেবযানীর উষ্মা মাত্র কয়েক বছর শু
হয়েছে। আগে এরকম ছিল না। দেবযানী কী ভাবে, এই বয়েসে অন
কোনও মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে সুশোভন সংসার ভাঙবেন? তাঁদে
সুদীর্ঘ বিবাহিত জীবন কখনও চিড় খায়নি।

ঝগড়ার সময় দেবযানী প্রায়ই বলেন, তোমাকে বিয়ে করা আমা
ভুল হয়েছে। সুশোভনের মুখ দিয়ে কখনও এরকম কথা বেরোয় না
তাঁর মনের গোপনেও কখনও এরকম চিন্তা আসেনি। কখনও মনে হয়নি
অন্য কোনও নারীকে বিয়ে করলে ভাল হত। যখন মন প্রফুল্ল থাকে
তখন দেবযানী সত্যিই খুব আকর্ষণীয়া, এমন একটা অনাবিল সারল
আছে, যা খুব দুর্লভ। মিথ্যে ওজর কিংবা কোনও কিছু ভাল ভা
না জেনে হঠাৎ আলগা মন্তব্য করা সে ঘোর অপছন্দ করে। সুশোভ
অনেক সময় ভেবে দেখেছেন, খাঁটি মানুষ হিসেবে। হিউম্যা
কোয়ালিটির বিচারে দেবযানীর স্থান তাঁর থেকে বেশ উঁচুতে।

আজকাল মাঝেমাঝেই দেবযানীর মন প্রফুল্ল থাকে না। তখ
রাজ্যের হতাশা তাঁকে পেয়ে বসে। ডিপ্রেশান। যৌবনে প্রান্তসীমায় এসে
ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গেলে মেয়েদের নাকি এরকম মানসিক নিম্নচাপ আসে
তখন পুরুষদের উচিত তাদের সর্বক্ষণ দু'বাহু দিয়ে ঘিরে রাখা, এরক
ডাক্তারি মতামত সুশোভন একটা প্রবন্ধে পড়েছেন। সব পুরুষ তা পারে
সুশোভনের চেয়েও তো আরও কত ব্যস্ত, কত বিখ্যাত মানুষ আছে
তাদের সংসারে কী হয়?

যৌবন-হারানোটা মেয়েরা সহজে মেনে নিতে পারে না। সে
তুলনায় পুরুষরা বোধহয় অনেক সহজে বার্ধক্যের দিকে চলে যায়
আরও একটা তফাত আছে। বয়েসের দিক দিয়ে পুরুষরা বুড়ো হয়
চুল-দাড়ি পাকে, কিন্তু যৌবনক্ষমতা যায় না তখনও। সুশোভনে
এখনও লিবিডো প্রবল।

সম্পাদকীয়টা শেষপর্যন্ত লেখা হল বটে, কিন্তু তেমন ভাল হ
না। একটা এরকম লেখা একটু ভালো হল, না একটু খারাপ হল, ত

নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। কিন্তু যে লেখে তার মনটা কিছুক্ষণ ভার হয়ে থাকে, নিজের কাছেই অপরাধ বোধ হয়।

টেবিলের সামনে একজন কাঁচাপাকা দাড়িওয়ালা প্রৌঢ় ও একটি সিল্কের শাড়ি পরা, অতিরিক্ত সাজগোজ করা যুবতী এসে দাঁড়িয়েছে। হাসি হাসি মুখ। প্রৌঢ়টি বলল, স্যার, আপনি রেডি ?

বিস্ময়ে ভুরু তুলে সুশোভন জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার ?

মেয়েটি বললো, পাঁচটা বাজে, আমরা গাড়ি এনেছি।

সুশোভন তবু জিজ্ঞেস করলেন, গাড়ি ? কোথায় যাব ?

প্রৌঢ়টি বলল, স্যার, আমার নাম অরুণ, চিনতে পারছেন না ? ব্যারাকপুরে আমাদের লাইব্রেরিতে আপনার সম্বর্ধনা, আপনাকে কার্ড দিয়ে গেছি।

সুশোভনের চোখের সামনে যেন একটা পর্দা, পিছনের দৃশ্যটির সম্পূর্ণ মন থেকে মুছে গেছে। এই অরুণ তাঁর এক বন্ধুর ভাই, তিনি ভালই চেনেন, মেয়েটিও অচেনা নয়, তবু কয়েক মুহূর্তের জন্য তিনি এদের একেবারেই চিনতে পারেননি। আজকের ওই লাইব্রেরির অনুষ্ঠানের কথা তিনি একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন।

পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছে তিনি বললেন, আমি তো আজ যেতে পারছি না।

নারী-পুরুষ দু' জন যেন আঁতকে উঠল। ভয়ার্ত স্বরে পুরুষটি বলল, সে কি ? সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে, আপনি না গেলে....সবাইকে জানানো হয়ে গেছে, লোকে আমাদের মারবে, চলুন, চলুন, স্যার।

বন্ধুর ভাই, তবু স্যার স্যার বলছে কেন ? সুশোভন যদি এখন জানান যে আমি আজ যাব না, কারণ আমার মন ভাল নেই, সে অজুহাত এরা কিছুতেই মানবে না। মনকে কেউ গুরুত্ব দেয় না। যদি বলেন, আমার খুব শরীর খারাপ, বুক ব্যথা করছে, তা হলে হয়তো ভয় পেতে পারে। কিন্তু সুশোভনের দোষ এই যে তিনি শরীর খারাপের কথা কক্ষণও প্রকাশ্যে বলেন না। এমনকি মাঝেমাঝে সত্যি বুকে ব্যথা হলেও স্ত্রীকে জানান না। তিনি নিজের শরীর ও অসুখ-বিসুখ নিয়ে আলোচনা করার ঘোর বিরোধী।

সুশোভন সম্পর্কে এরকম জনরব আছে যে তিনি কথা দিলে কথা রাখেন। যে অনুষ্ঠানে যেতে পারবেন না আগেই জানিয়ে দেন। যাওয়ার

প্রতিশ্রুতি দিলে নিশ্চিন্ত। সুশোভন আজ কিছুতেই যাবেন না ঠিক করেছেন, তবু প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার জন্য অস্বস্তিবোধ করছেন। তাকে অস্বস্তি থেকে উদ্ধার করল মেয়েটি। সে বলল, স্যার, চুনী গোস্বামী আর প্রদীপ ঘোষ গাড়িতে বসে আছেন। আপনি যাবেন শুনে ওঁরা রাজি হয়েছেন।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সুশোভন বললেন, চুনী গোস্বামী, প্রদীপ ঘোষ, বাঃ তবে আর চিন্তা কী! একজন না গেলে কোনও ক্ষতি নেই, লোকে ওঁদের দেখলেই খুব খুশি হবে। তোমরা ওদের দু'জনকে বলো, আমি ক্ষমা চাইছি, আমার আজ বিশেষ অসুবিধে আছে, তাই যেতে পারছি না।

আরও মিনিট দশেক ধস্তাধস্তি করার পর সুশোভনের জেদটা জয়ী হল. ওরা চলে যাবার পর সুশোভন বাড়িতে আবার ফোন করলেন।

শুধু রিং হয়ে যাচ্ছে, কেউ ধরছে না। একবার কেটে দিয়ে আবার। কোনও সাড়া নেই। দিলীপ বিকেলের দিকে পাড়া বেড়াতে যায়। দেবযানী কি বাথরুমে গা ধুচ্ছে? কিংবা বাড়ি থেকে বেরিয়েছে? 'একদিন ফিরে এসে যদি আমাকে আর দেখতে না পাও?' ঝোঁকের মাথায় হুট করে বেরিয়ে যাওয়া দেবযানীর পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। যখন রাগ চরমে ওঠে, তখন অগ্রপশ্চাৎ জ্ঞান থাকে না। টাকাপয়সার হিসেব করে, জিনিসপত্র গুছিয়ে ও কখনও যাবে না। 'আমি একলা একলা কোথাও চলে যাব একদিন। কোথায় যাবে? ওর বাপের বাড়ি নেই। সেরকম কোনও ঘনিষ্ঠ বান্ধবীও নেই। 'জঙ্গলের পাশে, এক নির্জন নদীর ধারে—'

হয়তো ফল্‌স অ্যালার্ম। দেবযানী কাছাকাছি কোনও দোকান-টোকানে গেছে। কেন নিজের মনের মতো সাজানো সংসার ছেড়ে সে চলে যাবে? কত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বীভৎস সংঘর্ষ হয়। মারামারি, গালাগালি, আরও বিশ্রী ব্যাপার চলে। তৃতীয় একজন, নারী কিংবা পুরুষ এসে উৎপাত বাধায়, সুশোভন আর দেবযানীর মধ্যে সেরকম কখনও কিছু হয়নি। ছোটখাটো, ঝগড়া, রাগারাগি তো মাঝে মাঝে হবেই, দুজন নারী-পুরুষ কি সব সময় হাসি হাসি মুখ করে থাকতে পারে? কিন্তু পরস্পরের বিরুদ্ধে কোনও গুরুতর অভিযোগ নেই। দেবযানীকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, আপনি কেন আপনার স্বামীকে ছেড়ে এলেন? দেবযানীর একমাত্র উত্তর হতে পারে, আমার স্বামীর আমার জন্য কোনও

সময় নেই। সময় ! টেনে লম্বাও করা যায় না, সঙ্কুচিতও করা যায় না। শুরুও নেই, শেষও নেই। এই এক অনন্ত প্রবাহের মধ্যে আমরা লুটোপুটি খাচ্ছি। ব্রাউনিং-এর একটা কবিতার লাইন মনে পড়ে ; 'আউট অফ অল ইন্তর লাইফ, গিভ মি বাট আ সিঙ্গল মোমেন্ট। মাত্র একটি মুহূর্ত !

সুশোভন এখন বাইরের আড্ডা অনেক কমিয়ে এনেছেন। সারাদিনে বাড়ির বাইরে পাঁচ-ছ ঘণ্টার বেশি থাকেন না। ঘুম সাত ঘণ্টা। লেখার জন্য বড়জোর চার ঘণ্টা সকালের দিকে। বাকি রইল আরও সাত ঘণ্টা। এই সময়টা কার জন্য ? বই পড়া আছে, বন্ধুবান্ধব, দর্শনপ্রার্থী। পত্র-পত্রিকার সম্পাদক, নবীন কবি লেখকদের আসা-যাওয়া আছে, এইসব মিলিয়েই তো জীবন।

ব্যারাকপুরে যাবার কথা মনে ছিল না বলেই সুশোভন নিজের গাড়ি ছেড়ে দেননি। দেবযানী বাড়ি নেই, এটা জানার আগেই সুশোভন ঠিক করেছিলেন ব্যারাকপুরে যাবেন না। প্যানিক করার দরকার নেই, বাড়িতে গিয়ে অপেক্ষা করে দেখা যাক।

বিকেলের রাস্তার মোড়ে মোড়ে ট্র্যাফিক জ্যাম। সুশোভন আপাত শান্তভাব বজায় রাখার চেষ্টা করলেন। দেবযানী যদি সত্যিই ঝোঁকের মাথায় কোথাও চলে গিয়ে থাকে, তা হলে কোথায় তার খোঁজ করা হবে। পুলিশের ওপর মহলের কয়েকজনের সঙ্গে সুশোভনের ভাল পরিচয় আছে, কিন্তু প্রথমেই পুলিশের সাহায্য নেবার দরকার নেই। হঠাৎ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে দেবযানীর বিপদে পড়ার সম্ভাবনা আছে খুবই। বুদ্ধিমতী, কিন্তু বাস্তববুদ্ধি তেমন নেই ওর। অনেক দিন আগে একবার সুশোভন বাড়ি ফিরতে খুব দেরি করে ফেলেন। তখন নিয়মিত আড্ডা ছিল পার্ক স্ট্রিটের এক পানশালায়। কয়েকজন প্রবাসী বন্ধুর পাল্লায় পড়ে রাত হয়ে গিয়েছিল অনেক। প্রায় সাড়ে বারোটার সময় গাড়িতে ফিরছিলেন সুশোভন, ড্রাইভার হঠাৎ বলল, উল্টোদিকের এক ট্যাক্সিতে বউদিকে দেখলাম মনে হল ! সুশোভন সাঙ্ঘাতিক চমকে গিয়েছিলেন। এত রাতে দেবযানী একা ট্যাক্সিতে কোথায় যাচ্ছে। ড্রাইভারের দেখতে ভুল হয়নি তো। গাড়ি ঘুরিয়ে সেই ট্যাক্সিকে তাড়া করা হল, খুব জোরে গিয়ে সুশোভনের গাড়ি সেই ট্যাক্সির সামনে রুখে দাঁড়াল। সত্যিই দেবযানী ! ট্যাক্সি চালাচ্ছিল একটি অল্পবয়েসী ছেলে,

তার হেলপারটিও সেরকম। এইরকম ব্যাপার দেখে ড্রাইভারটি বলে উঠেছিল, দেখুন স্যার, আমাদের কোনও দোষ নেই। ভদ্রঘরের মেয়েছেলে, এত রাতে পার্ক স্ট্রিট যেতে চান শুনে আমিই বলেছিলুম, দিদি, সেখানে কেন যাবেন, আজ অনেক রাস্তায় হেভি গণ্ডগোল। তা উনি বললেন, আমি আমার স্বামীকে খুঁজতে যাচ্ছি, আপনারা কথা দিন আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবেন না, আমাকে ভুল রাস্তায় নিয়ে যাবেন না! আমরা তাই বাধ্য হয়ে—

সেদিন কলকাতায় কী একটা উপলক্ষে কিছু ভাঙচুর, ট্রাম-বাসে আগুন আর বোমাবাজি হয়েছিল, পার্ক স্ট্রিটে অবশ্য তার কোনও প্রভাব পড়েনি। টিভিতে সেই গণ্ডগোলের খবর দেখে, স্বামীর ফেরার জন্য অপেক্ষা করতে করতে উতলা হয়ে শেষ পর্যন্ত দেবযানী একা রওনা হয়েছিল পার্ক স্ট্রিটের দিকে। ট্যাক্সি ড্রাইভারটি ভাগ্যিস ভাল ছিল, পাজি-বদমাসও হতে পারত!

ঘটনাটা মনে পড়তেই সুশোভনের বুকটা টনটন করে উঠলো। নিজের জীবনের সাঙ্ঘাতিক ঝুঁকি নিয়ে দেবযানী স্বামীকে খুঁজতে বেরিয়েছিল, কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতন, কিন্তু কতটা টান থাকলে....। এই দেবযানীই রাগের মুহূর্তে বলে, তোমাকে বিয়ে করে আমি ভুল করেছি। আরও অনেক রূঢ়-নির্মম কথাও বলে, কিন্তু রাগের সময়কার সেইসব কথা আসলে অর্থহীন। অনেকে যেমন অর্থের কথা না ভেবেই শালা-বাঞ্চোৎ বলে। সুশোভন কক্ষণও এরকম শব্দ উচ্চারণ করেন না, তিনি যে ভাষার কারবারি, কোনওরকম অর্থহীন বা ভুল ভাষা ব্যবহার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। অনেক সময় দেবযানীর ওইসব অর্থহীন রাগের ভাষা বিশ্বাস করে ফেলে তিনি কষ্ট পান।

দেবযানী আজ ঠিক রাগ করেনি, তার কণ্ঠস্বর ছিল, ভাঙাভাঙা, বেদনার্ত উদাস। ভিতরে ভিতরে সত্যি ওর নিঃসঙ্গতার গভীর কষ্ট হচ্ছিল, সুশোভন খানিকটা চঞ্চল মনের বলে তখন ঠিক বুঝতে পারেননি। যদি সত্যিই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চায়। পাগলামি করে যদি হাওড়া স্টেশনে গিয়ে কোনও ট্রেনে চেপে বসে? জঙ্গলের ধারে নির্জন নদীর তীরে কুঁড়েঘর বেঁধে থাকার স্বপ্ন....পৃথিবীতে ওরকম জায়গা কোথাও নেই, যেখানে একটি রমণী একা ঘর বেঁধে থাকতে পারে....। দেবযানী সেরকম কিছু করতে গেলে বিপদে পড়বেই, একা একা, অসহায়, চতুর্দিকে হিংস্র পশুরা ঘুরে

বেড়াচ্ছে, দেবযানীর সরলতার সুযোগ নিয়ে....না, না, এসব ভুল ভাবনা। ওরকম একা থাকার ইচ্ছা মানুষের হয়, তা বলে কি সত্যি ঘর ছেড়ে চলে যায় ? না, তা হয় না, দেবযানী বাথরুমে ছিল বলে ফোন ধরতে পারেনি, কিংবা পাশের কোনও ফ্ল্যাটে গেছে।

গাড়িটা যাচ্ছে রেড রোড ধরে। এদিকটা ফাঁকা। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাশ দিয়ে হাত ধরাধরি করে যাচ্ছে একজোড়া যুবক-যুবতী। ওরা পৃথিবীর আর কিছু দেখছে না। বিয়ের আগে দেবযানীর সঙ্গে এখানে দেখা হত। সবচেয়ে ভালো লাগত বৃষ্টির দিনে, আর কেউ থাকত না প্রায়। দুটি পাখির মতো বৃষ্টিতে সেই স্নান....না, এ জীবনে আর ওসব হবে না। এখন দেবযানীকে নিয়ে এখানে কোনওদিন বেড়াতে এলে কেউ না কেউ সুশোভনের কাছে এসে অটোগ্রাফ চাইবে।

ভবানীপুরের রাস্তায় আবার জ্যাম। বাড়ি পৌঁছোবার জন্য ছটফট করছেন সুশোভন। কেন কেউ ফোন ধরল না ? না, না, দেবযানী, কোথাও যেও না, প্লিজ, আমার ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করো—।

তবু যেন সুশোভন মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, হাওড়া স্টেশনে গিয়ে দেবযানী উদভ্রান্তের মতো একটা ট্রেনে উঠছে। ট্রেনটা ছেড়ে গেল নিরুদ্দেশের দিকে। একটা আটপৌরে শাড়ি পরা, চুলটাও ভাল করে বাঁধেনি, হাতে শুধু একটা হ্যান্ড ব্যাগ....দু' চোখে থমথমে কান্না....। জোর করে ছবিটা মুছে দিতে চাইছেন সুশোভন।

ঝট করে দরজা খুলে রাস্তায় নেমে পড়ে সুশোভন ড্রাইভারকে বললেন, তুমি গাড়িটা যখন পারো নিয়ে এসো, আমি হেঁটে যাচ্ছি।

হনহন করে হাঁটতে লাগলেন সুশোভন। বাড়ি আর খুব বেশি দূর নয়। হঠাৎ দুটি ছেলে সামনে দাঁড়িয়ে পথ আটকাল। প্রণাম করল পা ছুঁয়ে। একজন বলল, স্যার, আপনার ওই ধারাবাহিক লেখাটায়.... ওই চরিত্রটা কি কাল্পনিক ? অনেকদিন আপনার কবিতা পড়িনি....

সাদা চোখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে শান্তভাবে সুশোভন বললেন, পরে কথা হবে, এখন আমি ব্যস্ত আছি—

পাঁচ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেলেন বাড়িতে। লিফট নীচে নামা পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে পারছেন না। আরও অনেক লোক আছে, প্রত্যেক তলায় লিফট থামছে। সুশোভন অবশ্য নামলেন একা। বুক কাঁপছে, বুক কাঁপছে। কলিং বেলে হাত দিলেন সুশোভন।

দুবার, তিনবার বাজল। কোনও সাড়া নেই। দেবযানী ঘুমি
আছে ? বাথরুমে থাকলে বেল শোনা যায় না। দিলীপটা কোথায় গেল
সুশোভন বেলটা বাজাতেই লাগলেন, বাজাতেই লাগলেন, যে
দেবযানীকে ভিতরে থাকতেই হবে, বাথরুমের দরজা ভেদ করে এ
শব্দ যাবে।

পরের বার লিফট আসার পর লিফটম্যান বলল, স্যার বউদি ে
বেরিয়ে গেছেন ?

লিফটম্যানের গলায় কোনও উৎকণ্ঠা নেই। মাঝে মাঝেই যে রক
বেরোয় দেবযানী, যেন সেইরকমই। তেমনই তো হবে। যদি চিরকালে
মতো বেরিয়ে যেতে চায়, তা হলেও কি দেবযানী লিফটম্যানকে জানি
যাবে ?

সুশোভন জিজ্ঞেস করলেন, আর দিলীপ কোথায় গেছে ?

লিফটম্যান বলল, তাকে দেখিনি।

সুশোভন আবার জিজ্ঞেস করলেন, বউদি কখন বেরিয়েছে ?

লিফটম্যান বললেন, অনেকক্ষণ আগে, মনে হয় তখন চারটে বে
গেছে।

সুশোভন বললেন, ঠিক আছে, নীচে খোঁজ করে দেখো তো দিলী
আছে কি না।

সুশোভনের কাছে চাবি থাকে না। আজ তাঁর এই সময় ফেরা
কথাও নয়। ব্যারাকপুরে গেলে রাত দশটার আগে ফেরা যেত না
দেবযানী তাইই জানে।

সত্যি চলে গেছে দেবযানী ? একজন নারী যদি গৃহত্যাগ করতে
চায়, তা হলে ঠিক কখন চলে যায় ? স্বামী বেরিয়ে যাবার একটু পরেই
কিংবা দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে নিয়ে ? কিংবা সন্ধের অন্ধকা
নামলে ? পুরুষরা সংসার ছাড়ে ভোর রাতে, ঘুমন্ত স্ত্রীকে ফেলে রেখে
ন'দের নিমাইয়ের মতো।

বিকেল চারটের সময় গনগনে রোদ ছিল, তখন দেবযানী কোথা
গেল ? গাড়ি নেই, ট্যাক্সি ডেকেছে ! বাসে চেপে গেছে ? আর দিলীপটা
বা কোথায় গেল !

তাঁর বন্ধু নজরুল পুলিশের একজন বড়কর্তা, তাঁকে ফোন করবেন
নজরুল হুলস্থুল বাধিয়ে দেবে।

নিরুদ্দেশের ট্রেনটা ছুটছে না থেমে, জানলার কাছে বসে আছে দেবযানী, কী করুণ আর নিঃস্ব দেখাচ্ছে তাকে, বুকটা মুচড়ে উঠল সুশোভনের। ভুল হয়েছে, অনেক ভুল হয়েছে। যুক্তি থাক বা না থাক, দেবযানী কষ্ট পেয়েছেন এটা তো ঠিক। সুশোভন কেন তা বোঝেননি। কেন সেই বেদনার মর্যাদা দেননি ? আনন্দ ভাগ করে নেওয়া যায়, বেদনা বুঝি ভাগ করে নেওয়া যায় না ?

দেবযানী কি কোনও চিঠি লিখে রেখে গেছে ? সুশোভন ফিরে এলে কী করে ঢুকবে সে ব্যবস্থাও সে করে যাবে না ? ফ্ল্যাটের ভিতরে না গিয়ে, সব ব্যাপারটা না বুঝে এখনই কাউকে খবর দেওয়া ঠিক হবে না।

লিফট আবার ফিরে আসতেই সুশোভন সচকিত হয়ে তাকালেন। নামল একজন অচেনা। অন্য ফ্ল্যাটে যাবে। লিফটম্যান বলল, স্যার দিলীপকে তো দেখছি না, আপনি নীচে গিয়ে বসবেন ?

সুশোভন বললেন, না ঠিক আছে।

দু' পাশের অন্য দুটি ফ্ল্যাটের মানুষজনের সঙ্গে খুবই সদ্ভাব আছে, ইচ্ছে করলেই যে-কোনও ফ্ল্যাটে বসা যায়। সুশোভন কিছুক্ষণের জন্য অন্য কোথাও থেকে ঘুরে আসতে পারেন। গেলেন না, দাঁড়িয়ে রইলেন দরজার পাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে। বন্ধ দরজার ওপাশের শূন্যতার গর্ভে কী রহস্য আছে কে জানে !

সুশোভনের কাছে প্রায় চারশো টাকা আছে। এক কাজ করলে হয় না ? সুশোভনও যদি এক্ষুনি হাওড়া স্টেশনে গিয়ে যে-কোনও ট্রেনে টিকিট না কেটে উঠে পড়েন তো কেমন হয় ? দু' জনের নিরুদ্দেশ যাত্রা কি কোথাও মিলবে ?

দেবযানী বিষটিষ খেয়ে ফেলেনি তো ? কিংবা শাড়িতে আগুন লাগিয়ে....। যার যত সব আজে বাজে চিন্তা। কে যেন লিখেছিল, অতি প্রিয়জন সম্পর্কেই যত সব খারাপ খারাপ দুর্ঘটনার কথা মনে আসে। মা ছেলেকে ইস্কুলে পাঠাবার সময় মনে মনে বলে, যেন গাড়ি চাপা না পড়ে !

লিফটটা কতবার উঠছে, নামছে। ইচ্ছেশক্তি দিয়ে দেবযানীকে ফিরিয়ে আনা যায় না ? সুশোভন সেরকম মনের জোর পাচ্ছেন না। মনটা ক্রমশ দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। অনেকদিন কাঁদেননি, তবু ভিতরে ভিতরে ঝরছে কান্না। দেবযানীর একটা স্বপ্নের জগৎ আছে, সেখানে সুশোভন

অনেক সময় ঢুকতে পারেন না। সাতাশ বছর একসঙ্গে থাকলেও কি স্বামীস্ত্রী পরস্পরকে পুরোপুরি চিনতে পারে? না, কোনও মানুষের পক্ষেই একবারে স্বচ্ছ হওয়া সম্ভব নয়।

হঠাৎ সুশোভনের মনে হল, আর লিখে টিখে কী হবে? বেঁচে থাকারই বা আর কী দরকার। ছেলে বিদেশে আছে, ভাল আছে, তার জন্য দুশ্চিন্তা নেই। এই ফ্ল্যাটটা, বইয়ের রয়ালটি থেকে যে টাকা পাওয়া যাবে, তাতে দেবযানীর বাকি জীবনটা কেটে যাবে। সুশোভন দাশগুপ্তের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে এই পৃথিবী থেকে। তাঁকে বাদ দিয়েও বাংলা সাহিত্য রমরমিয়ে চলছে। দূর ছাই, আর ভাল লাগে না। 'এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু নামাও, ভারের বেগেতে চলেছি কোথায় এ যাত্রা তুমি থামাও—'। কয়েকটা ডাক্তারখানা ঘুরে সত্তর-আশিটা ঘুমের বড়ি জোগাড় করা এমন কিছু শক্ত নয়, তারপর ঘুম, গভীর, লম্বা ঘুম, আর কী আরাম, একেবারে নিশ্চিন্তপুরে যাত্রা—।

মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিলেন সুশোভন। এ সব কী হচ্ছে? এও তো ডিপ্রেশন, পুরুষ মানুষের ডিপ্রেশন হতে নেই, পুরুষ মানুষদের কাঁদতে নেই। তিনি একটা সিগারেট ধরালেন।

এক ঘণ্টা দশ মিনিট বাদে লিফ্‌ট থেকে নামলেন দেবযানী। সরল বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কখন এলে?

সুশোভনের বুক কাঁপছে। ধড়াস ধড়াস শব্দ হচ্ছে। অতিকষ্টে নিজেকে দমন করে খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন, এই তো একটু আগে।

ব্যাগ থেকে চাবি বার করতে করতে দেবযানী বললেন, তোমার ফিরতে রাত হবে বলেছিলে, তাই দিলীপকে নটা পর্যন্ত ছুটি দিয়েছি, ওর ছোট ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেছে।

সুশোভন জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

দেবযানী বললেন, দিদির বাড়িতে। টুকুনের খুব জ্বর, দিদির আবার কাজের লোক নেই, তাই টুকুনের পাশে কিছুক্ষণ বসেছিলাম। ভাগ্যিস চলে এলাম, না হলে তুমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে! পাশের ফ্ল্যাট থেকে দিদির বাড়িতে একটা ফোন করে দেখলে পারতে।

সুশোভন বললেন, ঠিক। সে কথাটা মনে পড়েনি। তুমি দিদির বাড়ি থেকে এত তাড়াতাড়ি চলে এলে কেন?

দেবযানী বললেন, এমনিই, টুকুন ঘুমিয়ে পড়ল, ভাবলাম বাড়িতেই

যাই। রথীদা এদিকে আসছিলেন, আমাকে নামিয়ে দিলেন। টিভি-তে একটা ভাল ফিল্‌ম আছে, দেখবে? নাকি তোমার লেখা আছে?

সুশোভন বললেন, হ্যাঁ দেখব, না লেখা টেখা কিছু নেই।

পরপর আলোগুলো জ্বাললেন দেবযানী। ভুরু পরিষ্কার, মুখে হালকা ভাব ছড়ানো, দুপুরের মেজাজ কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেছে। সুশোভন কত আজে বাজে কথা ভেবে মরছিলেন।

দেবযানী জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ব্যারাকপুর গেলে না কেন?

ইচ্ছে করেই যাইনি, তোমার জন্য যাইনি, এরকম কথা বললে পাছে অবিশ্বাস্য শোনায়, তাই সুশোভন বললেন, ওদের ওখানে কী যেন একটা গোলমাল হয়েছে, তাই অনুষ্ঠানটা পিছিয়ে গেছে।

দেবযানী ওষ্ঠ উল্টে বললেন, ভালই হয়েছে। সম্বর্ধনা মানে তো একটা তামার প্লেট কিংবা একটা ঝ্যালঝেলে পাঞ্জাবির কাপড় দেবে, ও সবের জন্য অতদূর যাওয়ার কোনও মানে হয়!

টেবিলের ওপর একটা পত্রিকা পড়ে আছে। সেটা তুলে নিয়ে দেবযানী আবার বললেন, তুমি এই পত্রিকায় কমল দত্ত নামে একজনের লেখা পড়েছ?

ডাকে যত পত্রপত্রিকা আছে, তার সবকিছুই সুশোভনের পড়া হয় না, সময় পান না। কিন্তু দেবযানী সব পড়েন। সুশোভন বললেন, না, পড়িনি, কী আছে তাতে?

দেবযানী বললেন, দুপুরবেলা পড়ছিলাম, পড়তে পড়তে এমন রাগ হয়ে গেল। লোকটা লিখেছে, তুমি নাকি অতীত কাল নিয়েই শুধু লেখো, তুমি অতীত বিলাসী, বর্তমান কাল নিয়ে কিছু লেখো না, এখনকার জীবন নিয়ে কিছু লিখতে ভয় পাও। কী বাজে কথা! তোমার অমুক অমুক বইটা একালের কথা নয়! তোমার বেশির ভাগ লেখাই তো সমসাময়িক জীবন নিয়ে, তুমি নকশালদের নিয়ে যেটা লিখেছো, এরা কিছু পড়ে না, না পড়ে দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো মন্তব্য করে।

সুশোভন বললেন, ওই কমল দত্ত নামের লোকটিকে একটা ধন্যবাদ জানাতে হবে তো!

দেবযানী বললেন, কেন?

সুশোভন বললেন, ওর লেখা পড়ে রেগে গিয়ে তুমি দুপুরবেলা আমার ওপর যে রাগ করেছিলে, সেটা ভুলে গেছ। ভদ্রলোক আমার উপকারই করেছেন।

হেসে, ভ্রূভঙ্গি করে দেবযানী বললেন, মোটেই না। সেসবও ভুলিনি। সেসব নিয়ে অনেক কথা আছে। এই, তুমি চা খাবে? সিনেমাটা শুরু হতে একটু দেরি আছে, আগে একটু চা খাওয়া যাক।

সুশোভন বললেন, আমার সাঙ্ঘাতিক চা-তেষ্টা পেয়েছে।

সত্যিই তাই, দেবযানীকে সহজ, স্বাভাবিক, এমনকি কিছুটা উচ্ছল দেখে সুশোভনের বুকের পাষাণভার নেমে গেছে, অনুভূতিগুলি সব ফিরে এসেছে। তেষ্টা পেয়েছে, খিদেও পেয়েছে।

রান্নাঘরে গিয়ে গ্যাস জ্বালালেন দেবযানী। সুশোভন দেখলেন, ফ্রিজের ওপর একটা প্লাস্টিকের কোটো ভর্তি পিস্টাশিও বাদাম রয়েছে। যতক্ষণ চা তৈরি হয়, ততক্ষণ খোলা ভেঙে ভেঙে এই বাদাম খাওয়া যেতে পারে। কয়েকটা বাদাম খেলেন, তারপর ভাবলেন, একা একা খাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না।

রান্নাঘরে এসে দাঁড়ালেন দেবযানীর গা ঘেঁষে। তার একটা হাত নিয়ে মুঠোর মধ্যে দিলেন পিস্টাশিও।

দেবযানী জিজ্ঞেস করলেন, কী? এটা কী দিলে?

মৃদু হাস্যে সুশোভন বললেন, সময়!

পোষা হাঁসের ডিম

বাজারে এক জোড়া ডিমের দাম চার টাকা। এখানে ডাব্‌ল ডিমের একটি ওমলেটের দাম আশি টাকা। ওমলেট বানাতে কী কী লাগে, একটু পেঁয়াজ, সামান্য আদা কুচি, এক চামচ দুধ, যৎসামান্য নুন, ওপরে ছড়িয়ে দিতে হয় গোলমরিচের গুঁড়ো। বরুণ মনে মনে হিসেব না কষে পারে না। ঐ পেঁয়াজ, আদা-দুধ-নুন-গোলমরিচের খরচ কত হতে পারে? বড়জোর দু'টাকা? তাহলে ওমলেটের মূল বিষয়বস্তুর খরচ দু'টাকার বেশি নয়। বাকি সবটাই লাভ নয় অবশ্য, এতবড় হোটেল, এর বিনিয়োগের অঙ্ক কম নাকি? ওমলেট যে বানায়, তার মাইনে মাসে পনেরো-কুড়ি হাজার হবে বোধ হয়। বরুণ শুনেছে বড় বড় হোটেলের প্রধান রাঁধুনির মাইনে মাসে পঞ্চাশ হাজার কিংবা এক লক্ষও হয়। কিন্তু প্রধান রাঁধুনিকে নিশ্চয়ই ওমলেট বানাবার জন্য ব্যস্ত থাকতে হয় না, অনেক সহকারী আছে। যে লোকটি রান্নাঘর থেকে প্লেটে সাজিয়ে ওমলেটটা নিয়ে এলো, তার মাইনে কত হতে পারে? যে অবশ্য বখশিস ও পায় অনেক।

এরকম হোটেলে বরুণ জীবনে এই প্রথম থাকছে। হোটেল তো নয়, যেন আলাদা একটি গ্রাম। গোয়ার পাঞ্জিম শহর থেকে অনেক দূরে নিরিবিলি সমুদ্র সৈকতে অনেকখানি জায়গা জুড়ে এই হোটেল, সমস্ত এলাকাটাই দেওয়াল দিয়ে ঘেরা, হোটেলের গ্রাহক ছাড়া বাইরের কোনো উটকো লোক, ভিখিরি টিখিরি এখানে ঢুকতে পারে না। খুব যত্ন করে সুন্দর সাজানো বাগানের মাঝে মাঝে একটি করে কটেজ। কটেজ মানে

কুঁড়েঘর নয়। টালির চাল দেওয়া বাংলো, ভেতরটা এয়ার কন্ডিশান্‌ড, বাথরুমটাই অনেকের শোওয়ার ঘরের চেয়েও বড়। এক একটা কটেজের দৈনিক ভাড়া সাড়ে ন'হাজার টাকা, তার ওপরেও বোধহয় ট্যাক্স-ফ্যাক্স আছে।

বরুণকে অবশ্য এক পয়সাও খরচ করতে হয় না। সে যা খুশি খাবারের অর্ডার দিয়ে বিলে সই মেরে দিতে পারে। এক কাপ চা পঞ্চান্ন টাকা, এক প্লেট আলু কপির তরকারি একশো দশ টাকা, একখানা মাত্র চিংড়ি মাছ, নাম হচ্ছে কিং সাইজ প্রণ, অর্থাৎ মাথায় সুস্বাদু ঘিলুওয়ালা গলদা চিংড়ি, তার দাম চারশো টাকা। বড় বড় হোটেলে এরকম দাম তো হবেই। এটা ভারতের এক নম্বর হোটেল। সমস্ত প্রধান শহরে এদের শাখা আছে, এমনকি বিদেশেও।

তবু কেন যেন ঐ ওমলেটের দামটাই বরুণের মাথায় গেঁথে গেছে। এখানকার একদিনের ঘর ভাড়া যে তার এক মাসের মাইনের চেয়েও বেশি, তা নিয়ে সে মাথা ঘামাচ্ছে না। কিন্তু এক জোড়া ডিম....

কলকাতায় বরুণ রোজ নিজে বাজার করতে যায়। অনেক লেখক-শিল্পী বুদ্ধিজীবীই নিজের হাতে বাজার করাটা ছোট কাজ মনে করেন, বাজারের ভিড়ভাট্টা পছন্দ করেন না, মাছের বাজারের প্যাচপেচে কাদা ও গন্ধ সহ্য হয় না। কাজের লোক পাঠিয়ে দেন, জিনিসপত্রের দামের ওঠা-নামার খোঁজও রাখেন না তাঁরা। বরুণের ছোটবেলা থেকেই বাজারে যাওয়া অভ্যেস, বাজারের লোকজনদের সঙ্গে কথা বলতে তার ভালো লাগে। বাজারে সে খানিকটা সমাজ চিত্রও যেন দেখতে পায়।

গড়িয়াহাটা বাজারের বাইরে, পেছন দিকের গলিতে কয়েকটা বুড়ি ডিম বিক্রি করে। সেরকম একজন বুড়ির কাছ থেকেই বরুণ নিয়মিত ডিম কেনে। পোলট্রির ডিম সে দু'চক্ষে দেখতে পারে না, এই বুড়িদের কাছ থেকে পাওয়া যায় খাঁটি দিশি ডিম, তার স্বাদই আলাদা। এরা কক্ষণো পচা ডিমও দেয় না।

যার কাছ থেকে বরুণ ডিম কেনে, সে একেবারে থুনথুনে বুড়ি। ঐ বয়েসের ঠাকুমা-দিদিমাদের দিয়ে কোনো কাজ করানো হয় না। কিন্তু সেই বুড়ি অনেক দূরের কোনো গ্রাম থেকে ডিমের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে ট্রেনে চেপে আসে কলকাতায়। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রোদ্দুরে বসে থাকে। তার সঙ্গে সুখ দুঃখের গল্প হয় বরুণের। বুড়ি এক ছেলে মারা

গেছে, অন্য ছেলে মাকে দেখে না, নাতিটা এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায়, বিশেষ কিছু কাজ করে না। সেইজন্য বুড়িকেই রোজ ডিম নিয়ে আসতে হয়, সংসার চালাতে হবে তো। টাকা-পয়সার হিসেবও ভালো বোঝে না সে, যখন ডিমের জোড়া এক টাকা পঁচাত্তর পয়সা ছিল, তখন তিনটে ডিমের দাম কত হবে তা সে বলতে পারত না, খদ্দেরকেই জিজ্ঞেস করতো। এই অবস্থায় তাকে ঠকানো সহজ। এরকম একজন অতি দরিদ্র বুড়িকে ঠকাবার মতন লোকও আছে মানব সংসারে।

সেই বুড়ির নাম জানে না বরুণ। বাজারে কে কার নাম জিজ্ঞেস করে ? সেই বুড়ি একদিন বরুণকে এক ডজন ডিম দিয়ে পয়সা নেবার পর, আর একটা ডিম বার করে, ভালো করে মুছে, ফোকলা মুখে একগাল হেসে বলেছিল, বাবা, এই ডিমটা তুমি খাবে। এটা আমার নিজের বাড়ির হাঁসের ডিম !

নিজের বাড়ির হাঁস আর অন্য বাড়ির হাঁসের ডিমের কী তফাত ? অন্য ডিমের থেকে এই একটা ডিম আলাদা করেই বা রাখা যাবে কী করে ? তবু বুড়ির ওই ইচ্ছেটা বড় মধুর লেগেছিল বরুণের। বুড়ি সে ডিমের দাম নিল না কিছুতেই। ওর কতই বা লাভ হয়, একটা ডিম বিনা পয়সায় দিতে যাবে কেন ? বুড়ি দুহাত নেড়ে অনবরত না না বলতে লাগলো। এর পর আর জোর করে দেওয়া যায় না। সেই ডিমটা বরুণ হাতে করে নিয়ে এসেছিল, এবং সত্যিই সেটা আধসেদ্ধ করে খাওয়ার সময় মনে হয়েছিল, এত ভালো স্বাদের ডিম সে জীবনে খায়নি।

তাজ হলিডে রিসর্ট হোটেলের কটেজে ব্রেক ফাস্ট খাওয়ার সময় ওমলেট মুখে দিতে দিতে সেই বুড়ির কথা মনে পড়ে যায়। এদের ওমলেটের স্বাদও ভালো। কিন্তু চার টাকা থেকে আশি টাকা ! একজোড়া এই ডিমের লাভের বখরা আরও কত লোক খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। সবচেয়ে কম পায় যে উৎপাদক। ধরা যাক ঐ বুড়ির কথা। বাড়িতে সে গোটা কুড়ি হাঁস পুষেছে। কত যত্ন করতে হয় সেই হাঁসদের, ঠিক সময়ে ক্ষুদ-কুঁড়ো খাওয়াতে হয়, হাঁসেদের আলাদা ঘর থাকে, সন্ধের পর ঢুকিয়ে দিতে হয় সেই ঘরে। চোর-ছ্যাঁচোড়-শেয়ালের উপদ্রব আছে। তারপর সেই ডিম বাজারে বিক্রি হয় চারটাকায়....।

ব্রেক ফাস্ট খাওয়া শেষ করে স্নান করতে গেল বরুণ। গোলাপি টালি বসানো ঝকমকে বাথরুম, দু'রকম সাবান, শ্যাম্পু, বডি লোশান,

ক্রিমের ছোট ছোট শিশি সাজানো রয়েছে। এরা টুথ ব্রাশ, পেস্ট, চিরুনিও দেয়। দেবে না কেন, সাড়ে ন'হাজার টাকা দৈনিক ঘর ভাড়া নিচ্ছে। বরুণ ঐ সব সাবান শ্যাম্পু ট্যাম্পু ব্যাগে ভরে নেয় তার স্ত্রীর জন্য। এগুলো সরিয়ে ফেললে আবার দিয়ে যাবে। দু'একটা তোয়ালেও ব্যাগে ভরে নিলে কেমন হয়, তা নিয়ে দোনামোনা করে। তোয়ালে চুরি করলে তার বউ চটে যেতে পারে।

বাথরুমে বরুণের গান গাওয়া অভ্যেস। আজ সে নিজস্ব সুরে একটা নতুন গান বানালো : এক জোড়া ডিম চার টাকা....এই হোটেলে আশি টাকা, টাকা ডুমা ডুম, ডুম ডুমা ডুম....

ঝনঝন করে বেজে উঠলো টেলিফোন। তার জন্য ন্যাংটো অবস্থায় ভিজে গায়ে ব্যস্ত হয়ে ছুটে যাবার দরকার নেই। বাথরুমেও একটা ফোন আছে। সব রকম আরামের ব্যবস্থা।

ফোন করছে সাকসেনা। বিনীত ইংরিজিতে বললো, মিঃ মুখার্জি, আপনি রেডি নিশ্চয়ই। ঠিক সাড়ে ন'টায় আমরা কনফারেন্সে বসবো। আজ ব্লু রুমে হবে। আপনি চলে আসছেন তো ?

বরুণ খানিকটা ত্রস্ত ভাবে বললো, এখন কটা বাজে ? আমি ঘড়ি দেখিনি।

সাকসেনা বললো, এখন ন'টা চব্বিশ।

বরুণ বললো, ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি, বড় জোর পাঁচ মিনিট দেরি হবে।

বরুণ ঘড়ি পরে না। একটি ঘড়ি সে অনায়াসে কিনতে পারে। এখন সস্তায় কত রকম ঘড়ি পাওয়া যায়। বাড়িতে তার একটা ঘড়ি রয়েছে, কিন্তু হাতে ঘড়ি পরতে তার ভালোই লাগে না। কলকাতা শহরে ঘড়ি ছাড়া দিব্যি চলে যায়, প্রায় সব লোকের হাতেই ঘড়ি থাকে। কিন্তু এসব জায়গায় ঘড়ি ধরে চলতে হয়। ঘরের মধ্যে বসে থাকলে সময় বোঝা যায় না। হোটেলের ঘরে আর সব কিছু থাকে, ঘড়ি থাকে না।

তাড়াতাড়ি গা মুছে বরুণ তৈরি হয়ে নিল। এত বড় হোটেলে ছোট-বড় নানা সাইজের কনফারেন্স রুম আছে। ব্লু রুমটা সুইমিং পুলের কাছে। হেঁটে যেতে মিনিট পাঁচেক লাগবে। চতুর্দিকে ফুলের বাহার, নানান পোশাকের সাহেব মেমরা হেঁটে যাচ্ছে। কোনো কোনো সদ্য সমুদ্রস্নাতা

মেমের গায়ে পোশাক নেই-ই বলতে গেলে। সৈয়দ মুজতবা আলি এক জায়গায় লিখেছিলেন, তাঁর গলার টাই দিয়ে পাঁচজন মেমসাহেবের জাঙ্গিয়া তৈরি হয়ে যেতে পারে।

পাঁচ মিনিট দেরি হলে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। আর সবাই সেজে গুজে ঠিক সময়ের আগেই এসে বসে আছে। বরুণ দরজা ঠেলে ঢোকার পর কয়েকজন এমন ভাবে তাকালো, যেন সে একটা দারুণ অপরাধ করে ফেলেছে। এরপর বাজে তর্কে এরা কত যে সময় নষ্ট করবে তার ঠিক নেই।

চোদ্দ জনের জুরি বোর্ড। একটি নাম করা টেলিভিশন কোম্পানি এক বছরের টিভি অনুষ্ঠানের বিভিন্ন শাখার পুরস্কার দেবে। তাই সারা ভারত থেকে এই চোদ্দজন বিচারককে ডেকে আনা হয়েছে।

বরুণ ছাড়া আর সবাই ফিল্ম জগতের কেষ্ট বিষ্টু। পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রী, প্রযোজক, সঙ্গীত পরিচালক, ক্যামেরা পরিচালক। এঁরা সবাই ভারত বিখ্যাত, পরস্পর পরস্পরকে চেনে। সেই তুলনায় বরুণ কেউ না। দু'জন মাত্র তার নাম শুনেছে। তবু বরুণকে ডাকা হলো কেন? তার কয়েকটি গল্প উপন্যাস নিয়ে ফিল্ম ও টি ভি সিরিয়াল হয়েছে, প্রায় সবই বাংলায়, বাংলার বাইরের দর্শকদের তাকে না চেনাই স্বাভাবিক। কোনো গল্প লেখককে ডাকতে গেলে হিন্দী ফিল্মে নাম-ডাকওয়ালা তো অনেকেই ছিল। বোধহয় এরা ভেবেছে, আর সবাই বোম্বাই ও দক্ষিণ ভারতের, নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য বাংলা থেকেও একজন বিচারক আনা উচিত। তাড়াহুড়ো করে মৃণাল সেন কিংবা অপর্ণা সেনের মতন কারোর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি, তাই বরুণ মুখার্জি। বরুণ আপত্তি করবে কেন, অপরের পয়সায় গোয়ার এক চমৎকার হোটেলে কয়েক দিনের আতিথেয়তা তো ভোগ করা যাবে।

সিনেমা-টিনেমার সঙ্গে যারা জড়িত, যাদের নাম বড় বড় অক্ষরে বিজ্ঞাপিত হয়, তাদের মধ্যে গল্প লেখকই সবচেয়ে কম টাকা পায়। এখানেও অন্যদের পোশাক-পরিচ্ছদের সঙ্গে বরুণের অনেক তফাত। এই গরমেও পুরুষরা সুট পরে থাকে। মেয়েরা কেউ শাড়ি পরে না, নানা রকম পোশাক, বিজ্ঞাপনের মডেলদের যে-রকম পোশাক থাকে। চোদ্দ জন জুরি ছাড়াও উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে তিনটি যুবতী সব সময় উপস্থিত থাকে দেখাশুনো করবার জন্য, এক গেলাশ জল চাইলে এরা

কোকাকোলা এনে দেয়, এই তিনটি মেয়ের দু'জনই প্যান্ট ও গেঞ্জি পরা একজন শালোয়ার কামিজ। শাড়ি পরা কি উঠেই গেল ?

বরুণ পরে আছে প্যান্ট ও হাওয়াই শার্ট। এই গরমে মোজা পরতে ইচ্ছে করে না বলে সে শু-এর বদলে চটি পরে এসেছে। ঘরের ভেতরটা ঠাণ্ডা হলেও বাইরে এর মধ্যেই ঠা-ঠা রোদ।

তেরজন একদিকে, আর একদিকে বরুণ। একমাত্র সে-ই সিগারেট খায়। অন্য সবাই স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলে। গতকাল বরুণ সিগারেট ধরাবার পর কয়েকজন আড়চোখে আপত্তির দৃষ্টিপাত করেছিল, তারপর সে মাঝে মাঝে বাইরে গিয়ে সিগারেট টেনেছে।

গল্প লেখক কম টাকা পায় তা সবাই জানে, কিন্তু সে জন্য এরা তাকে অবজ্ঞা করে না। সবাই বেশ ভদ্র। দু' একজন একটু আধটু বাংলা জানে, খুব মিষ্টি করে বরুণের সঙ্গে দু'টি একটি বাক্য বাংলায় বলে।

দুটি বড় বড় টি ভি সেট বসানো আছে সামনের দিকে। প্রথমে কিছুক্ষণ বিভিন্ন ভাষার টি ভি সিরিয়াল ও কাহিনীচিত্রের অংশ বিশেষ দেখানো হবে, তারপর আলোচনা। আগে থেকেই অনেকটা বাছাই হয়ে গেছে। ফাইনালে যে-কটা উঠেছে তার অধিকাংশই হিন্দী, কয়েকটি দক্ষিণ ভারতীয় ভাষায়, গোটা দুয়েক বাংলা। বরুণ টিভি দেখার সময় পায় না, তার নিজের গল্পের সিরিয়ালও দেখে না। এখানেও দেখতে দেখতে কিছুক্ষণ পরেই তার ঘুম পেয়ে যায়। ফাইনালে যেগুলি উঠেছে, সেগুলিও রীতিমতো রদ্দি। কোনোটাকেই পুরস্কার দেওয়া উচিত নয়। ঘুমোলেও ক্ষতি নেই। বরুণ থুতনিতে দু'হাত দিয়ে গভীর চিন্তামগ্ন থাকার ভান করে ঘুমোয়। আলোচনার সময় সে একটি কথাও বলে না। এরা ডেকে এনেছে বলেই যে তাকে কথা খরচ করতে হবে, তার কি কোনো মানে আছে ?

দেড়ঘণ্টা পর একবার বিরতি, দেড়টার সময় মধ্যাহ্নভোজ। বিরতির সময় পাশের একটি টেবিলে জিন, ভোদকা, ওয়াইন, শ্যাম্পেনের বোতল সাজানো থাকে, এছাড়া সব রকম নরম পানীয়। সকালবেলা, দিনের বেলা মদ খায় না বরুণ। কিন্তু পরের পয়সায় এসব ভালো ভালো জিনিস কি ছাড়া যায় ? একটা শ্যাম্পেনের বোতলের কত দাম কে জানে ! পাতলা ফিনফিনে কাচের গেলাশে চুমুক দিতে কত আরাম হয়। কেউ কেউ গেলাশে অনেকখানি ঢালছে, তারপর দু'এক চুমুক দিয়ে ফেলে যাচ্ছে অবলীলাক্রমে।

টি ভি'র পর্দার দিকে চোখ, কিন্তু বরুণ ভাবে অন্য কিছু। সে টাক

পয়সায় হিসেব কষে। নিজের টাকা নয়, পরের টাকা। কলকাতা থেকে গোয়া পর্যন্ত প্লেন ভাড়া কত? কলকাতা থেকে বম্বে, সেখান থেকে গোয়া, এরমধ্যে কলকাতা-বম্বের ফ্লাইট একজিকিউটিভ ক্লাস। তার ভাড়া বোধহয় দেড়গুণ বেশি। যাওয়া-আসা সব মিলিয়ে পনেরো-কুড়ি হাজার টাকার কম হবে না। এয়ারপোর্ট থেকে প্রায় এক ঘণ্টা লাগে গাড়িতে এই হোটেলে পৌঁছোতে। সাড়ে ন'হাজার টাকা করে তিন দিনের কটেজ ভাড়া। ব্রেকফাস্ট-লাঞ্চ-ডিনারে দু'আড়াই হাজার টাকা তো হবেই। তার ওপর মদের বোতল পৌঁছে দিচ্ছে ঘরে ঘরে। তাহলে চোদ্দজন জুরির জন্য কত হবে মোট? শুধু চোদ্দজন নয়, উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে আছে পাঁচ-ছ'জন, সাহায্যকারিণী তিনটি যুবতী। এখানে বিচারপর্ব শেষ হলে পুরস্কার দানের অনুষ্ঠান হবে দিল্লিতে, হলিউডের অস্কার উৎসবের স্টাইলে। সে এক এলাহি ব্যাপার। তখনও বরুণদের মতন সবাইকে আবার বম্বে-কলকাতা-ম্যাড্রাস থেকে উড়ে যেতে হবে দিল্লিতে, আবার পাঁচতারা হোটেল। কয়েক কোটি টাকার ব্যাপার।

বর্বরস্য ধনঃ ক্ষয়ম বলে একটা কথা আছে। কিন্তু এরা কি বর্বর? টি ভি কোম্পানির মালিকরা সুদক্ষ ব্যবসায়ী, প্রচুর মাইনে দিয়ে এরা অতি বুদ্ধিমান, শিক্ষিত চাকর রাখে। তারা সব সময় কোম্পানির স্বার্থ দেখে, মার্কেট সার্ভে না করে এক পাও এগোয় না। টিভি'র অনুষ্ঠানের বার্ষিক পুরস্কারের ব্যবস্থা করে এই টি ভি কোম্পানির নিশ্চয়ই একটা লাভের দিক আছে। শুধু প্রচার নয়, তার চেয়েও বেশি সম্মান। বাজারে তো আরও কত টিভি কোম্পানি আছে, কিন্তু এই কোম্পানি শুধু পুরস্কার দেবার জন্যই এত কোটি কোটি টাকা খরচ করার হিম্মৎ রাখে।

বরুণরা কিন্তু হাতে একটা পয়সাও পাবে না। জুরি বা বিচারকদের ফি দেবার নিয়ম নেই। তারা নিঃস্বার্থ এবং নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করবেন, এটাই প্রত্যাশিত। হোটেলে যত ইচ্ছে খাও দাও, পয়সা নষ্ট করো, নগদ টাকা দেওয়া হবে না। ভাবলেই শরীর নিশপিশ করে। অন্তত এখানকার একটা দিনের কটেজ ভাড়ার টাকাটা হাতে পেলেও কত কাজে লাগতো।

বরুণ লক্ষ করেছে, প্রত্যেক জুরিই যতটা খেতে পারবে, তারচেয়ে অনেক বেশি খাবার নেয়। একটা অতবড় চিংড়িই খেয়ে শেষ করা যায় না, চায় দুটো চিংড়ি। বাকিটা নষ্ট করে। যেন প্রতিহিংসার বসে বেশি বেশি খরচ করিয়ে আনন্দ পাওয়া। উদ্যোক্তাদের কোনো কার্পণ্য নেই।

বিকেল পাঁচটায় সব কাজ শেষ, তারপর নিজের কটেজে গিয়ে ঘ
খাও কিংবা অন্যদের সঙ্গে গিয়ে গল্প করো, কিংবা মেয়েদের সং
ফস্টিনস্টি, যা খুশি। রাত আটটায় পার্টি।

বরুণ অন্যদের সঙ্গে সহজ ভাবে মিশতে পারে না, তাই একা এব
কিছুক্ষণ বেড়ায়। পাশে এত বড় একটা সমুদ্র থাকতেও সুইমিং পুলে
সারাদিন দাপাদাপি চলে। সাহেব মেমই বেশি। এ হোটেলে ভারতীয়দে
সংখ্যা খুবই কম। নিজের টাকা খরচ করে ক'জন ভারতীয়ই বা এরক
হোটেলে আসতে পারে।

বরুণ এসে বেলাভূমিতে বসলো। এক পাশে পাহাড়, অন্য পাশা
জঙ্গলের মতন। সূর্যাস্ত হচ্ছে পশ্চিম সাগরে। একটুক্ষণ বসার পরে
একজন বেয়ারা এসে বসলো, স্যার, এখানে চা এনে দেবো? কফি
বীয়ার?

বরুণ বললো, একটা বড় তোয়ালে এনে দিতে পারো?

লোকটা দৌড়ে চলে গেল।

সমুদ্রের ধারে এসে বাথরুমে স্নান করার কোনো মানে হয়? কি
সকালবেলা তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিতে হয়। দুপুরেও সময় পাওয়
যায় না। সমুদ্র কি দশ মিনিট-পনেরো মিনিট স্নান করা যায়? বরু
সুইমিং ট্রাঙ্কও আনেনি, এরকম হোটেলে যে থাকতে হবে, সেরক
ধারণাও ছিল না। এখন প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে, জাঙ্গিয়া পরে নামলে
কেউ কিছু বুঝতে পারবে না।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে সাঁতার কাটলো বরুণ। অন্ধকার সমুদ্রে সে
আগে কখনো নামেনি। একটু ভয় ভয় করছিল, রাত্রে নাকি হাঙরের
তীরের কাছে চলে আসে। কোনারকে সে এক সকালে ছ' ঝুড়ি হাঙরের
বাচ্চা বিক্রি হতে দেখেছিল, আগের রাত্রে জেলেরা ধরেছে। এই ভয়ে
রোমাঞ্চটাও উপভোগ্য।

পরিশ্রান্ত হয়ে বালির ওপর শুয়ে রইলো একটুক্ষণ। একটু দূরে
এক জায়গায় আলো জ্বেলে কী সব যেন কাজ হচ্ছে। দৌড়োদৌড়ি করছে
অনেক লোক। তোয়ালেটা গায়ে জড়িয়ে কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেল
সেদিকে।

একজন লোক বললো, এক টিভি কোম্পানির পার্টি হবে, তা
জায়গাটা সাজানো হচ্ছে স্যার।

বরুণের মনে পড়লো, সত্যিই তো, আজ বীচ পার্টি। এই কোম্পানির খোদ মালিকের পরিবার শুধু আজকের এই পার্টির জন্যই উড়ে আসছে দিল্লি থেকে। বম্বে থেকেও আসছে বেশ কয়েকজন। গোয়ার কয়েকজন মন্ত্রী ও আমলাও আমন্ত্রিত। ভালো রকম সাজপোশাক করে আসতে হবে।

বরুণ সে রকম কিছুই আনেনি। সে সুট কক্ষণো পরে না। ধুতি- থাকলে বেশ হতো, কিন্তু ধুতির বদলে আছে পা-জামা। সুতরাং পাজামা পাঞ্জাবি, পাঞ্জাবির আবার বোতাম আনা হয়নি, এই গরমের মধ্যে বুকের বোতাম খোলা থাকলেই তো ভালো।

কনফারেন্সে বা সেমিনারে উপস্থিত হতে হয় ঠিক ঠিক সময়ে, আর রাত্তির বেলার পার্টিতে ইচ্ছে করে যেতে হয় খানিকটা দেরিতে, বরুণ এই নিয়মটাই জানে না। কাঁটায় কাঁটায় আটটার সময় উপস্থিত হয়ে বরুণের বোকা বোকা লাগলো। প্রায় কেউই আসেনি।

জায়গাটা দেখে তাজ্জব হয়ে যাবার মতন অবস্থা। দিনের বেলায় সে দেখেছে, এই সমুদ্র তীরে বালির ওপরে কিছু ছিল না। এখন গোটা দশেক আস্ত আস্ত নারকোল গাছ এনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাতে কাঁদি কাঁদি নারকোল ফলে আছে। এ কি আলাদিনের কাণ্ড নাকি? নারকোল গাছ কোথা থেকে এলো? বরুণ বাজি ফেলে বলতে পারে, এখানে একটাও নারকোল গাছ ছিল না। এ কি ভোজবাজি? কিংবা নকল গাছ? কাছে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখলো, না, নকল নয়, প্রায় আসল। হ্যাঁ প্রায়। খুব ভালো ভাবে দেখলে বোঝা যায়, নারকোল গাছের গুঁড়িটা আলাদা, তার ওপর বড় বড় পাতা ও কয়েক কাঁদি ডাব সমেত মাথাটা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই জন্য কিছুটা করে বেঁটে হয়ে গেছে সব কটা গাছ। হাত দিয়ে নারকোল ছোঁয়া যায়। এতগুলো নারকোল গাছকে হত্যা করা হয়েছে এই পার্টির জন্য। নিশ্চয়ই এর জন্য অনেক টাকা নেবে। অন্যের টাকার জন্য বরুণের এত ভাবনা কেন?

শুধু নারকোল গাছ, নয়, নানা রকমের জ্যান্ত জ্যান্ত ফুল গাছ পুঁতে দেওয়া হয়েছে বালিতে। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশ, এক পাশে আছড়ে পড়ছে সমুদ্রের ঢেউ।

টেবিল পাতা হয়নি, সাদা রঙের অসংখ্য চেয়ার ছড়ানো। মাঝখানের একটি গেল জায়গায় রয়েছে বিভিন্ন রং ও আকৃতির মদের বোতল।

বেয়ারারা গেলাসে গেলাসে ঢেলে ট্রে নিয়েও ঘুরছে। দু'তিনজন বেয়ারার পেড়াপিড়িতে বরুণ এক গেলাস স্কচ নিল। মনে মনে বললো, সাবধান বরুণ, এত আগে থেকে শুরু করলে, বেশি খেও না। মাতাল হয়ে যেও না। এসব পার্টিতে মাতাল হলে সবাই অবজ্ঞা করে। মাতলামি করে বোহেমিয়ান আর্টিস্ট সাজার দিন চলে গেছে। তাছাড়া তুমি বোহেমিয়ান নও, তুমি মধ্যবয়েসী একজন মধ্যবিত্ত লেখক। মদ খেতে পারো. কিন্তু মাতাল হওয়া চলবে না।

আস্তে আস্তে লোকজন আসছে। যেন সব স্বর্গের দেব দেবী। নাঃ দেব দেবীরাও এত আধুনিক সাজপোশাক জানে না। একটি রমণীর পিঠটা একেবারে খোলা. তা হলে কি ব্রা পরেনি ? একজনের পিঠ ঢাকা, কিন্তু বুকটা এমনই খোলা যে কিছুই দেখাতে বাকি রাখছে না।

ঘণ্টাখানেক পর এলেন এক প্রৌঢ় দম্পতি, তাঁদের প্রতি আদর-আপ্যায়নের ঘটা দেখে বোঝা গেল তারাই কোম্পানির মালিক। পুরুষটির মাথা ভর্তি সাদা চুল, কালো রঙের সুট পরা। রমণীটিই চমকপ্রদ। প্রায় বুড়ি, কিন্তু যুবতী সেজেছে. গাউন পরা, সেটা সোনার তার দিয়ে তৈরি নাকি ? এত ফর্সা, কিন্তু মেমসাহেব নয়, খুব সম্ভবত পার্শি সমস্ত শরীরে ঝলমল করছে হীরে, মুক্তা, মাথার চুলে সোনার জাল. দেখলে মনে হয় মধ্যযুগের ইউরোপের কোনো ডাচেসের মতন

বরুণ দাঁড়িয়ে ছিল এক কোণে. তারও ডাক পড়লো, জুরিদের সকলের সঙ্গেই মালিক দম্পতির আলাপ করিয়ে দেওয়া হবে। পরিচয় করিয়ে দিলেন, তিনি বরুণের নাম উচ্চারণ করলেন ভারুন, আর মুখোপাধ্যায়কে বললো মুখোপাধ্যি। মুখার্জি বললে ল্যাঠা চুকে যেত। যাই হোক, নামে কী আসে যায়। ডাচেস মহোদয়া বরুণের করমর্দনের জন্যও হাত বাড়ালেন। কোটিপতির হাতও কত নরম! আজকাল অবশ্য কোটিপতি হওয়াটাও এমন কিছু না, এরা বিজ্ঞাপনের জন্য কয়েক কোটি টাকা খরচ করে। বিলিওনেয়ার বলা উচিত

তিন জায়গায় বারবিকিউ হচ্ছে, মুর্গি, মাছ এবং কাঁকড়া। যার যা খুশি খাও। আরও খাবার আছে, আধখানা করা ডিমের ওপর মায়োনেজ ছড়ানো, আনারসের সঙ্গে চিজ, রাশি রাশি কাজুবাদাম, কাবাব। এসবই চুটকি খাবার. রাত্রির ভোজ হবে অনেক পরে

কত বোতল স্কচ হুইস্কি খরচ হবে আজ রাতে ? মেয়েদের দেওয়া

হচ্ছে খাঁটি ফরাসি ওয়াইন। জ্যামাইকান রামও রয়েছে। হাইনিকেন বীয়ার। ফট ফট শব্দ তিন বোতল শ্যাম্পেন খোলা হলো। একজন বেয়ারার সঙ্গে একটি অতিথির আচমকা ধাক্কা লাগায় উল্টে গেল সাত-আটটা ভর্তি গেলাস।

শুধু মদের জন্যই আজ কত টাকা যাবে? আরে বরুণ, তুমি পরের টাকা নিয়ে কেন মাথা ঘামাচ্ছো? তুমি খাচ্ছো খেয়ে যাও না!

পার্টিতে ঘুরে ঘুরে সকলের সঙ্গে আলাপ করে নিয়ম। বরুণ কোনোদিন তা পারে না। সে এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ কেউ তার সঙ্গে কথা বলতে আসে, বরুণ শুধু হুঁ হাঁ করে, তখন তারা ভাবে এই লোকটি ইংরিজি জানে না, তাড়াতাড়ি সরে যায় অন্য দিকে। বরুণ সবাইকে লক্ষ করে। সে লেখক, লক্ষ করাই তো তার কাজ। খানিকটা মদ খেয়ে ফেললে পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের দিকেই চোখ যায় বেশি।

যুবতী-প্রৌঢ়া মিলিয়ে অন্তত তেইশ-চব্বিশ জন রমণী রয়েছে, একজনও শাড়ি পরেনি। ফ্যাশন মডেলরা কেউ শাড়ি পরে না। এই রকম পার্টিতে গৃহবধূরাও ফ্যাশান মডেল হতে চায়।

সাড়ে নটা বেজে গেছে, এখনো কেউ কেউ আসছে। একটি দম্পতির দিকে চোখ পড়ে গেল। তাদের আগমন যেন আবির্ভাব। যুবকটি অতিশয় সুপুরুষ, ফিলমের নায়ক হতে পারে, যুবতীটিরও নায়িকার মতনই রূপ ও হাবভাব। বরুণ হিন্দী ফিলমের তারকাদের প্রায় কারুকেই চেনে না। অনেকেই এই দম্পতিকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। বরুণ বিশেষ কারণে যুবতীটিকে দেখছে, শুধু রূপের জন্যই নয়, সে শাড়ি পরে আছে। এই একমাত্র শাড়ি। একটা হলুদ-সবুজ চুমকি বসানো সাদা সিল্কের শাড়ি তার শরীর থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে; বুকে আঁচল থাকছেই না। যুবতীটি বুদ্ধিমতী, এত রকমের পোশাকের মধ্যে সেই একমাত্র শাড়ি পরেছে বলেই সে বিশেষ দ্রষ্টব্য।

খানিক বাদে সেই যুবতীটি যখন বরুণের কাছ দিয়ে যাচ্ছে, বরুণ তার চোখে চোখ ফেললো। আমেরিকান কায়দায় যুবতীটি বললো হাই।

বরুণ বললো, শাড়িটা ধন্য হয়েছে।

যুবতীটি ঠিক বুঝতে পারলো না। মুখটা খানিকটা ঝুঁকিয়ে এনে জিজ্ঞেস করলো, কী বললে?

বরুণ বললো, তুমি যে আজ শাড়ি পরেছো, তাতে ঐ শাড়িটা ধন্য হয়েছে।

মেয়েটি এবারও বুঝতে পারলো না। চার পেগ হুইস্কির পর বরুণের গলাও একটু জড়িয়ে গেল। মেয়েটি কাঁধ ঝাঁকিয়ে সরে গেল সেখান থেকে।

নিজেকে থাপ্পড় মারতে ইচ্ছে করলো বরুণের। একী বোকার মতন কথা বললে তুমি? মেয়েটিকে প্রশংসা করতে চেয়েছিল তুমি, কিন্তু এই কী প্রশংসার ভাষা? বলা উচিত ছিল, শাড়িটাতে তোমাকে সুন্দর মানিয়েছে। তোমাকে মাতাল ভেবে ও সরে গেল। মাতাল হয়ো না বরুণ।

কিন্তু বরুণ নিজেকে সামলাতে পারছে না। হাতের গেলাস ফুরিয়ে গেলে আর একবার নিতেই হয়। একক্ষণ বাদে অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে। সাত-আটজন নারী পুরুষের একটা দলের মধ্যে সে জুড়ে গেল। তার কোন বিষয়ে কথা বলছে তা বরুণ বুঝতে পারছে না, হঠাৎ সে বলে উঠলো, সমুদ্রের ঢেউয়ের এমন সুন্দর আওয়াজ হয়ে যায় রাত্তির বেলা, এত লোক বকবক করছে যে কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

সবাই এক মুহূর্তের জন্য থেমে গেল। একজন লোক ভদ্রতা করে বললো, ঠিক বলেছেন।

তারপর দলটা ভেঙে ছড়িয়ে গেল। মাতালের সঙ্গে কেউ থাকতে চায় না।

আবার নিজেকে চড় মারতে ইচ্ছে করলো বরুণের ছিঃ, এসব কী করছো তুমি? পার্টিতে এরকম ব্যবহার করতে নেই। কেউ তোমাকে বোহেমিয়ান ভাববে না, পেঁচি মাতাল মনে করবে। বোকা মাতাল। তুমি এখানে এসেছো কেন? এই পার্টি যদি তোমার পছন্দ না হয়, নিজের ঘরে ফিরে যাও, টিভি দেখো, একা মদ খাও, কিংবা ঘুমিয়ে পড়ো।

এসব বুঝেও বরুণ ফিরে এলো না। ঘুরতে লাগলো। তবে সচেতন রইলো, কারুর সঙ্গে উল্টোপাল্টা কথা বলবে না। সুন্দরী মেয়েদের দূর থেকে দেখা যাক বরং।

একটু পরে একেবারে সমুদ্রের কোল ঘেঁষে একটা ছোটখাটো ঘটনা ঘটলো, অনেকে তা টেরও পেল না। বরুণ তখন কাছাকাছি, সে দেখতে পেল। একটা চোর ধরা পড়েছে। এত রকম সিকিউরিটির কড়াকড়ি,

বাইরের কারুর আসার উপায় নেই, তবু ঢুকে পড়েছে একজন। চোর কিংবা ভিখিরি। ষোলো-সতেরো বছরের একটি ছেলে, গায়ে ছেঁড়া ঝুলিঝুলি জামা, মাথার চুল ধুলো মাখা। হোটেলের বেয়ারারা তাকে দেখতে পেয়ে, বেশি চ্যাঁচামেচি না করে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল আড়ালে, যাতে পার্টির কোনো বিঘ্ন না হয়।

বরুণ এক পলক সেই ছেলেটির মুখখানা দেখতে পেল। কেমন যেন চেনা চেনা। যদিও গোয়াতে বরুণ এলো প্রায় পনেরো বছর পর, এখানকার একটি চোর বা ভিখিরিকে চেনা তার পক্ষে অসম্ভব, তবু তার মনে হলো ঐ মুখ আগে দেখেছে। নেশার ঝোঁকে এরকম অনেক উদ্ভট কথা মনে হয়। গড়িয়াহাটা পেছনের গলিতে যে বুড়িটা ডিম বিক্রি করে, তার সঙ্গে ঐ ছেলেটার মুখের মিল আছে না? এ সেই বুড়ির বেকার বাউণ্ডুলে নাতি। বরুণ বিড় বিড় করে বললো, হারামজাদা ছেলে, ঠাকুমার বদলে তুই বাজারে ডিম বিক্রি করতে পারিস না। এতদূর দেশে এসেছিস ভিক্ষে করতে?

নিজেই হাসলো বরুণ। এ সেই বুড়ির নাতি হতেই পারে না। যদি হয়? যদি হয়, তা হলে বরুণের উচিত ছিল না বেয়ারাদের গলাধাক্কা থেকে ওকে বাঁচানো? সে রকম কিছুই তো করলে না বরুণ। বুড়ি তোমাকে বিনা পয়সায় নিজের পোষা হাঁসের ডিম খাইয়েছিল। বুড়ির সঙ্গে ছেলেটার মুখের আদলের যে মিল আছে, তা বুঝতে যে অনেক দেরি হলো। ততক্ষণে ছেলেটিকে ওরা সরিয়ে নিয়ে গেছে। এটাও মাতালের অজুহাত। ঠিক হও, সিধে হয়ে দাঁড়াও, আর মদ খেও না, ভদ্রতা রক্ষা করো।

মাইকে কে যেন কী বলছে। সাকসেনা একটা কর্ডলেস মাইক্রোফোন আনছে এক একজনের মুখের কাছে। সবাই ভদ্রতা করে বলছে দু'টি একটি বাক্য। কত ভালো এই পার্টি, কত চমৎকার ব্যবস্থা, এই টিভি কোম্পানির আতিথেয়তা তুলনা নেই। কেউ কেউ বলছে, প্রত্যেক বছর যেন এরকম উৎসব হয়।

এক সময় সাকসেনা বরুণকে খুঁজে বার করে বললো, মিঃ মুখার্জি, ফেমাস রাইটার, তিনি কিছু বলবেন।

কী বলবে বরুণ? সবাই তার দিকে চেয়ে আছে। মাতালের বিবেক জাগ্রত হলো। সে এরকম লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয়ের পার্টির প্রশংসা

করবে ?· কিছুতেই না। খুব নোংরা, কুচ্ছিৎ এই সব ব্যাপার। তবু বরুণের এটুকু খেয়াল আছে যে এসব জায়গায় কোনো অপ্রিয় সত্য বলা যায় না।

সে বললো, আমি বরং একটা গান গাই ?

কয়েকজন বললো, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

বরুণ গায়ক নয়, একমাত্র মাতাল অবস্থায়, কিংবা স্নানের সময় বাথরুমে তার গাইতে ইচ্ছে করে। এখানে ইংরিজি কিংবা হিন্দী গান, কিংবা বাংলা রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনলেও অবাঙালিরা বুঝুক বা না বুঝুক শ্রদ্ধায় মাথা নাড়ে।

কিন্তু বরুণের যে কোনো গানই মনে পড়ছে না, খুব নার্ভাস লাগছে। সবাই উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। কেন সে গান গাইবার কথা বলতে গেল ? শুধু ধন্যবাদ জানালেই চলতো।

হঠাৎ বরুণের মনে হলো, এখানে আর কেউ নেই, সে একা, বাথরুমে সে যেমন উলঙ্গ, একা থাকে। সে হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে উঠলো আজ সকালের স্বরচিত গান : এক জোড়া ডিম চারটাকা, এই হোটেলে আশি টাকা, টাক ডুমা ডুম, ডুম ডুমা ডুম....

কেউ কিছুই বুঝলো না, তবু সবাই হাততালি দিয়ে উঠলো।

রক্ত এবং অশ্রু

আকাশপথে মাত্র পঁয়তিরিশ মিনিট, বিমানটি নামল ঠিক সময়ে। ঢাকা থেকে কলকাতা। মজার কথা এই, দু'দিকের এয়ারপোর্টে চেকিং, ইমিগ্রেশন, কাস্টমস ইত্যাদির জন্য সব মিলিয়ে সময় লাগে অন্তত সাড়ে তিন ঘণ্টা। এসব আধুনিক জীবনের অঙ্গ। একদিকে দ্রুত গতিশীল যানবাহন, অন্যদিকে হরেক রকম অবান্তর ফর্ম ভর্তি করা, বেড়ার পর বেড়া, সময়ের অপব্যয়।

ট্রলিতে মালপত্র চাপিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো প্রকাশ, বিকেল সাড়ে চারটে। ঢাকাতে বৃষ্টি পড়ছিল, এখানেও টিপি টিপি বৃষ্টি। কেউ তার জন্য অপেক্ষা করে নেই, থাকার কথাও ছিল না। প্রকাশ বহুবার বিদেশ যায়, এবার সামান্য দূরত্বে বাংলাদেশ ঘুরে আসা, তাও অফিসের কাজে, এটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারই নয়, এয়ারপোর্টে তাকে কে নিতে আসবে ?

অফিসের গাড়ি এসেছে অবশ্য। মালপত্র তোলার পর ড্রাইভার তাকে একটা চিঠি দিল। বিদিশা লিখেছে, আসবার পথে মায়ের সঙ্গে একটু দেখা করে এসো। ওঁর শরীরটা ভালো নেই। ভুলে যেও না কিন্তু। আমি মাকে বলে রেখেছি, উনি তোমার জন্য অপেক্ষা করবেন। তুমি না গেলে খুব খারাপ হবে।

পঁয়তিরিশ মিনিটের যাত্রায় জেট-ল্যাগের কোনো প্রশ্ন নেই। এর থেকে বম্বে-দিল্লি অনেক দূর, মাসে তিন-চারবার যেতে হয় প্রকাশকে।

ঢাকায় এক বাড়িতে লাঞ্চ খেয়ে এসেছে, পাঁচ রকমের মাছ, তিন রকম মাংসের রান্না, সব একটু একটু করে চাখতে গেলেও পেট ভরে যায়। শরীরে ক্লান্তি নেই, কিন্তু এখন একটু বিছানায় গড়িয়ে নিতে পারলে ভালো হতো। তাছাড়া, যে-কোনো বিমানযাত্রার পর সরাসরি বাড়ি পৌঁছোতেই ইচ্ছে করে।

তা বলে কি মায়ের সঙ্গে দেখা না করে যাওয়া যায়?

মা থাকেন নাগেরবাজারের কাছে, পথেই পড়বে। বাবা এক টুকরো জমি কিনে রেখে গিয়েছিলেন, অনেকদিন জমিটা এমনিই পড়েছিল। এখন প্রকাশরা তিন ভাই মিলে সেখানে একটা বাড়ি বানিয়েছে। মেজ ভাইয়ের সঙ্গে মা এখন সেই বাড়িতে থাকেন। যোধপুর পার্কে প্রকাশের কোম্পানির ফ্ল্যাট, বেশ বড়, মা সানন্দেই থাকতে পারতেন সেখানে। কিন্তু প্রকাশের বাড়িতে প্রায়ই নানারকম পার্টি হয়, মদ তো থাকবেই, অনেক সময় হইচই হয়, মা তাতে স্বস্তি বোধ করতেন না। সেইসব সন্ধেগুলোতে কোণের ঘরে চুপ করে বসে থাকতেন। অন্য দিনগুলোতেও প্রকাশ বেরিয়ে যায় সকাল নটায়, সরকারি অফিস নয়, ঠিক সাড়ে ন'টায় পৌঁছোতে হয়, ফিরতে ফিরতে রাত দশটা-এগারোটা, মায়ের সঙ্গে কথাই হতো না প্রায়। বিদিশা কিছু কিছু সোশ্যাল ওয়ার্ক করে, কোনো দুপুরেই বাড়ি থাকে না। ওদের একটি মাত্র ছেলে খড়গপুরে হস্টেলে থাকে। মা কথা বলার সঙ্গী পেতেন না সারাদিন। একে সানন্দে থাকা বলে না।

বরং নাগেরবাজারে নতুন বাড়িতে মা এখন বেশ খোশমেজাজে আছেন। তাঁর স্বামীর কেনা জমি, অর্থাৎ এটাই তাঁর স্বামীর ভিটে। এর আগে বহু বছর কেটেছে ভাড়া বাড়িতে, নিজস্ব ভিটে কিছু ছিল না। এ বাড়িতে থাকার আর একটা খুব বড় সাচ্ছন্দ্যের কারণ, আশেপাশের সব বাড়িগুলিই আত্মীয়-স্বজনদের। মামাতো ভাই, পিসতুতো বোন, জ্যাঠতুতো দাদা কিংবা প্রাক্তন গ্রামের লোক। সকাল-বিকেল একসঙ্গে বসে গল্প-গুজব হয়। মা-ই অন্য মহিলাদের চেয়ে বয়েসে সবচেয়ে বড় বলে আপদে-বিপদে, ঝগড়া-ঝাঁটিতে উপদেশ, পরামর্শ, বকুনি দিতে পারেন।

এখন ন'মাসে ছ'মাসেও মায়ের সঙ্গে দেখা হয় না প্রকাশের। বিদিশাই যোগাযোগ রাখে, অন্তত দু'বার এসে মায়ের সঙ্গে সময় কাটিয়ে

যায়। তাছাড়া টেলিফোনে কথা হয় প্রায় প্রতিদিনই। প্রকাশ খুব ব্যস্ত। অফিস যদি তাকে দুবাই কিংবা সিঙ্গাপুরে ট্রান্সফার করতো, তাহলে কি মায়ের সঙ্গে দেখা হতো? কলকাতার ব্যস্ততা বরং বেশি!

মায়ের বাড়ির সামনে গাড়িটা থামতেই দরজা খুলে গেল, তার মানে, গাড়ির শব্দের জন্য মা উৎকর্ণ হয়ে ছিলেন।

পাশাপাশি দুটি ঘরের মধ্যে ডানদিকের ঘরটি মায়ের শয়নকক্ষ। খাটের ওপর দু তিনটে বালিশ উঁচু করে আধ-শোওয়া হয়ে রয়েছেন মা, আর তিনটি মোড়ায় বসে আছেন তিনজন মহিলা, এক পাশে একটি খালি চেয়ার।

প্রকাশ পুরোদস্তুর সুট পরা, পায়ে জুতো-মোজা। জুতো পরে এ ঘরে ঢোকা ঠিক হবে কি না, এই ভেবে সে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছে, মা বললেন, জুতো খুলতে হবে না, তুই আয়, বোস!

অনেকদিন পরে পরে আসে বলে প্রকাশ প্রত্যেকবারই মাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। এখন, আজ যে তিনজন মহিলা বসে আছেন, এঁদেরও প্রণাম করা উচিত। এ এক ঝামেলা। প্রকাশের এখন পঞ্চাশ বছর বয়েস। যে ধরনের জীবন সে যাপন করে, তার সঙ্গে প্রণাম-টনামের কোনো সম্পর্ক নেই। শুধু মাকে প্রণাম করতে তার আপত্তি নেই। কিন্তু অন্য বয়স্কা মহিলারা কেউ পিসি, কেউ মামী, তাও দূর সম্পর্কের, এঁদেরও পায়ে হাত দিতে হবে? উপায় নেই, প্রকাশ জানে, মা ঠিক চোখ দিয়ে ইঙ্গিত করবেন।

শেষ মহিলাটির দিকে ঝুঁকতেই তিনি পা সরিয়ে নিয়ে বললেন, থাক থাক, আমাকে না, আমাকে না। তুমি পাকিস্তানে গিয়েছিলে?

এঁরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে দেশত্যাগ করে চলে এসেছেন। পরবর্তী ঐতিহাসিক পরিবর্তন এঁদের মনে এখনো ঠিক দাগ কাটেনি। ওদিককার খোঁজ-খবরও কেউ রাখে না বিশেষ।

প্রকাশ বললো, না, পাকিস্তান তো অনেক দূরে। আমি গিয়েছিলাম, কাছেই, এই বাংলাদেশে।

মা বললেন, একটু আগে একটা এরোপ্লেনের শব্দ পেলাম। তুই সেই প্লেনটাতেই এলি, তাই না?

প্রকাশ নেমেছে প্রায় দেড়ঘণ্টা আগে। তারপর নিশ্চয়ই আরো প্লেন উঠেছে নেমেছে। তবু সে মাথা ঝুঁকিয়ে বললো, হ্যাঁ। তুমি কেমন আছো, মা?

মা বললেন, ভালো আছি। কেন, বিদিশা বুঝি কিছু বলেছে ? সে কিছু না, একটু জ্বর হয়েছিল, এখন ঠিক হয়ে গেছি।

মা অসুখ নিয়ে আদিখ্যেতা করতে চান না। তা ছাড়া, অসুস্থ হয়েছেন বলেই ছেলে দেখতে এসেছে, না হলে আসতো না, এটা তিনি অন্যদের সামনে বোঝাতে চান না।

প্রকাশকে ডাক নামে ডাকবার মানুষ অনেক কমে গেছে। এই তিন মহিলার মধ্যে দু'জন প্রকাশকে শুধু ডাক নামে নয়, তুই তুই বলতেন—এখন প্রকাশের ভারিক্কী চেহারা ও সাজ-পোশাকের জন্য সমীহ করে তুমি সম্বোধন করছেন।

তৃতীয় মহিলাটির দিকে প্রকাশ আর একবার তাকালো। এই অমলা কাকিমাকে সে দেখছে প্রায় সাত-আট বছর পর। সে রকম কোনো আত্মীয়তা নেই, ক্ষীণ সম্পর্কের এক কাকার স্ত্রী, এঁরা নতুন বাড়ি করে উঠে গেছেন বেহালায়। নাগেরবাজারে আজ বেড়াতে এসেছেন।

প্রকাশের ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো। মাত্র দু'দিন আগে, বাংলাদেশের এক গ্রামের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে এই অমলা কাকিমার কথা সে একজনের মুখে শুনেছে বেশ কয়েকবার। তখন প্রকাশ ঠিক খেয়াল করেনি। ভেবেছিল, সে অমলা অন্য কোনো মহিলা। না তো, ইনিই। অদ্ভুত যোগাযোগ। কাকতালীয় বলা যেতে পারে।

অন্য দুইজন মামীমা। মেজো মামী আর নতুন মামী। নতুন মামী এখন রীতিমতন বৃদ্ধা। যাদের নাম তরুণ, তারাও তো এক সময় বৃদ্ধ হয়। অনেক ঝড়ঝাপটায় নতুন মামীর মুখেব চামড়া কিছুটা অকালেই মলিন হয়ে গেছে। সে তুলনায় মেজো মামী এখনো অনেকটা আঁটোসাঁটো। বাল্যকালে প্রকাশ এই নতুন মামীর বেশ ন্যাওটা ছিল। তিলের নাড়ু খেতে দিতেন। সে যেন গত জন্মের কথা। এখন প্রকাশ তিলের নাড়ু মুখেও ছোঁয়াবে না। মিষ্টি খাওয়া তার বারণ।

মেজো মামী জিজ্ঞেস করলেন—অ কুশু, কেমন দ্যাখলা ঐ দ্যাশটা ? আগেকার মতনি আছে ? আমাগো বাড়ি ঘরগুলান আছে না কিছু নাই ?

মা তাড়াতাড়ি বললেন, ঐ সব গ্রাম-ট্রামে কি ও যায় নাকি ? ওর কাজ তো ঢাকায়।

প্রকাশ ভেবেছিল, মায়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে, এক কাপ চা খেয়ে, মিনিট পনেরো কুড়ি মিনিটের মধ্যেই চলে যাবে। সন্ধেবেলা

একটা পার্টি আছে। বাড়ি ফিরে স্নান-টান করে, পোশাক বদলে বেরতে হবে সাতটার সময়। কিন্তু এখানে এই প্রাচীন আত্মীয়াদের সামনে তাড়াহুড়ো করাটা ভালো দেখায় না।

তা ছাড়া এই মহিলাদের খানিকটা চমকে দেবার ইচ্ছেটাও তাকে পেয়ে বসলো।

সে বললো, না, মা। এবার আমাকে গ্রামেও যেতে হয়েছিল। অন্যান্য বার ঢাকা আর চট্টগ্রামেই যাই শুধু। এবার যেতে হয়েছিল বরিশাল। আমাদের কোম্পানির সঙ্গে বাংলাদেশের একটা কোম্পানির জয়েন্ট ভেঞ্চার কারখানা হবে ঝালোকাঠিতে। সেই সাইট দেখতে গিয়েছিলাম।

তারপর অন্য মহিলাদের দিকে ফিরে বললো—বরিশাল কী করে গেলাম, শুনে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন। ঢাকা থেকে সোজা গাড়িতে। টানা রাস্তা।

নতুন মামীমা চোখ কপালে তুলে বললেন, কস কী? গাড়িতে? রাস্তা হইলো ক্যামনে? নদীগুলা গেল কোথায়?

এই মহিলারা এখন ট্রামে-বাসে, দোকানে-বাজারে আর বাঙাল ভাষায় কথা বলেন না। কলকাতার ভাষা শিখে নিয়েছেন। শুধু নিজেদের মধ্যে মাঝে মাঝে সেই গ্রামের ভাষা বেরিয়ে পড়ে।

বরিশাল পুরোপুরি জল ঘেরা জেলা। চতুর্দিকে নদী-নালা, খাল-বিল। নৌকা বা স্টিমার ছাড়া আসার কোনো উপায় ছিল না। নতুন মামীমার বাপের বাড়ি ছিল বরিশালে। তিনি সেই ছবিটাই ধরে রেখেছেন। তারপর কত যে পরিবর্তন হয়েছে, তা তিনি কল্পনাও করতে পারবেন না। ঢাকা থেকে কংক্রিটের মসৃণ রাস্তা। নদীগুলো উধাও হয়ে যায়নি, সব নদীই আছে। কিন্তু প্রত্যেক নদীতেই গাড়ি সমেত ফেরিতে পার হওয়ার চমৎকার ব্যবস্থা। প্রকাশকে এরকম ছ'খানা নদী পার হতে হয়েছিল। পদ্মা পার হতে সময় লেগেছিল পৌনে দু'ঘণ্টা, অন্য নদীগুলোতে দশ-পনেরো মিনিটের বেশি লাগে না।

বরিশাল সম্পর্কে কিছুক্ষণ গল্প করার পর প্রকাশ বার করলো তার তুরুপের তাস। মায়ের দিকে ফিরে সে সহাস্যে বললো, জানো মা, ফেরার সময় এক জায়গায় চা খাওয়ার জন্য গাড়ি থামানো হয়েছিল। দেখি যে সেই জায়গাটার নাম ট্যাকের হাট!

অচলা কাকিমা ছাড়া আর তিন মহিলাই রুদ্ধশ্বাসে বললেন—ট্যাকের হাট ?

মা জিজ্ঞেস করলেন, তুই চিনতে পারলি না ? রজনী হালদারের কত বড় দোকান।

প্রকাশ বললো, আমার কি মনে আছে নাকি ? তখন কত ছোট ছিলাম। রজনী হালদারের দোকান এখনো আছে কি না জানি না। তবে আরও অনেক দোকানপাট হয়েছে। বাস চলে।

নতুন মামী ম্লান গলায় বললেন, ট্যাকের হাট থেকে সুবুদ্ধিগঞ্জ মাত্র আট-নয় মাইল।

প্রকাশ বললো, আমার মনে আছে। ছোটবেলায় মনে হতো, অনেক দূর। নৌকোয় যেতে হতো।

মেজ মামী বললেন, নৌকোয় ছাড়া যাবি ক্যামভায় ?

প্রকাশ নিজে আর ফরিদপুরের ভাষা বলতে পারে না। কিন্তু শুনে বুঝতে পারে। 'ক্যামভায়' অর্থাৎ কেমন ভাবে। মেজ মামীরা পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে এসেছিলেন পঁয়ষট্টি সালে, সেই সময়কার ছবি, তাঁদের মনে একটুও বদলায়নি।

প্রকাশ বললো, আমার সঙ্গে ঢাকার তিনজন লোক ছিল। আমি চা খেতে খেতে তাদের বললাম, এই দিকেই সুবুদ্ধিগঞ্জ নামে একটা গ্রাম আছে না ? সেখানে আমার মামার বাড়ি ছিল। প্রত্যেক বছর পুজোর সময় আসতাম। তা শুনে আনিজ নামে একজন বললে, হ্যাঁ, সুবুদ্ধিগঞ্জ বেশ বড় গ্রাম। যান না, দেখে আসুন না, ওখানে এখনো কিছু কিছু হিন্দু আছে।

মা বললেন, গেলি ? তুই গেলি ?

প্রকাশ বললো, যাওয়া খুব সহজ, দুটো নদীর ওপর ব্রিজ হয়ে গেছে, গাড়িতেই যাওয়া যায়। বেশিক্ষণ লাগে না। আগে নৌকোয় অনেক ঘুর পথে যেতে হতো। আমাদের সঙ্গে দুটো গাড়ি ছিল, অন্যরা দ্বিতীয় গাড়িটায় ঢাকায় ফিরে গেল, আমার সঙ্গে বীরেন সরকার নামে একজন হিন্দু ভদ্রলোককে দেওয়া হলো। ঐ দিকেই আর একটা গ্রামে বীরেন সরকারের শ্বশুরবাড়ি।

নতুন মামী গালে হাত দিয়ে বললেন, ওমা, সুবুদ্ধিগঞ্জে ফিরে যাওয়া যায় ? সত্যি নাকি ?

এ যেন গতজন্মে ফিরে যাওয়ার মতন এক অসম্ভব প্রস্তাব।

মা বললেন, আমাদের বাড়িটা তো আর নেই, তাই না?

প্রকাশ বললো, শোনো না। অনেকক্ষণ তো মামার বাড়ি খুঁজেই পাইনি। লোককে জিজ্ঞেস করি, রায় বাড়ি কেউ বলতে পারে না। মেজ মামীমা, আপনাদের তো চ্যাটার্জি বাড়ি ছিল? তাও কেউ চেনে না। তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর কেটে গেছে, ঐসব নাম আর কে মনে রাখবে? তখন আমি ড্রাইভারকে বললাম, ইস্কুলটা খুঁজে বার করো। ইস্কুলটার কথা আমার বেশ মনে আছে। অন্যান্য গ্রামের তুলনায় সুবুদ্ধিগঞ্জের ইস্কুল বেশ বড়। সামনে খেলার মাঠ, পেছন দিকে মস্ত একটা দিঘি, লাল সিমেন্টের ঘাট বাঁধানো।

মা বললেন, আমার ঠাকুরর্দা ঐ ইস্কুল করে দিয়েছিলেন। আমাদেরই এক পূর্ব-পুরুষের নামে গ্রামের নাম। সুবুদ্ধিনারায়ণ রায়। তাঁর প্রতাপে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেত।

প্রকাশ বললো, ইস্কুলটা দেখেই চিনতে পারলাম। তখনই মনে পড়লো, দিঘিটার পাশ দিয়ে একটা রাস্তা আছে, সেই রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসতাম ইস্কুলে। আসার পথে চৌধুরীদের একটা বড় বাড়ি ছিল। লোহার গেটওয়ালা বাড়ি। সেই বাড়ির সামনে দিয়ে আসতে রোজ ভয় ভয় করতো। সে বাড়িতে একটা মস্ত বড় কুকুর ছিল। আমরা বলতাম ডালকুত্তা। তার মেঘের ডাকের মতন ঘাউ ঘাউ শুনলে বুক কাঁপতো।

মেজমামী বললেন, হ্যাঁ, ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীদের বাড়ি। ঐ গ্রামের সবচেয়ে বড় বাড়ি। সেখানে কেউ আছে এখনো?

প্রকাশ বললো, ভুতুড়ে বাড়ির মতন পড়ে আছে। অতবড় বাড়ি, ওঁরা এক্সচেঞ্জ করেননি কেন, কে জানে! দরজা-জানলা সব চোরেরা খুলে নিয়ে গেছে। লোহার গেট নেই, বাগান ভর্তি আগাছা. তবু বাড়িটা দেখলে চেনা যায়।

মেজমামী বললেন, সব বাড়িগুলারই ঐ দশা?

প্রকাশ বললো, হিন্দুদের কিছু কিছু বাড়ি এদিককার মুসলমানদের সঙ্গে এক্সচেঞ্জ করা হয়েছে. সেগুলোতে লোক থাকে। অনেকটা আগের মতনই। কিছু বাড়ি জবরদখল হয়েছে শুনলাম। ছোট ছোট বাড়িগুলো জরাজীর্ণ হয়ে ভেঙে মাটিতে মিশে গেছে। সেই জমি যে পারে সে নিয়ে নিয়েছে। ফাঁকা জমি কি পড়ে থাকে? পশ্চিমবাংলা থেকেও অনেক

মুসলমান বাড়ি ঘর ছেড়ে চলে গেছে, সেগুলো কি আর ফাঁকা পড়ে আছে ?

মেজমামী বললেন, এদিকে ওরা বিক্রি করতে পেরেছে, ওদিকে বিক্রি করতে দেয়নি !

নতুনমামী কিছু না বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ক্ষোভের কারণ তাঁরই বেশি। তাঁদের বাড়িটা বিশেষ বড় ছিল না। কিন্তু ফলের বাগান পুকুর সমেত সম্পত্তি ছিল অনেকখানি। সব ফেলে চলে আসতে হয়েছে কিছুই পাননি। পশ্চিমবাংলায় আসার পর বেশ কিছু বছর তাদের দিন কেটেছে চরম দারিদ্র্যে, এক মেয়ের সারাজীবন বিয়েই হলো না। এখন অবশ্য ছেলে দুটি দাঁড়িয়ে গেছে।

মা জিজ্ঞেস করলেন, শেষপর্যন্ত আমদের বাড়ি খুঁজে পেলি ?

প্রকাশ বললো, হ্যাঁ পেলাম কিন্তু সে বাড়িকে আর কেউ রায় বাড়ি বলে না। ওটা মুস্তাফা সাহেবের বাড়ি। বড়মামা ঐ বাড়ি এক্সচেঞ্জ করে বর্ধমানের গ্রামের একটি বাড়ি পেয়েছিলেন না ? এখন সেখানে মুস্তাফা সাহেবের পরিবার থাকে। দোতলা বাড়িটা প্রায় এক রকম দেখতে আছে শুধু তিনতলায় একটা ঘর উঠেছে। পাশের শিবমন্দিরটা ভেঙে ফেলেনি তবে প্রকৃতিই সেটাকে আর কয়েক বছরের মধ্যে নিশ্চিহ্ন করে দেবে বড় বড় অশথ গাছ গজিয়ে মন্দিরের দেওয়াল ফাটিয়ে ফেলেছে। মাথাটা হেলে গেছে খানিকটা। দরজা নেই, ভেতরে মনে হয় মা মনসার চ্যালাদের বাসা। মন্দিরের চাতালে ঘুঁটে শুকোচ্ছে দেখলাম।

—রোজ সকালে ঐ মন্দিরে আমরা তিন বোন পুজো দিতে যেতাম শিউলি গাছ দুটো নেই ?

—চোখে পড়লো না। একটা বড় বেল গাছ আছে।

—তখনো ছিল।

—আর একটা মজার ব্যাপার দেখলাম। বাড়ির সামনে তুলসীমঞ্চ ছিল, সেটা নষ্ট হয়নি। তুলসী গাছ এখনো আছে। ও বাড়ির কেউ রোজ সেখানে প্রদীপ জ্বালে !

—মুসলমানরাও তুলসীমঞ্চ মানে !

—হয়তো ভাবে তুলসীমঞ্চ ভাঙলে অমঙ্গল হয়। এটা একটা বাঙালি সংস্কার।

—তোকে বাড়ির মধ্যে যেতে দিল ?

—দেবে না কেন? এটা আমার মামার বাড়ি ছিল শুনে মুস্তাফা সাহেব খাতির করে ভেতরে নিয়ে বসালেন। বললেন একরাত থেকে যেতে। সেটা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। জোর করে অনেক মিষ্টি খাওয়ালেন। সবচেয়ে ভালো লাগলো কী দেখে জানো তো মা। তোমাদের বাড়ির পাশে যে বিশাল দিঘি, যার নাম ছিল কমল দিঘি, সেটা এখনো একই রকম আছে। সেই বিশাল ঘাট, যেখানে কুড়ি-পঁচিশজন লোক বসে গল্প করতে পারে, সেটা ঘাটের পৈঠায় বসে রইলাম বেশ খানিকক্ষণ। অনেক পদ্মফুল ফুটে আছে। ঐ দিঘিতেই তো আমি সাঁতার শিখেছিলাম, তাই না?

মা নিঃশব্দে ঘাড় নাড়লেন। এই দিঘিরই অন্য পাড়ে ছিল মেজমামী আর নতুন মামীদের বাড়ি। আমার মা কুমারী অবস্থায় ঐ দিঘিতে সাঁতার দিয়েছেন। মেজমামী আর নতুনমামী পনেরো-ষোলো বছর বয়েসে নববধূ হয়ে গিয়েছিলেন ঐ গ্রামে, তাঁরাও স্নান করেছেন ঐ দিঘিতে। হয়তো এই তিন রমণী স্নানের আগে ঘাটটায় বসে অনেক গল্প করতেন। স্মৃতি-মেদুর হয়ে গেল তাঁদের মুখ।

শুধু অমলা কাকিমার সেরকম প্রতিক্রিয়া নেই। তিনি সুবুদ্ধিগঞ্জে কখনো যাননি, ঐ গ্রামেরই ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বটে, কিন্তু তা কলকাতায় আসবার পর।

একটু পরে মা জিজ্ঞেস করলেন, রফিকুল সাহেবের সঙ্গে দেখা হলো?

প্রকাশ বলল, না। তিনি মারা গেছেন অনেকদিন আগে। তাঁর ছেলেরা লেখাপড়া শিখে বিদেশে চলে গেছে। তাঁর বাড়িতেও বিশেষ কেউ নেই।

মা বললেন, আহা, মানুষটা বড় ভালো ছিলেন।

এই রফিকুল সাহেবের কাহিনী আমি অনকেবার শুনেছি। পঁয়ষট্টি সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের সময় গ্রামে-গঞ্জে মুসলিম লিগের দৌরাত্ম্য খুব বেড়েছিল। সে দলের ছেলেরা থানা-পুলিস কিছুই গ্রাহ্য করতো না। তাদের উৎপাতে অনেক হিন্দু পরিবার দেশত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছিল। নতুন মামীদের বিশেষ ভয়ের কারণ ছিল, কারণ ও বাড়িতে ছিল দুটি কুমারী মেয়ে। একবার মেয়ে দুটিকে লুট করবার চেষ্টাও হয়েছিল। নতুন মামীরা তাই একদিন ভোরবেলা চুপি চুপি সবাই

পালালেন। ঘরে ঘরে মশারি টাঙানো, রান্নাঘরে উনোন জ্বলছে, বাইরে কয়েকখানা শাড়ি ঝুলছে, যেন সবাই মনে করে সবাই বাড়িতেই আছে। হিন্দু পরিবার দেশত্যাগ করলে কেউ বাধা দিত না, তবু ঐরকম গোপনীয়তার কারণ এই যে পালাবার খবর জানতে প্যারলে রাস্তার হামলা করে গয়নাগাঁটি, টাকা-পয়সাও কেড়ে নিত, অল্পবয়েসী মেয়েরাও নিস্তার পেত না। ঐ গ্রামের রফিকুল ইসলাম ছিলেন সৎ, উদারহৃদয় মানুষ। হিন্দুরা দেশ ছাড়া হয়ে যাচ্ছে বলে তিনি দুঃখ পেতেন, অসহায় অবস্থার কথাও বুঝতেন। তিনি নিজে নৌকো এনে নতুন মামীমার পরিবারের সবাইকে নিরাপদে মাদারিপুর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে স্টিমারে তুলে দিয়েছিলেন।

নতুন মামীমাদের বাড়িটা যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তা আর প্রকাশ বললো না। সে বরং উঠে দাঁড়িয়ে বললো, দাঁড়াও, তোমাদের একটা জিনিস দিচ্ছি।

বীরেন সরকার জোর করে দু'খানা পাটালি গুড় দিয়েছিলে। সুবুদ্ধিগঞ্জের গুড় নাকি বিখ্যাত। প্রকাশ গাড়ি থেকে একটা গুড় এনে বললো, এই দ্যাখো, তোমাদের গ্রামের জিনিস। একটু করে খেয়ে দেখ।

কেউই সেই গুড় খাবার জন্য ব্যগ্র হলো না। শুধু গন্ধ শুঁকে দেখলো।

নতুনমামীমা বললো, আমাগো একুইশটা খাজুর গাছ আছিল। কত রস হইত। পোলাপানরা গাছে উইঠ্যা চুরি কইরা রস খাইত!

মেজমামী বললো, আমি তো আর গুড়ই খাই না। এইখানকার গুড় আমার মুখেই রোচে না।

মেজ ভাই বা তার স্ত্রী বাড়িতে নেই, কাজের মেয়েটি এর মধ্যে লুচি আর বেগুন ভাজা করে ফেলেছে। এসব এখন প্রকাশকে খেতে হবে। পেট ভর্তি, তবু না বলার উপায় নেই। মা আগেই ব্যবস্থা করে রেখেছেন। অনেকদিন পর ছেলে দেখা করতে আসছে, মা তাকে কিছু খেতে দেবেন না, তা কি হয়! প্রকাশের পেটের মধ্যে যে এখনো বাংলাদেশের চিংড়ি, কই, চিতল মাছের মেটি, পাঙাস মাছের পেটি হজম হয়নি, সে কথা মাকে বোঝানো যাবে না।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে সে অমলা কাকিমার মুখের দিকে কয়েকবার চকিতে তাকালো। তার মনে পড়লো বীরেন সরকারের কথা।

বীরেন সরকার একজন মধ্যবয়স্ক, মাঝারি ধরনের অফিসার শ্রেণীর

মানুষ, প্যান্ট-শার্ট পরা। মাথায় অল্প টাক, এমনি কথাবার্তা শুনে বোঝা যাবে না এর জীবনকাহিনীটি সাঙ্ঘাতিক রোমাঞ্চকর। সুবুদ্ধিগঞ্জে ঘুরতে ঘুরতে বীরেন সরকার শুনিয়েছিল সেই গল্প।

একসময় গায়ের জামাটা তুলে বীরেন সরকার বললো, এই যে দেখুন, পাকিস্তানের মিলিটারি আমাকে গুলি করেছিল। তবু বেঁচে গেছি। এখনো এক এক সময় বিশ্বাস করতে পারি না যে আমি বেঁচে আছি।

বীরেনের বুকের ডান পাশে একটা গাবলা মতন বেশ বড় গর্ত। একজন হাতুড়ে ডাক্তার অপারেশন করে গুলিটা বার করে দিয়েছিল, তবু ঐ রকম গর্ত হয়ে আছে।

একাত্তর সালের সাতাশে মার্চের ঘটনা। বীরেন তখন ঢাকার জগন্নাথ কলেজের ছাত্র। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল বটে, কিন্তু তার প্রধান ভূমিকা ছিল গায়কের। মিছিলে সে গানে নেতৃত্ব দিত।

পঁচিশে মার্চের গণহত্যা শুরুর কারণটাই প্রথমে সে বুঝতেই পারেনি আরও অনেকের মতন। শেখ মুজিবের সঙ্গে ইয়াহিয়া খানের আলাপ-আলোচনা চলছে, এর মধ্যে সামরিক বাহিনী হঠাৎ গুলি চালাতে শুরু করবে কেন? পরিস্থিতির গুরুত্ব তখনো বীরেনদের মগজে ঢোকেনি। কিছু বোঝবার আগেই তার ছোট ভাই মারা গেল। মিছিল থেকে রাত্রে বাড়ি ফিরে এসে সে দেখল তার বাবা কনিষ্ঠ সন্তানের মৃতদেহ কোলে নিয়ে বসে আছেন! একটু আগে বাড়ির সামনেই পাক বাহিনী ছোট ভাইটিকে গুলি করে ফেলে রেখে গেছে। সেই অবস্থায় বাবা-মায়ের কোনো দায়িত্ব নেওয়াও সম্ভব হলো না তার পক্ষে, বাবা-মাই কাঁদতে কাঁদতে জোর করে বীরেনকে বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে বললেন।

বীরেনের মতন আরও কিছু যুবক গোপনে আশ্রয় নিয়েছিল একটা গির্জায়। সেখান থেকেও নিস্কৃতি পেল না। পাকিস্তানি সৈন্যরা গির্জার মধ্যে ঢুকে ধরে নিয়ে গেল সবাইকে।

শুধু যে হিন্দুদেরই ধরছে, মারছে তা নয়। যুবকদের দেখলেই ধরে আনছে। বিশেষত আওয়ামি লিগের কর্মীদের। যতীনের সমবয়েসী বাইশ জনকে টেনে হিঁচড়ে এনে ফেলে রাখা হলো জগন্নাথ হলের একটা ঘরে। স ঘরের দেওয়ালে তখনো রক্তের ছিটে লেগে আছে। এদের মধ্যে ছিল যতীনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফরহাদ। ফরহাদও ভালো গান গায়, গানের টিউশানি করে; দারুণ প্রাণবন্ত যুবক। বাইরে তখন কী ঘটছে জানে

না। ফরহাদের ধারণা, শেখ মুজিবের সঙ্গে ইয়াহিয়া-ভুট্টোর একটা কিছু সমঝোতা হবেই, তখন তারা ছাড়া পেয়ে যাবে। একজন কর্নেল এসে মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে কথা বলে যায়, প্রত্যেককে জেরা করে, তার ব্যবহার কর্কশ নয়। সে শুধু প্রত্যেকের রাজনৈতিক পরিচয় জানতে চায়। ফরহাদের পরামর্শে যতীন নিজের নাম লিখেছিল ফজলুর রহমান। সে রসুলের নাম বলতে পারে, নামাজ পড়তে পারে, সেদিকে কোনো খুঁত ছিল না। তাদের কিছু খাবার দেওয়া হতো না বটে, কোনো শারীরিক অত্যাচারও হয়নি।

দু'দিন পর ভোরবেলা সবাইকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হলো সামনের মাঠে। সার বেঁধে তাঁদের দাঁড় করিয়ে দেবার পর দেখা গেল রাইফেল হাতে নিয়ে মার্চ করে আসছে কয়েকজন পাক-সৈন্য। চোখের সামনে মৃত্যু দেখলেও বিশ্বাস হয় না। মনে হয়, এখনো কোনো অলৌকিক ঘটনায় সব কিছু বদলে যাবে। সৈন্যরা অন্য সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। এই কয়েকজন নিরীহ যুবক, যারা কোনোদিনও বোমা-বন্দুক ছোঁড়েনি, তাদের শুধু শুধু মেরে ফেলবে?

সেই মিষ্টভাষী কর্নেলটিই সৈন্যদের রাইফেল তুলে দাঁড়াবার নির্দেশ দিচ্ছে। এখনো মনে হচ্ছে, সবটাই তামাশা, নিছক ভয় দেখাবার জন্যই এই আয়োজন।

রাইফেলধারী মাত্র তিনজন, তারা সত্যিই গুলি চালালো, তিনটি লাশ পড়ে গেল মাটিতে। এইভাবে তিনজন তিনজন করে মারবে? বীরেন আর ফরহাদ দাঁড়িয়েছে পাশাপাশি, চোদ্দ পনেরো জনের পরে। তাদের মৃত্যুর আর কয়েক মিনিট বাকি। ফরহাদ নিজের বুকে হাত বুলিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। বীরেন কাঁদতেও ভুলে গেছে। সত্যিই মরে যেতে হবে?

ফরহাদ বীরেনের হাত চেপে ধরে ফিসফিসিয়ে বললো, ভাই—তুই যদি বাঁচিস আমার জন্য একটা কাজ তোকে করতে হবে।

সবটা না শুনেই বীরেন বললো, আর তুই যদি বাঁচিস, আমার বাবা-মাকে দেখবি কথা দে? বুড়ো-বুড়ির আর কেউ নেই, আমার ভাইটাও নেই।

ফরহাদ বললো, আমি বাঁচলে তোর বাবা-মাকে নিজের জান দিয়েও বাঁচাবো। আর তুই, তুই যদি বেঁচে যাস, তাহলে অমলাকে একটা কথা

বলবি ? তোদের পাশের বাড়ি থাকে অমলা, তাকে গান শিখিয়েছি। ভাই বীরেন, আমি অমলাকে ভালোবাসি। তার সঙ্গে আমার বিয়ের সব কথা ঠিক হয়ে গিয়েছিল। ওদের বাড়িতেও রাজি ছিল। কথার খেলাপ হয়ে গেল। অমলা যদি আমার খবর না পায়, ভাববে, আমি বেইমান, আমি পালিয়ে গেছি। বলিস, অমলাকে ছাড়া জীবনে আর কারুকে ভালোবাসিনি। মরার আগেও শুধু তার কথা—অমলা, অমলা।

অন্যরা অনেকে চেঁচিয়ে কাঁদছে, ওদের কথা আর কেউ শুনতে পেল না। গুলি লাগলো দু' জনের বুকে। ঝুপ করে পড়ে গেল মাটিতে। এর মধ্যেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি নেমেছিল, কাজ শেষ করে পাক-সৈন্যরা চলে গেল। সব মৃতদেহগুলো পড়ে রইলো সেখানে, কেউ কেউ সাঙ্ঘাতিক আহত হয়ে কিছুক্ষণ গুঙিয়ে গুঙিয়ে তারপর মরলো। বৃষ্টি হলো সারাদিন।

সন্ধের সময় বীরেনের জ্ঞান ফিরে এলো। বুকের ডান দিকে অসহ্য ব্যথা, কিন্তু সে ব্যথাই প্রমাণ করে দিল সে মরেনি। গুলি তার বুক ফুঁড়ে গেছে, তবু তার প্রাণ আছে। তার গায়ের ওপরই পড়ে আছে ফরহাদ, তার শরীর একেবারে শক্ত, ঠাণ্ডা।

কাছাকাছি কোনো মানুষজন নেই। বন্ধুর মৃতদেহটা জোর করে সরিয়ে দিয়ে বীরেন উঠে দাঁড়িয়েছিল। বুকের মধ্যে বুলেটটা ঢুকে আছে, সেই জায়গাটা চেপে ধরে সে হাঁটতে আরম্ভ করলো।

শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেছে বীরেন। এখন চাকরি করছে, সংসারী মানুষ। কাহিনীটা শোনাবার পর সে বলেছিল, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফরহাদের শেষ অনুরোধটা আমি রাখতে পারিনি। অমলা ছিল আমাদের পাশের বাড়ির ভটচার্যিদের মেয়ে। তাকে চিনতাম। বেঁচে ওঠার পর আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম ইন্ডিয়ার ত্রিপুরায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ঢাকায় ফিরে এসে আর সেই ভট্টাচার্যিদের দেখতে পাইনি। তাদের বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। শুনেছি, অমলা আর তার দুই কাকা পালিয়ে গিয়েছিল কলকাতায়। অতবড় শহর কলকাতা, সেখানে অমলাকে কোথায় খুঁজবো ? কলকাতায় আমাদের আত্মীয়স্বজন সেরকম নেই। আমার বিশেষ যাওয়া হয় না। তবু মাঝে মাঝে অপরাধবোধ হয়। অমলাকে ফরহাদের শেষ কথাটা জানানো হলো না, ফরহাদ পালিয়ে যায়নি, অমলার নাম বলতে বলতে সে প্রাণ দিয়েছে।

চা শেষ হয়ে গেছে। এবার একটা সিগারেট ধরাতে হবে, মায়ের সামনে সিগারেট খায় না প্রকাশ। সে বারান্দায় গিয়ে অমলা কাকিমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলো।

বিয়ের আগে অমলা কাকিমা ভট্টাচার্য ছিলেন। এখন চক্রবর্তী। অমলা নামটা খুব বেশি মেয়ের হয় না। অমলা এখন প্রৌঢ়া, রূপ ঝরে গেছে, তিনটি সন্তানের মা। ক্লান্ত চোখের দৃষ্টি দেখলে মনে হয়, সংসার তাকে তেমন কিছু সুখ শান্তি দিতে পারেনি।

প্রকাশ জিজ্ঞেস করলো, অমলা কাকিমা, আপনি তো বিয়ের আগে ঢাকায় পড়াশুনো করতেন, তাই না?

অমলা কাকিমা মাথা নাড়লেন।

—আপনি গান শিখতেন, আপনাকে একজন গান শেখাতো।

—সে এমন কিছু না।

—একাত্তরের পঁচিশে মার্চের পর চলে আসেন, আর যাননি?

—নাঃ! আর কোনোদিন যাওয়া হবে না। যেতে চাইও না।

—আপনার ফরহাদকে মনে আছে?

অমলা কাকিমা আমার দিকে চোখ তুলে চাইলেন। মুখখানা কেমন যেন বদলে যেতে লাগলো। যেন তিন সন্তানের জননী নয়, ঢাকার সেই উচ্ছল তরুণী, একজন মুসলমান যুবক যার পাণিপ্রার্থী, নিশ্চয়ই দু'পক্ষের বাড়িতেই ঘোর আপত্তি উঠেছিল, তবু সব কিছু উপেক্ষা করে ওরা ঘর বাঁধতে চেয়েছিল।

প্রকাশ বললো, এবার গিয়ে একজনের কাছে ফরহাদের কথা শুনলাম। সে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হয়েছে। মনে আছে সেই ফরহাদের কথা?

অমলা কাকিমার দু' চক্ষু দিয়ে জল গড়াতে লাগলো। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে আমার সঙ্গে অন্য একটাও কথা না বলে চলে গেলেন ঘরের মধ্যে।

পঁচিশ বছর আগে অকারণে ঘাতকের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে ফরহাদ। তবু এতদিন পর একজন তার জন্য দু'ফোঁটা চোখের জল ফেললো। রক্তের দাগ মিলিয়ে যায়, বুকের মধ্যে অশ্রু জমা থাকে এতদিন?

মা

জানলার পর্দাটা সরিয়ে দিল দীপ। সকাল থেকেই ঝুরঝুরু বরফ পড়ছে। বাড়ির সামনের রাস্তার ওপারেই পার্ক। ওয়াশিংটন স্কোয়ার। এর মধ্যেই পার্কটা প্রায় সাদা হয়ে এসেছে তুষারে।

শুরু হলো সুদীর্ঘ শীতকাল। কঠিন শীতকাল। সব সময়ে এক গাদা পোশাকে জবরজং হয়ে থাকতে হবে।

এই সোমবারটাও ছুটি ছিল। শুক্কুরবার বিকেল থেকে সোমবার রাত্তির পর্যন্ত টানা ছুটি, ভাবাই যায় না। লং উইক-এন্ড। যেন এক অত্যাশ্চর্য উপহার।

কিন্তু সোমবার বিকেল হতেই মনে হয়, ছুটি ফুরিয়ে এলো। কাল থেকে আবার কাজ। কাজ। কাজ আর কাজ। ধরাবাঁধা রুটিন। ভাবলেই জ্বর আসে।

চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে খানিকটা দেখলো দীপ। তারপর জানলার কাচের একটা পাল্লা খুলে দিল। এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস এসে লাগলো তার বুকে। সে বাইরে হাত বাড়িয়ে দিল পেঁজা তুলোর মতন তুষারের স্পর্শ অনুভব করার জন্য। প্রত্যেক বছরই প্রথম তুষারপাতের দিনটায় খানিকটা উত্তেজনা আসে। দেখতে দেখতে বারো বছর কেটে গেল, তবু এখনো এই দিনটাকে একটা বিশেষ দিন বলে মনে হয়। এখন মোটে সাড়ে চারটে, হিসেব অনুযায়ী বিকেল, কিন্তু এর মধ্যেই আলো কমে এসেছে খুব। শীতকালের বিকেলটা টেরই পাওয়া যায় না। দুপুরের পরেই সন্ধে।

কাপের চা পুরো শেষ হয়নি, দীপের হঠাৎ ইচ্ছে হলো সব সুদ্ধু রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিতে। সে প্রায় ছোঁড়ার মতন করে তুলে ধরে কেঁপে উঠলো,

এ কী করছে সে ?

তার অ্যাপার্টমেন্ট সাততলায়। এখান থেকে রাস্তায় একটা কাপ ছুঁড়ে ফেলার কথা কেউ কল্পনাই করতে পারে না। ব্রুকলিনের একটা ব্যস্ত রাস্তা। এদেশের রাস্তা দিয়ে লোকজন প্রায় হাঁটেই না, সবাই গাড়িতেই যায়। কিন্তু কাছেই কিছু দোকান-পাট রয়েছে. কেউ কেউ খানিক দূরে গাড়ি পার্ক করে এখানে হেঁটে আসে, দীপ দেখতে পাচ্ছে ছাতা মাথায় কিংবা রেন কোট গায়ে কয়েকজন যাওয়া-আসা করছে।

তবু দীপের অদম্য ইচ্ছে হতে লাগলো কাপটা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলার।

দীপ যেন নিজের ওপর প্রবল জোর খাটিয়ে সরে এলো সেখান থেকে। কাপটা রাখলো রান্নাঘরের টেবিলে। একটা সিগারেট ধরালো। তার হাত কাঁপছে!

বাথরুমের দরজাটার পেছনে একটা মানুষ-সমান আয়না লাগানো। আগে থেকেই ছিল। এই অ্যাপার্টমেন্টটা দীপ কিনেছে দেড়বছর। আগে এখানে থাকতো দু'বার বিয়ে-ভাঙা এক ইটালিয়ান মহিলা। দীপের বন্ধু বাল্লু বলেছিল, তুই ঐ অ্যাপার্টমেন্টটা যার কাছ থেকে কিনেছিস, সে মেয়েটার তো মাফিয়া-কানেকশান আছে শুনেছি। সে বেচল কেন, কোনো গোলমাল নেই তো? সে যাই হোক, মহিলাটি এই আয়নাটা লাগিয়েছিল। স্নান করার সময় সে কি নিজের সর্বাঙ্গ দেখতে ভালবাসতো? কিংবা অন্য কিছু উদ্দেশ্য ছিল?

সেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দীপ জিজ্ঞেস করলো কী ব্যাপার তোমার? হঠাৎ কাপটা রাস্তায় ছোঁড়ার ইচ্ছে হলো কেন?

আয়নার ভেতরের দীপ একটু হাসলো।

তারপর বাঁকা সুরে বললো, আজকাল প্রায়ই তো দেখছি, তোমার এরকম এক একটা উদ্ভট ইচ্ছে হচ্ছে। পরশু দিন কী করেছিলে? পরশু মানে গত শনিবার। দীপ তার পাড়ার সুপার মার্কেট থেকে সপ্তাহের বাজার করতে গিয়েছিল।

ট্রলিটা নিয়ে ঘুরছে। এক প্যাকেট মাখ, তুলতে গিয়ে আর একটা মাখনের প্যাকেট পড়ে গেল মাটিতে। কোন কিছু চিন্তা না করেই দীপ সেই প্যাকেটটা জুতো দিয়ে মাড়িয়ে দিল। চেপে পিষে দিল প্রায়। তারপর ঠেলে দিল র‍্যাকের নিচে।

সে তো চুরি করেনি। একটা মাখনের প্যাকেটের ওপর পা পড়ে যাওয়া কোনো অপরাধ নয়। কেউ দেখতে পেলেও কিছু বলতো না। কিন্তু ইচ্ছে করে সে কেন একটা প্যাকেট মাখন নষ্ট করলো? কোনো যুক্তি নেই এর।

আয়নার ভেতরের দীপ বললো, আরও বলবো?

খোলা জানলাটা দিয়ে হু-হু ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে এখন। ঘরের হিটিং চালু আছে, তার মধ্যে এই হাওয়া ঢুকে একটা বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার হচ্ছে। বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করে দীপ দৌড়ে গেল জানলার কাছে।

সেটা তক্ষুনি বন্ধ করে দীপ মাথা বাড়িয়ে দেখলো।

কাপটা ছুঁড়লে রাস্তা পর্যন্ত পড়তো না। তাদের বিল্ডিং-এর সামনের দিকে একটা চত্বর রয়েছে। এক চিলতে বাগান। ওখানেই পড়তো এমন কি ক্ষতি হতো তাতে ? ওখানে তো সে মাঝে মাঝে বিয়ার-ক্যান পড়ে থাকতে দেখে। সিগারেটের প্যাকেট, পেপার গ্লাস। বাইরে জিনিস ফেলা এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। এদেশে এদের পরিষ্কার-বাতিক আছে বটে, আবার কেউ কেউ ইচ্ছে করে নোংরাও করে। গাড়ির জানলা দিয়ে রাস্তায় বোতল ছুঁড়ে দেয়।

নিচে কেউ নেই। এখন কাপটা ছুঁড়ে ফেললে মন্দ হয় না, কেউ দেখবে না। তাহলে ফেলাই যাক না।

দীপ আবার কাপটা আনবার জন্য ফিরেও থমকে গেল। সে কি পাগল হয়ে যাচ্ছে নাকি ? আস্ত একটা কাপ, চারখানার সেটের মধ্যে একটা, এটা শুধু সে ভাঙবে কেন ? এই চিন্তাটা আসছে কোথা থেকে ?

লম্বা উইক-এন্ডের ছুটিতে অনেকেই বাইরে যায়। বীরেনদা-সুরূপাবৌদিরা গেল ওয়াশিংটন ডি. সি.। দীপকেও সঙ্গে যাবার জন্য অনেক অনুরোধ করেছিল। চয়ন আর বাল্লু গেল হারভার্ড, ওদের গাড়িতে জায়গা ছিল। জুডিও গেল কানেটিকাট, ওর দিদির কাছে। দীপকে নিয়ে যাবার জন্য খুব ঝুলোঝুলি করেছিল, কিন্তু সে রাজি হয়নি। সবাইকে সে বলেছিল, এই ছুটিতে সে তার ঘরগুলোর ওয়াল পেপার পাল্টাবে।

কিছুই করেনি দীপ। শুক্রবার সন্ধে থেকে স্রেফ শুয়ে শুয়ে কাটিয়ে দিল ছুটিটা। কারুর সঙ্গে দেখা হয়নি। এদেশে এমন একাকিত্ব অতি মারাত্মক।

কাল থেকে অফিস। আজ সন্ধের মধ্যে সবাই ফিরবে। আজ রাত্তিরে কেউ আর আড্ডা দেবে না। তবু দীপ একটু পরেই ফোন করলো বাল্লুকে। পেয়েও গেল। গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞেস করলো, বাল্লু, আমার আজ রাত্তিরে রান্না করতে ইচ্ছে করছে না, তোর ওখানে গেলে খেতে দিবি ? কিংবা, ডাউন টাউনে আমার সঙ্গে খেতে যাবি কোথাও ?

বাল্লু বললো, আমার এখানেই চলে আয় ! দীপ এইরকম একা থাকে বলে সবাই অবাক ! অত ভালো একটা অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছে কেন তবে ? বিয়ে

করবার ইচ্ছে যদি তার নাও থাকে, একজন সঙ্গিনী তো পেতেই পারে। জুডি নামের মেয়েটির সঙ্গে দীপ স্টেডি যাচ্ছে অনেকদিন। জুডির ভারি মিষ্টি স্বভাব। অন্য সবাই পছন্দ করে তাকে।

দীপ বিয়ের কথা একেবারেই ভাবে না।

জুডিকে সে পছন্দ করে খুবই, জুডির ব্যবহারে কোনো মালিন্য নেই, জুডি তার মন বোঝে। শারীরিক সম্পর্কও বেশ পরিষ্কার। কিন্তু জুডির সঙ্গে লিভ টুগেদার করার ইচ্ছে নেই দীপের। জুডির মনে মনে ইচ্ছে আছে তা সে বোঝে, কিন্তু জুডি মুখ ফুটে কথাটা বলেনি। জুডিকে অন্য একটি মেয়ের রুম শেয়ার করে থাকতে হয় কুইন্‌সে, দীপ একবার বললেই সে চলে আসবে।

কিন্তু দীপ সর্বক্ষণ জুডিকে চায় না।

জুডি তার এখানে এসে একসঙ্গে থাকলে অন্য বাঙালিরা বা তার বন্ধুরা কী বলবে, তা গ্রাহ্য করে না দীপ। যেদিন ইচ্ছে করবে, সেদিনই সে জুডিকে ডাকবে। কিন্তু এখনো তার একা থাকতে ভাল লাগে মাঝে মাঝে।

পরদিন সকালবেলা পুরো সাজপোশাক করে অফিসে বেরুতে গিয়ে দীপ একবার ভাবল, গাড়ি নেবে, না সাবওয়েতে যাবে ? বরফের মধ্যে গাড়ি চালানো এক ঝকমারি। দীপের বাড়ির কাছেই স্টেশন, তিন মিনিটে হেঁটে যাওয়া যায়।

তারপর মনে পড়লো, জুডি গাড়ি আনে না, ওদের অফিসের কাছে পার্কিং-এর কোনো জায়গাই পাওয়া যায় না। তিনদিন পর দেখা হবে, আজ জুডিকে নিয়ে কোথাও খেতে যাওয়া এবং তারপর তার নিজের বাড়িতে ওকে কিছুক্ষণের জন্য আনা কিংবা জুডিকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া তার উচিত।

গাড়ির চাবিটা সে নিয়ে নিল।

আজই ব্রুকলিনে ব্রিজের ওপর সাঙ্ঘাতিক জ্যাম।

এখান থেকে নিউইয়র্ক শহরটা অপূর্ব দেখায়, এতবার দেখে দেখেও দীপ মুগ্ধতা হারায়নি, কিন্তু আজ তার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে, কেন সে গাড়িটা আনতে গেল ?

রেডিওটা খুলে সে ট্রাফিক পোজিশান জানার চেষ্টা করলো।

বিশ্রী খবর, সামনের তিন-চার জায়গায় গাড়ির জটলা। কখন ঠিক হবে, তার কোনো ঠিক নেই।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ছটফট করতে লাগলো দীপ। অফিসের দেরি হয়ে যাবে, এটা সে সহ্য করতে পারবে না! অথচ ট্রাফিক জ্যাম কি নতুন কিছু ? অফিসের লোকেরাও জেনে যাবে ব্রুকলিন ব্রিজের অবস্থা!

দীপের ইচ্ছে হলো, গাড়ির দরজা খুলে নেমে চাবিটা জলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে। তার পর সে হেঁটে চলে যাবে। গাড়িটা থাক এখানে পড়ে। পেছনের লোকগুলো চেঁচামেচি করুক। পুলিশ এসে গাড়িটা টো করে নিয়ে যাক, যত ইচ্ছে ফাইন হোক, যা খুশি হোক, তবু দীপ কিছুতেই এখানে বসে থাকতে পারবে না।

গাড়ি থেকে নেমে দীপ আবার ধাতস্থ হলো। এটাও পাগলামির লক্ষণ। এভাবে গাড়ি ছেড়ে যাওয়াটা চলে না।

দীপ অফিসে পৌঁছলো ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিট দেরিতে।

বিভিন্ন সহকর্মীর দিকে তাকিয়ে সে হাই ল্যারি, হাই বার্ট, হাই লিন্ডা এইসব বলতে বলতে এগোলো। তার দেরি বিষয়ে কেউ কোনো প্রশ্ন করলো না। সে পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে এসেছে। ছুটির পর আরও পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে যাবে, এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার!

নিজের ঘরে ঢুকে দীপ তার ওভারকোট, জ্যাকেট এমনকি সোয়েটার পর্যন্ত খুলে ফেললো। ভেতরটা বেশ গরম, কে বলবে যে বাইরের তাপমাত্রা এখানে শূন্যের নিচে স্যাত ডিগ্রি। হঠাৎ শীত এসেছে। অথচ শীতকালেই অফিসের মধ্যে দীপের বেশি গরম লাগে। কাজে ডুবে রইলো তিন ঘণ্টা। এর মধ্যে দু' বার বসের ঘরে যেতে হলো, টেলিফোন ধরলো এগারোবার, দু' কাপ কফি খেল, দু'জন সহকর্মী ও একজন সহকর্মিনী গল্প শোনালো উইক-এন্ডের ছুটিতে কী কী মজা হয়েছে। দীপ কী ভাবে ছুটি কাটিয়েছে তা অন্যরা জানতে চাইলে সে অম্লান বদনে বললো তিনখানা ঘরের ওয়ালপেপার বদল করেছি, খুব খাটুনি গেছে।

এরপর সামান্য একটা ঘটনা ঘটলো।

টেবিল থেকে একটা পেপার ওয়েট পড়ে গেল নিচে। সেটা তোলার বদলে দীপ প্রায় যেন নিজের অজান্তেই সেটাকে একটা শট লাগালো। খুব জোরে। এত জোরে যে ফাইবার গ্লাসের পার্টিশানে সেটা লেগে বোমা ফাটার মতন দড়াম করে একটা শব্দ হল। পাশের ঘর থেকে তার সহকর্মী ল্যারি উঠে এসে উঁকি মেরে জিজ্ঞেস করলো, হোয়াট হ্যাপ্‌ন্‌ড ?

দীপ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, নাথিং!

ল্যারিও বিনা বাক্যব্যয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফিরে গেল।

পেপার ওয়েটটার দিকে তাকিয়ে দীপ দাঁতে দাঁত চেপে খুব খারাপ একটা গালাগালি দেওয়ার ভঙ্গিতে বললো, এনাফ ইজ এনাফ! ঠিক পরের মুহূর্তেই তার ঘরে এলো বার্ট আর লিন্ডা।

বার্ট দীপেরই সমবয়সী, লিন্ডা বছর দু'একের ছোট। কিন্তু পদমর্যাদায় লিন্ডা একটু ওপরে। লিন্ডা বিয়ে করনি, তার মন-প্রাণ সব কিছু সে অফিসের কাজে ঢেলে দেয়।

তেমন লম্বা নয় লিন্ডা, একটু ভারি দিকে গড়ন, কিন্তু মুখে একটা শ্রী আছে। সে কেন বিয়ে করেনি, সেটা একটা রহস্য, তার কোনো বয় ফ্রেন্ডও নেই। লিন্ডার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কোনো প্রশ্ন করা যায় না, কখনো সেরকম প্রসঙ্গ উঠলেই সে এড়িয়ে যায়। বার্ট বেশ খোলামেলা, হাসি-খুশি ধরনের মানুষ। শুধু যে দীপের সহকর্মী নয়, তার সঙ্গে সম্পর্কটা অনেকটা বন্ধুর মতন। বার্ট বিবাহিত, লিন্ডার সঙ্গে তার হৃদয়-ঘটিত কোনো গোলযোগ নেই।

লিন্ডা বসলো একটা চেয়ার টেনে, বার্ট বসলো টেবিলের এক কোণে। দীপের সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে বললো, আবার তুমি সিগারেট খাচ্ছো ? বলেছিলে যে অফিসে একটাও খাবে না ?

দীপ ক্লিষ্ট ভাবে হেসে বললো, ছাড়তে পারছি না যে !

লিন্ডা বললো, সিগারেট ছাড়ার প্রথম স্টেপ হলো, কাছাকাছি সিগারেট না রাখা। চোখের সামনে একদমই প্যাকেট রাখবে না। যাই হোক, তুমি আজ লাঞ্চ খেতে কোথায় যাচ্ছো ? যদি কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট না থাকে, আমাদের সঙ্গে চলো। তোমার মিনিয়াপোলিস ট্রিপটা সম্পর্কে সব কিছু ব্রিফ করে দেবো !

দীপ অবাক হয়ে বললো, মিনিয়াপোলিস ট্রিপ মানে ?

বার্ট বললো, তোমাকে মিনিয়াপোলিস যেতে হবে। মনে নেই ? গত সপ্তাহে কথা হয়েছিল। মিঃ জ্যাকসন তোমাকেই পাঠাতে চাইছেন। একটা ইনস্টলেশানের ব্যাপার আছে। বোধহয় দিন চারেক লাগবে তোমার।

দীপ দূরের পেপার ওয়েটটার দিকে আবার তাকালো।

যেমন ভাবে পেপার ওয়েটটা আচমকা মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল, সেই রকমই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে দীপ বললো, আমি তো মিনিয়াপোলিস যেতে পারবো না। আমি বাড়ি যাবো, ইন্ডিয়ায়।

বার্ট বললো, হোম, সুইট হোম ! বাড়ি যেতে কার না ইচ্ছে হয়। কিন্তু মাই ডিয়ার, তুমি তো জানুয়ারির আগে তোমার অ্যানুয়াল ছুটি নিতে পারছো না। জর্জ আর জিমি দু'জনেই ছুটিতে। লিন্ডা বললো, তুমি জানুয়ারিতে চার-পাঁচ সপ্তাহ ছুটি নিতে পারো। তখন ইন্ডিয়ার ওয়েদার কী রকম ?

দীপ বললো, অ্যানুয়াল ছুটি নয়। আমি একেবারে দেশে ফিরে যাবো। লক স্টক অ্যান্ড ব্যারেল !

বার্ট ভুরু তুলে বললো, হোয়াট ? আর ইউ কিডিং ?

দীপ দু দিকে ঘাড় নাড়লো।

না সে ঠাট্টা করছে না। একবার মুখ ফসকে যখন কথাটা বেরিয়ে গেছে, তখন আর নড়চড় হবে না সে কথার। এনাফ ইজ এনাফ। তার আর ভালো লাগছে না। সে সব কিছু ছেড়ে দেশে চলে যাবে।

সারা অফিসে রটে গেল যে ডীপ রে মিনিয়াপোলিস যেতে হবে শুনে চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে। সেখানকার একটা ফ্যাকট্রিতে কয়েকটা মেশিন ইনস্টলেশান নিয়ে ঝঞ্ঝাট হচ্ছে কিছুদিন ধরে। একটা বয়লার বার্স্ট করে দু'জন লোক আহত হয়েছে পর্যন্ত।

আসল নাম ছিল দীপক রায়চৌধুরী। ও নাম উচ্চারণ করতে এখানকার লোকের দাঁত ভেঙে যায়। তাই দীপক হয়েছে ডীপ। আর রে পদবীটা এদের অনেকেরই চেনা।

একটু পরে দরজায় নক করে আবার ঘরে এসে ঢুকলো লিন্ডা। হাসি মুখে বললো, ওকে ডীপ, তোমার মিনিয়াপোলিস যেতে হবে না। মিঃ জ্যাকসনকে আমি কনভিন্স করিয়েছি, তোমার বদলে ল্যারি যেতে পারে। দীপ খানিকটা চটে উঠে বললো, হোয়াট ? কে তোমাকে বলেছে যে ওখানে যাবার ভয়ে আমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি ! ওখানে যেতে আমার কোন আপত্তি ছিল না। আমার মনে হয় না, কাজটা খুব ডিফিকাল্ট ! আমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি, তার কারণ, দু একদিনের মধ্যেই আমি দেশে ফিরে যেতে চাই !

লিন্ডা খুব নরম ভাবে জিজ্ঞেস করলো, দেশে ফেরার জন্য তোমার এত আর্জেন্সি কিসের তা কি জানতে পারি ? এই কোম্পানির কেউ তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে ? তুমি কি কোম্পানির কাছ থেকে আরও কিছু আশা করেছিলে ?

লিন্ডা নিজের ব্যক্তিগত কারণ কারুকে বলে না। তবে সে দীপের ব্যক্তিগত কারণ জানতে চায়। দীপের মতন একজন অশ্বেতাঙ্গ ইঞ্জিনিয়ার চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে, তাতে কোম্পানির কী আসে যায় ? তার বদলে আরও অনেককে পাবে। তবু লিন্ডার মতন মেয়ে এরকম একটা প্রশ্ন করেছে বলেই একটা উত্তর দিতে হয়। দীপ লিন্ডার চোখের দিকে ককয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে বললো, কারণটা শুনলে বোধহয় তোমরা হাসবে ! এদেশে কেউ এরকম কথা বলে না। কিন্তু আমাদের দেশে অনেক পুরোনো ট্র্যাডিশান, পুরোনো ভ্যালুজ রয়ে গেছে। আমি ফিরে যাচ্ছি আমার মায়ের জন্য !

—তোমার মায়ের জন্য ?

—হ্যাঁ। কয়েকদিন ধরে আমার মায়ের কথা খুব মনে পড়ছে। আমাকে ছেড়ে থাকতে আমার মায়ের খুব কষ্ট হয়। প্রায়ই কান্নাকাটি করেন। চোখে ভালো দেখতে পান না। তাই আমার ইচ্ছে হচ্ছে, শেষের কয়েকটা বছর মায়ের কাছে গিয়ে থাকতে!

লিন্ডা যেন এরকম কথা কখনো শোনেনি। সে প্রায় হাঁ করে চেয়ে রইলো বেশ কয়েক মুহূর্ত।

তারপর আস্তে আস্তে বললো, চাকরি ছেড়ে দিয়ে তোমার মার কাছে থাকবে? কোথায় থাকে তোমার মা?

—কলকাতা শহর থেকে কিছুটা দূরে। একটা গ্রামে। একা।

—উনি কোন কাজ-টাজ করেন?

—না, লিন্ডা। আমার মা এখন কোনো কাজ করেন না। করতে পারেন না। তবে প্রায় সারা জীবন উনি একটা স্কুলে পড়িয়েছেন। এখন চোখে ভালো দেখতে পান না বলে রিটায়ার করেছেন।

—তোমার মা সম্পর্কে আরও কিছু বলো, ডীপ। তোমার বাবা বেঁচে নেই নিশ্চয়ই।

—না, আমার যখন পাঁচ বছর বয়েস, তখন বাবা মারা যান। আমার মায়ের বয়েসও তখন মাত্র ছাব্বিশ।

উনি কি আবার বিয়ে করেছিলেন?

—না, লিন্ডা, আমাদের দেশের বিধবারা চট করে বিয়ে করেন না। কোনো বাধা নেই। তবু অনেকেই...আমার মা অবশ্য বিয়ে করতে পারতেন, আমার গ্র্যান্ড ফাদার খুব লিবারাল ছিলেন, মায়ের অত কম বয়েস, দেখতেও সুন্দরী ছিলেন বেশ। কিন্তু মা আমার জন্য সব কিছু স্যাক্রিফাইস করলেন। মা রঙিন পোশাক পরতেন না, সিনেমা-থিয়েটার দেখতে যেতেন না। শুধু আমাকে মানুষ করে তোলাই ছিল তাঁর একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। মা দুপুরে স্কুলে পড়াতেন, আর সকাল-সন্ধে আমাকে নিয়ে পড়াতে বসতেন। মায়ের জন্যই আমি বরাবর ভাল রেজাল্ট করেছি। ইঞ্জিনিয়ার হয়েছি।

—আরও বলো। আরও বলো তোমার মায়ের কথা।

—আমি যখন আমেরিকায় পড়তে আসি, তখন প্লেন ভাড়ার টাকা জোগাড় করাই এক সমস্যা হয়েছিল। আমি বন্ধুদের কাছ থেকে ধার করবো ভেবেছিলাম, তার আগেই মা তাঁর গয়না সব বিক্রি করে দিলেন। গয়না বেশি ছিল না, কিন্তু শেষ টুকরোটা পর্যন্ত বিক্রি করে...আমার জন্য মা সব কিছু করতে

পারতেন। পরে আমি জানতে পেরেছি, এক সময় যখন আমাদের খুবই টাকার টানাটানি ছিল, তখন মা নিজে না খেয়ে আমাকে সব কিছু ঠিকঠাক দিতেন, অভাব-অনটনের কথা আমাকে টেরই পেতে দিতেন না।

—তোমার মাকে এখন এদেশে নিয়ে এসো তাহলে। এখানে ভাল থাকবেন। তুমি চাকরি ছাড়বে কেন, ডীপ। তোমার মাকে এনে তোমার কাছে রাখো।

—এখন আর সেটা সম্ভব নয়। অনেক দেরি হয়ে গেছে। মা চোখে দেখতে পান না ভালো, এখন আর অতদূর ট্র্যাভেল করতে পারবেন না। আমাকেই যেতে হবে।

লিন্ডা চুপ করে দীপের দিকে চেয়ে রইলো। তার মুখখানি করুণ। দীপ সম্পর্কে লিন্ডার এতখানি আগ্রহ দেখাবার কারণটা যেন দীপ খানিকটা আন্দাজ করতে পারছে। এ অফিসে আর একজনও অশ্বেতাঙ্গ নেই। কেউ দীপকে কখনো অপমান করেছে কি না, কিংবা দীপের ওপর কোনো অবিচার হয়েছে কি না, সেসবই বোধহয় লিন্ডা জানতে চায়।

দীপের অবশ্য সে রকম অভিজ্ঞতা অন্য দু' এক জায়গায় হলেও এই অফিসে হয়নি। অফিস সম্পর্কে তার কোনো ক্ষোভ নেই। টাকাকড়ি ভালোই তো দেয়।

লিন্ডা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, তাহলে আর তোমাকে বাধা দিতে চাই না দীপ। তুমি যখন মন স্থির করে ফেলেছো, হয়তো ঠিকই করেছো! অফিস থেকে রিলিজ পেতে তোমার যাতে অসুবিধে না হয়, সেটা আমি দেখবো!

ছুটির পর জুডিকে তার অফিস থেকে তুলে নিল দীপ। পার্ক অ্যাভেনিউ-এর এক দামি রেস্তোরাঁয় খেতে গেল। প্রথমে কিছুই জানালো না। জুডি আজ একটা গাঢ় লাল রঙের স্কার্ট পরে এসেছে। তার ব্লন্ড চুলের সঙ্গে দারুণ মানিয়েছে পোশাকটা।

কানেটিকাটে জুডির দিদির বাড়ির গল্প শুনতে শুনতে একসময় ফস করে দীপ বললো, আমি দেশে ফিরে যাচ্ছি, জুডি। চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি!

অফিসের সহকর্মীদের যা যা বলেছিল, সবটাই শুনিয়ে দিল ও জুডিকে।

জুডি ঈষৎ ম্লান গলায় বললো, কদিন ধরে কেন যেন মনে হচ্ছিল, আমাদের দু'জনের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। তবু আমি নিজেকে প্রস্তুত করতে পারিনি, দীপ। অন্য কোনো মেয়েকে তোমার ভালো লেগেছে?

—আরে না, না, আমি এ দেশ ছেড়েই চলে যাচ্ছি। চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি।

—কেন ছেড়ে দিচ্ছ?

—বললাম যে, আমার মায়ের জন্য। মায়ের কাছে গিয়ে থাকবো!

—তোমার মায়ের কথা আগে আমাকে কখনো বলোনি তো। একবারও উল্লেখ করোনি!

—বান্ধবীর কাছে মায়ের গল্প করে নির্বোধরা, তাছাড়া এমন ভাবে মায়ের কথা মনেও পড়েনি আগে।

—তোমার মায়ের সঙ্গে তো আমার প্রতিযোগিতা চলে না। একমাত্র এই কারণটার জন্যই আমি তোমাকে বাধা দিতে পারি না। অন্য কোনো কারণ হলে বলতাম, তুমি চলে যেও না। থাকো।

—আমি মনস্থির করে ফেলেছি, জুডি। আমার মন আর এখানে টিঁকছে না। আর বেশিদিন থাকলে আমার মাথার গোলমাল হয়ে যাবে। আমাকে যেতেই হবে।

—আজ রাত্তিরটা আমি তোমার সঙ্গে থাকতে পারি? তোমার বাক্স গুছিয়ে দেবো?

দু'দিনের মধ্যেই ম্যানহাট্‌ন, ব্রুকলিন, নিউ জার্সির সমস্ত পরিচিতরা জেনে গেল যে দীপ হঠাৎ এদেশের পাট চুকিয়ে দিয়ে ফিরে যাচ্ছে দেশে। বুড়ি মায়ের কাছে গিয়ে থাকবে শুনে হাসাহাসি করতে লাগলো অনেকে। কেউ কেউ বললো, আহা দুধের বাছারে! মায়ের আঁচলের হাওয়া খাবে! কেউ কেউ বললো, ওসব আদিখ্যেতা ঘুচে যাবে দুদিনেই। একবার কলকাতার গরম, লোডশেডিং আর মিছিলের মধ্যে গিয়ে পড়ুক না! বাপের নাম পর্যন্ত ভুলিয়ে দেয়! কোনো চাকরি-বাকরি পাবে না, সবাই খারাপ ব্যবহার করবে, টাকাপয়সা ফুরিয়ে এলে ওর মা-ই আবার বলবেন, যারে খোকা, আমেরিকায় গিয়ে কিছু রোজগার করে নিয়ে আয়!

বাল্লু সিনহা অবাঙালি, বিহারের ছেলে, কিন্তু দীপের অন্যান্য বাঙালি বন্ধুদের চেয়েও বাল্লু তার সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ। দুজনে এক সঙ্গে অনেকদিন পড়েছে, দেশে ও এখানে।

আরও দু একদিন বাদে বাল্লু হঠাৎ হাজির হয়ে বললো, সবাই যেটা জানে, সেটা তুই আমাকে বলিসনি কেন রে, রাস্কেল?

দীপ মুচকি হেসে বললো, টিকিটটা কাটার আগে তোকে জানাতে চাইনি। তুই নির্ঘাৎ বাধা দিতিস। আজই বুকিং কনফার্মড হয়ে গেছে। আমি শনিবার যাচ্ছি!

—তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

—প্রায় খারাপ হয়ে যাচ্ছিল রে! এখন আবার ঠিক হয়ে গেছে। যেই

ফাইনাল ডিসিশানটা নেওয়া হয়ে গেল, তারপর থেকেই মাথাটা সুস্থির হলো।

—কেন ফিরে যেতে চাস, আমায় বুঝিয়ে বলবি ?

—আমার ভালো লাগছিল না রে, একদম ভালো লাগছিল না।

—তোর অফিসের লিন্ডা বলে মেয়েটার সঙ্গে দেখা হলো ট্রেনে। তার মুখে একটা অদ্ভুত কথা শুনলাম। তুই নাকি তোর মার জন্য ফিরে যাচ্ছিস ? মার কাছে গিয়ে থাকবি ? দীপ এবার কোনো উত্তর না দিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগলো।

বাল্লু চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে কাবার্ড খুলে একটা স্কচের বোতল খুঁজে বার করলো। দুটো গেলাসে খানিকটা করে ঢেলে এনে, নিজে প্রথমে একটা চুমুক দিয়ে বললো, তুই কবে থেকে এরকম গুলবাজ হয়েছিস রে, দীপু ? সবাইকে বলেছিস, তোর মায়ের জন্য ফিরে যাচ্ছিস ? তোর মা, দাঁড়া, তারিখটা মনে করি, ফোর্থ ডিসেম্বর, চার বছর আগে ঐ দিন টেলিগ্রাম এলো তোর মা মারা গেছেন। আমার মনে নেই ভেবেছিস ? চার বছর আগে তোর মা মারা গেছেন, তুই তাঁর কাছে ফিরে যাবি ?

দীপ চুপ করে রইলো।

বাল্লু বললো, বীরেনদা, সুরূপাবৌদি, রণজয়, স্বপন আরও অনেকেই জানে যে তোর মা বেঁচে নেই, তুই তাদের কী করে ধাপ্পা দিবি ?

দীপ তবু কোনো কথা বললো না। বাল্লু আর এক চুমুকে গেলাশ শেষ করে বললো, এটা কি ফর অফিস কনজাম্পশন ? কেন, অফিসকে এরকম একটা মিথ্যে কথা না বললে কি তোকে ছাড়তো না ? এমনিই ছেড়ে দিত বড় জোর তিন মাসের নোটিশ দিতে বলত ! ও বুঝেছি, এটা রটিয়েছিস জুডিকে বোঝাবার জন্য। মা মা বলে কেঁদে ফেলে তুই জুডির কাছ থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিস ! সে একটা ভাল মেয়ে। তার কাছে এরকম একটা বাজে মিথ্যে কথা বলাটা আমি মোটেই পছন্দ করছি না !

দীপ এবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, হঠাৎ মায়ের কথাটা মুখে এসে গিয়েছিল, তা ঠিকই। কিন্তু পুরোটাই কি মিথ্যে ? মা বেঁচে না থাকলেও কি মায়ের কাছে ফেরা যায় না ? বাল্লু ভুরু কুঁচকে বললো, তার মানে ? দীপ বললো, ভালো করে ভেবে দ্যাখ। দু'বার বলতে হবে কেন ?

আবার খানিকটা হুইস্কি ঢেলে বাল্লু বললো, অ্যাবস্ট্রাক্ট মাদার ! নিজের মা নয়, দেশমাতৃকা ! তুই দেশ জননীর কাছে ফিরে যেতে চাস ? হঠাৎ তোর এরকম পেট্রিয়টিক ফিলিং কী করে জেগে উঠলো রে ?

দীপ বললো, না, না, ওসব কিছু নয়। অমি সাধারণ মানুষ, দেশ-টেশ

নিয়ে কখনো মাথা ঘামাইনি। অত বড় দেশ তোর আমার মতন কয়েকজনকে বাদ দিয়েও দিব্যি চলবে। এখনো তো চলছে। আমি শুধু ভেবেছি আমার মায়ের কথা। আমার মা চাপা স্বভাবের ছিলেন, মুখে কিছু বলতেন না, চিঠিতেও পীড়াপিড়ি করেননি। কিন্তু মনে মনে খুব চাইতেন আমি ফিরে যাই। মা খুব কষ্ট করে আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, তারপর তাঁর ইচ্ছে ছিল, বিলেত-আমেরিকা থেকে একটা ডিগ্রি নিয়ে আমি তাঁর কাছাকাছি থাকবো। দেশে চাকরি তো একটা পেতামই!

—ইডিয়েট, তাহলে তোর মা যখন বেঁচে ছিল, তখন ফিরলি না কেন? তখন তোর এই বোধটা হয়নি! তাহলে তো কিছুদিন অন্তত খুশি করতে পারতিস।

—তখন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম।

—ঘোর মানে? চার বছর আগে জুডির সঙ্গে তো তোর আলাপ হয়নি!

—সে ঘোরের কথা বলছি না। ধর, তুই আর আমি একসঙ্গে এম এস পড়তে এলাম। প্রথম বছরটা আমাদের কী সাঙ্ঘাতিক কষ্ট করতে হয়েছিল মনে আছে? গুনে গুনে পয়সা খরচ করতাম। ভালো করে কিছু খেতাম না পর্যন্ত। তারপর তো এম এসটা হলো। তখন তুই-ই বললি, আয় পি-এইচ-ডি-টাও করা যাক। আরও তিন বছর। তারপর কি করলাম, এতদিন পড়াশুনার কষ্ট করেছি, এবার চাকরি করে সবটা উশুল করা যাক। ঝট করে পেয়ে গেলাম চাকরি। একটা ছেড়ে আর একটা। বেশি টাকা। নতুন গাড়ি। বাড়ি কেনা। বান্ধবী। এইগুলোই তো ঘোর।

—কেন, আমরা দেশে টাকা পাঠাইনি? প্রত্যেক মাসে দুশো ডলার, নট আ ম্যাটার অফ জোক।

—হ্যাঁ, আমি মনে করলাম, টাকা পাঠালেই সব দায়িত্ব চুকে যায়। এটাও একটা ঘোর।

—দ্যাখ, দীপু, দেশে ফিরে যাওয়া মানে কি বেকারের সংখ্যা বাড়ানো নয়? তুই বা আমি চাকরি পেয়ে যেতে পারি, কিন্তু তার ফলে আর দুটো ছেলে তো বেকার হবে। চাকরির সংখ্যা তো বাড়বে না? আমি তো মনে করি, দেশে ফিরে গাদাগাদি না করে, এখানে থেকে যে আমরা ফরেন এক্সচেঞ্জ পাঠাচ্ছি, তাতেই দেশের যথেষ্ট উপকার করা হচ্ছে।

—তোর কথা খানিকটা আলাদা রে বাল্লু। তোর আরও ভাই-বোন আছে। মা-বাবা দুজনেই বেঁচে। তুই এখানে বিয়ে করেছিস, তোর একটা বাচ্চা ইস্কুলে যায়। তোর পক্ষে এক্ষুনি ফেরা মুশকিল। না ফিরলেও ক্ষতি নেই। কিংবা

তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। কিন্তু আমার এখনো এখানে শেকড় গাড়েনি!

—শেকড় আমারও গাড়েনি। আমিই বরং ইচ্ছে করলে যে-কোনোদিন ফিরে যেতে পারি। কিন্তু তোর যুক্তিটা আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না। তোর বাবা-মা কেউ নেই। খুব কাছের আত্মীয় কেউ নেই। তুই ফিরতে যাবি কোন্ দুঃখে? তুই-ই বরং এখানে মজাসে থাকতে পারিস।

—আমার ভালো লাগছে না। ভালো লাগছে না। কিচ্ছু ভালো লাগছে না।

—সাময়িক ডিপ্রেশন। তুই বরং এক কাজ কর। ছুটি নিয়ে কিছুদিন দেশ থেকে ঘুরে আয়। যাসনি তো অনেক দিন। দেশের অবস্থা দেখলেই তোর এই ঘোরটাও কেটে যাবে। ওখানে কোনো মানুষ থাকতে পারে? যারা বাধ্য হয়ে পড়ে আছে, তাদের কথা আলাদা। ব্লাডি পলিটিশিয়ানরা দেশটার সর্বনাশ করে দিচ্ছে। পরিমলের কথা মনে আছে? দেশে ফিরে গিয়ে নিজের টাকায় একটা কারখানা খুললো। বেশ ভালই চলছিল, তারপর হঠাৎ কিছু বদমাশ এসে স্ট্রাইক করে কারখানাটা তুলে দিল। গভর্নমেন্ট কোনো সাহায্যই করলো না। পরিমল আবার ফিরে এসেছে, এখন দেশের নাম শুনলে চটে যায়।

—আমার মায়ের হঠাৎ স্ট্রোক হলো, আমি যখন খবর পেলাম, তখন সব শেষ! গিয়ে শেষ দেখাটাও হলো না।

—ডোনট বি সেন্টিমেন্টাল দীপু! যা হবার তা তো হয়েই গেছে। চার বছর আগে। এখন আর তা নিয়ে আফসোস করে কী হবে?

—মা নেই, কিন্তু মায়ের ইচ্ছেটা তো রয়ে গেছে! মা চেয়েছিলেন...। আরও তো অন্য মা আছে। আরও কোনো বুড়ি, চোখে ছানি পড়ে গেছে, ভালো দেখতে পায় না, তার ছেলে চলে গেছে কোথায়। সেরকম একটা বুড়ির পাশে বসবো, তার গায়ে হাত বুলিয়ে বলবো, মা, দ্যাখো, আমি ফিরে এসেছি!

দিস ইজ আটারলি রিডিকুলাস। তোর কি সত্যি মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি রে, দীপু?

—বোধহয় তাই!

এরকম তর্ক-বিতর্ক চললো অনেক রাত পর্যন্ত। কিন্তু দীপ গোঁয়ারের মতন জেদ ধরে আছে, সে কিছুতেই মত পাল্টাবে না। সে যাবেই। সব ছেড়ে ছুড়ে চলে যাবে!

বাল্লু খুব রাগ করে চলে গেল।

শনিবার দিন দীপের ফ্লাইট সন্ধেবেলা। সকাল নটার সময় লিন্ডা টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করলো, দীপ, তোমার কাছে একবার আসতে পারি?

তুমি নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত। আমি বেশিক্ষণ সময় নেবো না।

দীপ বললো, অফ কোর্স, অফ কোর্স। ইউ আর ওয়েলকাম। আমি মোটেই ব্যস্ত নই!

টেলিফোন রেখে দীপ গালে হাত দিয়ে বসে রইলো।

লিন্ডা হঠাৎ আসতে চাইছে কেন? লিন্ডার সঙ্গে তার কোনো রকম ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা হয়নি কখনো। লিন্ডা সব সময়েই তার সঙ্গে ভদ্র ও ভালো ব্যবহার করেছে, কিন্তু সবটাই ফর্মাল! অফিসের বাইরে কক্ষনো যোগাযোগ হয়নি তাদের। অফিসের সঙ্গে তো সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছে দীপ। লিন্ডা অবশ্য সাহায্য করেছে সে ব্যাপারে।

আধ ঘণ্টা পরে এসে উপস্থিত হলো লিন্ডা। দীপ তাকে দরজা খুলে ভেতরে এনে বসালো। শয়নকক্ষ ও বসবার ঘরের চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে লিন্ডা জিজ্ঞেস করলো, তোমার এখানে আর কেউ নেই?

দীপ বললো, না। এখন কেউ নেই। বন্ধুরা আসবে দুপুরে।

এতে যেন বেশ স্বস্তিবোধ করলো লিন্ডা। দীপ তার ওভারকোটটা খুলে দিল। একটা হালকা নীল পোশাক পরে এসেছে লিন্ডা। হাতে সাদা রঙের গ্লাভস। তার মুখে লজ্জা লজ্জা ভাব।

গ্লাভস দুটো খুলতে খুলতে লিন্ডা বললো, তুমি নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়েছো? তোমাকে একটা কথা জানাতে এলাম। সেটা শুনলে তুমি আরও চমকে যাবে। কিংবা অবিশ্বাস করবে? তবু বলি!

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!

—কী করে শুরু করবো, ঠিক বুঝতে পারছি না। প্রথম থেকেই বলি, সেদিন তোমার কথা শুনে আমি বাড়িতে গিয়ে খুব কেঁদেছিলাম!

—সে কি! কোন্ কথা শুনে লিন্ডা? আমি কি কোনো কারণে তোমাকে আঘাত দিয়েছি?

—হ্যাঁ, আঘাত দিয়েছো তো বটেই। আমার মনের খুব ভেতরের একটা জায়গায় খুব জোরে আঘাত দিয়েছো! অবশ্য, তুমি না জেনেই।

—আমি এখনো বুঝতে পারছি না লিন্ডা।

—সেদিন তুমি তোমার মায়ের কথা বললে! আমি জানি, ইন্ডিয়া গরিব দেশ! এখানে তুমি ভাল চাকরি করতে, দেশে গিয়ে এরকম আরামে থাকতে পারবে না। তোমার অনেক কষ্ট হবে। তবু তুমি সব ছেড়ে চলে যাচ্ছো তোমার মায়ের জন্য। তোমার মায়ের কাছে থাকবে বলে। এটা আমাকে চেতনাকে

কাঁপিয়ে দিয়েছে!

—কেন? কেন?

—মা আর সন্তানের এই রকম সম্পর্কের কথা আমি জানতাম না। কখনো দেখিনি, শুনিও নি। আমার মা নেই, কোনোদিন ছিলও না!

—তার মানে? কোনোদিন ছিল না মানে?

—বড় বেশি ব্যক্তিগত কথা হয়ে যাচ্ছে, তুমি কিছু মনে করবে না তো?

—মোটেই না। তুমি বলো।

—আমার জন্মের ছ'মাস পরেই আমার মা আমাকে ছেড়ে চলে যায়। আমি আনওয়ান্টেড চাইল্ড। মা অ্যাবরশন করতে চেয়েও শেষ পর্যন্ত করেনি। আমি আমার সেই জননীর স্বামীরও সন্তান নই, অন্য একজনের। তাই নিয়ে দু'জনের ঝগড়া হয়। তারপর সেপারেশন, ডিভোর্স। মা আমাকে ফেলে পালায়। আর কোনোদিন আমার খোঁজ করেনি!

—আই অ্যাম সরি টু হিয়ার দ্যাট। ভেরি সরি, লিন্ডা!

—আমাকে যে জন্ম দিয়েছিল, সেই স্ত্রীলোকটি আমাকে এই পৃথিবীতে আনতে চায়নি। আমার সম্পর্কে তার কোনো টান ছিল না। আমি তার ছবি দেখিনি। তার মুখ কেমন দেখতে তাও জানি না। যার ঔরসে আমার জন্ম, তার পরিচয়টাও জানাজানি হয়নি। সুতরাং আমার বাবাকেও আমি চিনি না। আইনত যিনি আমার পিতা, তিনি অবশ্য দয়ালু মানুষ ছিলেন, আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, আমার জন্য ওয়েট নার্স রেখেছিলেন, একটু বড় হলে আমাকে হস্টেলে পাঠিয়ে দেন। কিছুদিন পর্যন্ত আমার পড়ারও খরচ দিয়েছেন। আমি ভাগ্যিস লেখাপড়ায় ভাল ছিলাম, তাই এ পর্যন্ত পৌঁছোতে পেরেছি। নইলে সমাজের অনেক নিচু স্তরে আমার স্থান হতো। গোটা মাতৃজাতির ওপর আমার ঘৃণা আছে। নিজে বিয়ে করার কথা ভাবি না সেইজন্য!

—তোমার কথায়, ব্যবহারে কোনোদিন সেই তিক্ততা ফুটে ওঠেনি!

—পৃথিবীতে আমি একা। সবার সঙ্গে মানিয়ে চলার চেষ্টা করি। কিন্তু একজন মা আমাকে জন্ম দিয়ে ফেলে চলে গেছে, কোনোদিন আমায় আর দেখা দিল না। এটাও ভুলতে পারি না কিছুতে! সেদিন তুমি বললে, তুমি তোমার মায়ের কাছে ফিরে যেতে চাও। তোমার মা তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছেন। এটা যেন একটা অন্য জগতের কথা। এমন স্নেহের টান, পরস্পরের জন্য ব্যাকুলতা, আমার মনটা হু হু করতে লাগলো, ডীপ। আমি এসব কখনো পাইনি। তবু যে আমার ভেতরে একটা হাহাকার ছিল...

লিন্ডা হঠাৎ চুপ করে গেল।

দীপও মাথা নিচু করে রইলো।

খানিকটা বাদে রুমাল দিয়ে নাক মুছে লিন্ডা বললো, আমি আর তোমার বেশি সময় নেবো না। তোমাকে একটা অনুরোধ জানাবো ?

দীপ মাথা তুলে বললো, বলো !

লিন্ডা বললো, আমি তোমার মাকে একটা কিছু দিতে চাই। কী দেবো, ভেবেই পাচ্ছিলাম না। ফুল দেওয়া যেত, কিন্তু তুমি ইন্ডিয়ায় পৌঁছোতে পৌঁছোতে ফুল শুকিয়ে যাবে। কিছু খাবারও পাঠাবার কোনো মানে হয় না। তোমার মা এদেশি পোশাক নিশ্চয়ই পরেন না। তাই ভাবলাম...

লিন্ডা তার হাত-ব্যাগ থেকে একটা সুন্দর বাক্স বার করলো। সেটা খুলতেই দেখা গেল, তার মধ্যে একটা মুক্তোর মালা।

দীপ আঁতকে উঠে বললো, এ কী, এত দামি জিনিস ? না, না।

লিন্ডা কুণ্ঠিত ভাবে বললো, সেদিন তুমি বলেছিলে, আমেরিকায় আসার সময় তোমার টিকিট কাটার পয়সা ছিল না। তোমার মা নিজের সব গয়না বিক্রি করে দিয়েছিলেন। আমার মা নেই, আমি কি আমার দেশের পক্ষ থেকে তোমার মাকে এই গয়নাটা দিতে পারি না ? তুমি প্রত্যাখ্যান কোরো না প্লিজ ! যদি নাও, আমার খুব ভালো লাগবে, আমার প্রাণ জুড়োবে ! তাঁকে বোলো, আমেরিকার এক অনাথিনী মেয়ে এক আদর্শ মাতৃত্বকে এই সামান্য উপহারটুকু দিয়েছে !

দীপ তখনো চুপ করে আছে দেখে লিন্ডা আবার বললো, আমার শিগগির ইন্ডিয়ায় যাবার কথা আছে। তখন তোমার বাড়িতে যাবো। তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করবো। তোমার মায়ের হাতের রান্না খেতে চাইলে তিনি খাওয়াবেন ? দীপ মনে মনে বার বার বলে যাচ্ছে, না, আমি মিথ্যে বলিনি, মিথ্যে বলিনি। মিথ্যে বলিনি। লিন্ডাকে ঠকাইনি। আমার মা সত্যিই আমার জন্য এক সময়...হয়তো একটু দেরি হয়ে গেছে আমার, কিন্তু মায়ের ইচ্ছেটা মিথ্যে হয়ে যায়নি।

একটু পরে মুখ তুলে, লিন্ডার দিকে স্পষ্ট চোখে তাকিয়ে দীপ বললো, হ্যাঁ, এসো তুমি ইন্ডিয়াতে। মাকে দেখবে। ভারতীয় মা। গ্রামে, মাটির ঘরে বসে আছেন। চোখে ভালো দেখতে পান না। বসে আছেন তাঁর সন্তানের প্রতীক্ষায়। তুমি এই মালাটা এখন রেখে দাও, যখন যাবে, নিজের হাতে তাঁকে দিও !

হাত

তারপর ঠিক হলো, বাইরে কোথাও খেতে যাওয়া হবে। তারপর মানে কিসের পর? সুদীর্ঘ আড্ডা চলছিল সন্ধে সাড়ে সাতটা থেকে। হোটেলের লাউঞ্জে। আটটার সময় ডিনার খেতে যাওয়ার কথা। বাঙালিদের এত তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া সেরে নেওয়ার অভ্যেস নেই, রাতের খাবার দশটার আগে খেতে ইচ্ছে করে না। তা ছাড়া, সদ্য আড্ডা জমেছে, কেউ উঠতে চায়নি।

বাঙ্গালোর শহরে একটা সেমিনারে যোগ দিতে এসেছে অনেক প্রতিনিধি। সব মিলিয়ে চুয়ান্নজন। এর মধ্যে বাঙালিদের দলটা মাঝে মাঝে আলাদা হয়ে যায়। সেমিনারে সর্বক্ষণ ইংরিজিতে কথাবার্তা, মাঝে মাঝে বাংলায় আড্ডা না দিতে পারলে সুখ হয় না। তাই ন'জন বাঙালি হোটেলের লবিতে জমায়েত হয়েছিল। একটু পরেই এলো আরও দু'জন, এরা অবশ্য ঐ সেমিনারের প্রতিনিধি নয়, স্থানীয়। এশিয়ান টাইমসের সম্পাদক বসন্ত বিশ্বাস ফোন করেছিল তার বন্ধু বিনোদ দাশগুপ্তকে। সে বাঙ্গালোরের একজন সফল ব্যবসায়ী, তার ঘড়ির কারখানা দিন দিন বাড়ছে। বিনোদ দাশগুপ্ত সঙ্গে করে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন যুবককে নিয়ে এসেছে, এই আড্ডায় সেই যেন একমাত্র বেমানান।

বিনোদ দাশগুপ্ত এসেই হৈ হৈ করে আড্ডা জমিয়ে দিল। বছর পঞ্চাশেক বয়েস, মাথায় অল্প টাক পড়েছে, কিন্তু মুখে ছড়িয়ে আছে স্বাস্থ্য ও উৎসাহের জ্যোতি। গরিব অবস্থা থেকে ধনী হয়েছে। মানুষটি বেশ দিলদরিয়া। অন্যদের সঙ্গে আলাপ করতে করতে সে বলে উঠলো, বসন্ত আমার ছেলেবেলার বন্ধু, আপনারা বসন্তর পরিচিত। সুতরাং আপনারাও সবাই আমার বন্ধু।

পকেট থেকে বিলিতি সিগারেটের পক্যেট বার করে সে প্রত্যেকের দিকে এগিয়ে দিল। বেয়ারাকে ডেকে বললো, হুইস্কি, বিয়ার, রাম কে কী খাচ্ছেন, সবাইকে এক রাউন্ড দাও!

এরা সবাই সংবাদপত্রের লোক, মধ্যবয়েসী। সংবাদপত্রের লোকদের কথাবার্তায় একটা সবজান্তা ভাব থাকে, তাই আড্ডায় রাজনীতি, সমাজনীতি, মাদার টেরিজা, অমিতাভ বচ্চন, সত্যজিৎ রায়, ড্রাগ, যৌনতা কিছুই বাদ যায় না।

কর্মকর্তাদের দু'জন প্রতিনিধি ডিনারের জন্য কয়েকবার তাড়া দিয়ে গেছে। এরা কেউ আড্ডা ছেড়ে ওঠার নাম করেনি।

অশোক নামে ছেলেটি মুখচোরা ধরনের। সে প্রায় চুপচাপই বসে আছে, হুইস্কিতে চুমুক দিচ্ছে মাঝে মাঝে। অন্যদের তুলনায় তার বয়েস কম, বয়স বছর পঁয়তিরিশেক হবে। বিনোদ তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, সে একজন কবি, নিছক শখের কবি নয়, তার তিনখানা কাব্যগ্রন্থ বেরিয়ে গেছে এরই মধ্যে, কলকাতায় বেশ নামডাক আছে। জীবিকার সূত্রে সে আছে বাঙ্গালোরে, সরকারি চাকরি করে। সদ্য তাকে কলকাতা থেকে ট্রান্সফার করা হয়েছে বলে সে একটু মন-মরা হয়ে আছে।

এই দলে দু'জন মহিলাও আছেন, অরুণা সেনগুপ্ত আর তিস্তা কাউর। তিস্তাও বাঙালি। তার স্বামী পাঞ্জাবি। তিস্তার বয়েসও পঞ্চাশের কাছাকাছি, কথাবার্তায় বেশ তুখোড়, সিগারেট টানায় পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। সে একবার অশোককে বললো, আমিও একজন কবিকে চিনতাম, নাম বলবো না, আমার বিশেষ বন্ধু ছিল, আর একটু হলে তাকে বিয়ে করে ফেলতাম। ভাগ্যিস করিনি, কবিরা স্বামী হিসেবে ঠিক উপযুক্ত হতে পারে না, তাদের সঙ্গে শুধু বন্ধুত্ব রাখাই ভালো।

কেউ কেউ হেসে উঠলো। একজন বললো, এই কবির স্ত্রী কি সে কথা মনে করেন? কবির কাছ থেকেই সে কথা শোনা যাক।

অশোক কিছু না বলে শুধু একটু হাসলো।

বিনোদ বললো, কোনো মেয়ের এখনো সেরকম দুর্ভাগ্য হয়নি। অশোক বিয়েই করেনি। ও বেচারা মেয়েদের সঙ্গে তো মিশতেই পারে না। কোনো মেয়ে যেচে এসে ওকে বিয়ে করতে না চাইলে ওর কোনোদিন বিয়েই হবে না।

বসন্ত বিশ্বাস ভরাট গলায় বাণী দেবার ভঙ্গিতে বললো, কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে কিংবা সম্বন্ধ করে বিয়ে করাটাও কোনো কবিকে মানায় না। তবে নিরাশ হবারও কিছু নেই। পৃথিবীতে সব পুরুষের জন্যই কোনো না কোনো নারী থাকে।

তিস্তা বাধা দিয়ে বললো, পুরুষের জন্য কেন নারী থাকবে ? নারীর জন্য কোনো পুরুষ অপেক্ষা করে থাকতে পারে না ?

আড্ডা অন্যদিকে ঘুরে গেল।

একটু পরে সেখানে এসে উপস্থিত হলো আর একটি মহিলা। হাতে দু'-তিনটে শপিং ব্যাগ, অনেক দোকানপাট ঘুরে এসেছে বোঝা যায়। সে বললো, এ কী, তোমরা এখনো ডিনার খেতে যাওনি ? আমি তো ভাবলাম, এতক্ষণে বুঝি শেষ হয়ে গেছে।

বসন্ত বিশ্বাসের স্ত্রী সোহিনী। প্রতিনিধিদের মধ্যে একমাত্র বসন্তরই স্ত্রী সঙ্গে এসেছে।

বিনোদ তাকে আগে থেকেই চেনে। সে বললো, সোহিনী, বসো, বসো। ডিনার না খেলেই বা কী আসে যায়, এখানে স্ন্যাক্স আনাচ্ছি। এই হোটেলের ফিস-মেয়োনেজ বিখ্যাত।

আর একটা চেয়ার টেনে আনা হলো। সোহিনী বসলো ঠিক অশোকেরই পাশে।

সোহিনীকে দেখেই অশোকের বুকটা ধক ধক করে উঠেছিল। মেয়েরা অনেক রকম হয়, কারুর কারুর যথেষ্ট রূপ থাকলেও ঠিক সুন্দর বলা যায় না, কারুর গায়ের রং বা চোখ-মুখের গড়ন ঠিক রূপসীদের মতন নয়, কিন্তু কিছু একটা লাবণ্যের জন্য আকর্ষণীয়া। কারুর বা শুধু কথা বলার ভঙ্গিটাই মুগ্ধ করে। আর এক একজন থাকে, যাকে ঠিক মানবী মনে হয় না, তার অতিরিক্ত কিছু।

অশোকের মনে হলো, এই রমণীর সমস্ত শরীর যেন চাঁদের আলো দিয়ে গড়া। হঠাৎ কোথা থেকে এলো, আবার হঠাৎই অদৃশ্য হয়ে যাবে।

সোহিনীর সঙ্গে পরিচয় করাবার পর সে বললো, আপনি কবি ? বাঃ!

শুধু এইটুকু। তারপর সে অন্যদের সঙ্গে কথাবার্তায় যোগ দিল।

সোহিনীর ভাবভঙ্গি অবশ্য মোটেই অপার্থিবার মতন নয়, খুবই সহজ-স্বাভাবিক মানবীর মতন। একটু পরেই সে বললো, তোমরা খেতে যাবে না ? আমার কিন্তু খিদে পেয়েছে।

প্লেট থেকে সে তুলে নিল একটা মাছভাজা। বিনোদের অনুরোধে সে ওয়াইন পান করতে রাজি হলো।

বসন্ত বিশ্বাসের তুলনায় সোহিনীব বয়েস বেশ কম মনে হয়। অথবা কম দেখায়। মনে হয়, ত্রিশ-বত্রিশের বেশি নয়। মাথার সব চুল খোলা। চোখ দুটি যেন কাজলটানা। একটা মেরুন রঙের শাড়ি পরে আছে। কানে দুটি হীরের

দুল, এক হাতে একটি হীরের আংটি ছাড়া অন্য কোনো অলঙ্কার পরেনি। তার হাসি ঝর্নাধারার মতন।

পাশাপাশি বসলে ভালো করে দেখা যায় না। যারা মুখোমুখি বসেছে, তারাই সোহিনীকে ঠিক দেখতে পাচ্ছে। পাশ ফিরে তাকাতে লজ্জা পাচ্ছে অশোক। সে শুধু টেবিলের ওপর রাখা সোহিনীর একটা হাতের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এমন মায়াময় হাত সে জীবনে দেখেনি। প্রত্যেকটি আঙুল নিখুঁত, নোখগুলিতে নেলপালিশ লাগানো হয়নি, তবু লালচে আভা ফুটে বেরুচ্ছে, মধ্যমায় একটি আংটি, তারপর আর চুড়ি-বালা কিচ্ছু নেই। ঠিক যেন মাখন দিয়ে গড়া একটি হাত।

অন্য মহিলা দুটি যে সোহিনীকে তেমন পছন্দ করে না, তা তাদের অতি মিষ্টি কৃত্রিম ব্যবহার দেখেই বোঝা যায়। তিস্তা বললো, তুমি যে এত দোকানপাট ঘুরে এলে তা তোমাকে দেখে বোঝাই যায় না। ঠিক যেন ঘুম থেকে উঠে এসেছো।

সোহিনী হেসে বললো, আমি জীবনে কখনো দিনের বেলা ঘুমোই না।

বসন্ত বললো, ওর রাত্তিরেও ঘুম খুব কম। দুটো-তিনটে পর্যন্ত জেগে থাকে।

অশোকের মনে হলো, নিশ্চয়ই সোহিনী গভীর রাতে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখে।

আরও এক রাউন্ড পানীয় এলো। ডিনারের সময় কখন পার হয়ে গেছে।

অশোককে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করছে না, সে নিজে থেকে কোনো কথাও বলছে না। সে মাঝে মাঝেই চোরা চোখে দেখছে টেবিলের ওপর রাখা সোহিনীর হাতখানি। এক এক সময় তার অসম্ভব ইচ্ছে করছে, ঐ হাতখানি একবার ছুঁয়ে দিতে।

সার্থক পুরুষরাই শুধু সোহিনীর মতন নারীদের পায়। অশোক তো অতি সাধারণ, সোহিনী তাকে কথা বলার যোগ্যই মনে করবে না! 'আপনি কবি? বাঃ!' বললো কেন? ঠাট্টা? নাকি নিছক কথার কথা?

অন্যমনস্কভাবে হঠাৎ একবার হাতটা ছুঁয়ে দিলে কী হয়? শুধু ছুঁয়ে দেওয়া নয়, ঐহাতখানি একবার মুঠোয় ধরে গন্ধ নিতে ইচ্ছে করে। নিশ্চয়ই ঐ হাত চাঁপাফুলের গন্ধমাখা। 'চম্পক অঙ্গুলি' অনেক কবিতায় থাকে, ঠিক এইরকমই তো।

সোহিনী পাশে বসে আছে, তার অঙ্গের সুবাস এমনিতেই পাচ্ছে অশোক। হয়তো অনেক দামি কোনো ফরাসি পারফিউম মেখেছে। একই পারফিউম

বিভিন্ন নারী ব্যবহার করে, তবু সকলের গা থেকে কি একই গন্ধ পাওয়া যায় ? শরীরের নিজস্ব একটা ঘ্রাণ নেই ? প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ?

সোহিনীর দু'-একটা কথা শুনে বোঝা গেল, সে শুধুমাত্র একজন সার্থক পুরুষের সাজগোজ করা সুন্দরী স্ত্রী নয়, তার নিজেরও যথেষ্ট যোগ্যতা আছে। সে একটা স্কলারশিপ নিয়ে বিলেতে পড়তে গিয়েছিল, এখানেও দিল্লিতে একটা নামকরা সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানে কাজ করে।

তাহলে অনেক লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয় তাকে। কেউ কি তার হাত ধরে না ? ওর হাত থেকে কোনো চিঠি বা জলের গেলাস নেবার সময় নিশ্চয়ই কখনো কারুর আঙুলের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যায়। অশোক একবার ছুঁয়ে দিলে কি দোষ হবে ?

টেবিলের ওপর থেকে সোহিনী তুলে নিল তার বাঁ হাতটা। আঁচল ঠিক করলো, আর টেবিলের ওপর রাখলো না। ও কি অশোকের তীব্র ইচ্ছেটা টের পেয়ে গেছে নাকি ?

সঙ্কোচে সরু হয়ে গেল অশোক। দু'জনের চেয়ারের মাঝখানে মাত্র এক বিঘৎ ফাঁক। তবু সোহিনীর শরীরের সঙ্গে তার একবারও ছোঁওয়া লাগেনি। অথচ ওপাশে বসেছে বিনোদ, সে মাঝে মাঝে সোহিনীর বাহুতে চাপড় দিয়ে কথা বলছে। তার বন্ধুর স্ত্রী, সে তো এরকম করতেই পারে।

অশোক যদি একবার সোহিনীর হাতখানি স্পর্শ করতে পারতো, তার জীবন ধন্য হয়ে যেত।

আড্ডা যখন ভাঙার মুখে, তখন তিস্তা বললো, যাঃ, আমাদের ডিনার খাওয়াই হলো না। খালি পেটে আমার ঘুম আসে না।

বিনোদ বললো, বারোটা বেজে গেছে, এখন তো হোটেলে কিছু পাওয়া যাবে না।

অন্য একজন বললো, বাঙ্গালোরে রাস্তার ধারে ধারে কিছু দোকান অনেক রাত পর্যন্ত খোলা থাকে। চানা-বাটোরা, চিকেন রোল এসব পাওয়া যায়।

সে বিশেষ করে সোহিনীর দিকে তাকিয়ে বললো, ওসব খাবার নিশ্চয়ই আপনারা খান না। আমার কিন্তু বেশ লাগে।

সোহিনী বললো, খাই না মানে ? ফুচকা, ঝাল ঘুগনি খেতে আমার দারুণ লাগে। চলুন না যাই !

অরুণা সেনগুপ্ত শরীর মুচড়ে বললো, এত রাতে, তাও রাস্তার দোকানের খোলা খাবার !

সোহিনী অনুনয় করে বললো, চলুন, চলুন প্লিজ, এমন কিছু রাত হয়নি।

সোহিনীর ব্যবহার অন্য যে-কোন মেয়েরই মতন, অলৌকিক কিছু নেই। শুধু অশোকেরই মনে হচ্ছে, এ নারী মায়া দিয়ে গড়া, এর সামান্য স্পর্শে কবিতার পংক্তি ঝলসে উঠতে পারে।

শুধু বিনোদের গাড়ি আছে। এত লোক এক গাড়িতে ধরবে না। এখন ট্যাক্সি যোগাড় করাও দুষ্কর।

বিনোদ বললো, মিনিট দশেক যদি হাঁটতে রাজি থাকো, একটা পাড়া আছে, সেখানে অনেক দোকানপাট খোলা থাকে।

সোহিনী উৎসাহের সঙ্গে বললো, হ্যাঁ, হাঁটবো, এখন হাঁটতেই ভালো লাগবে।

অন্যরা আর কেউ আপত্তি করার সুযোগই পেল না। সোহিনী আগেই নেমে পড়লো রাস্তায়।

বিনোদ আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। সারবদ্ধ হয়ে চলেছে দলটি। কারুর কারুর গল্প এখনো শেষ হয়নি। বসন্ত বিশ্বাস খোলাবাজার অর্থনীতি নিয়ে জোর বাণী দিয়ে চলেছে।

বড় রাস্তা ছেড়ে বিনোদ অপেক্ষাকৃত একটা ছোট রাস্তায় ঢুকলো। এ পথটা আধো অন্ধকার। সরু ফুটপাত, সেখান দিয়েই হাঁটতে হচ্ছে, কেন না গাড়ি চলাচলের বিরাম নেই।

অশোক হাঁটছে সকলের পেছনে। সোহিনী সামনে কোথায়, কার পাশে সে দেখতে পাচ্ছে না। এর মধ্যে আবার গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হলো। খুবই মিহিন বৃষ্টি, এই বৃষ্টিকে কেউ ভয় পায় না।

হঠাৎ একটা সুগন্ধ পেয়ে চমকে উঠলো অশোক। সোহিনী অনেক পিছিয়ে এসেছে। একেবারে অশোকের সামনেই। ওর কোমরের খাঁজ শিল্পীদের গড়া দেবীমূর্তির মতন। হাঁটার মধ্যেও যেন ছন্দ আছে। এরকম একজন নারীর এত কাছাকাছি হাঁটার সৌভাগ্য কখনো হয়নি অশোকের।

সোহিনী নিজে থেকেই বললো, আমি জোরে হাঁটতে পারি না।

এর উত্তরে কিছু বললো না অশোক। কী বলবে? কোনো কথাই তার মনে এলো না। সোহিনীর ব্যবহার সহজ, সাবলীল, তার সঙ্গে অনায়াসে গল্প করতে করতে যেতে পারতো অশোক কিন্তু তার যে বুক কাঁপছে!

বিনোদ দশ মিনিটের পথ বলেছিল, মোটেই তত সংক্ষিপ্ত পথ নয়। সবাই হাঁটছে তো হাঁটছেই।

হঠাৎ সোহিনী অশোকের পাশে এসে বললো, আপনি আমার হাতটা একটু ধরবেন ?

অশোক প্রায় স্তম্ভিত। তাহলে এ নারী সত্যিই কি অলৌকিক ! অশোকের মনের তীব্র বাসনার কথা টের পেয়ে গেছে ? নিজে থেকেই হাত ধরার কথা বললো ?

অশোক তবু হাত বাড়াতে সাহস করছে না। সোহিনী আবার বললো, সামনে রাস্তাটা ঢালু হয়ে গেছে। একবার আমার পা মুচকে গিয়েছিল, সেই থেকে আমার ভয় হয়—

সে একটা হাত বাড়িয়ে দিল অশোকের দিকে। সামনের রাস্তার খানিকটা অংশ সত্যিই খানিকটা নিচু হয়ে গেছে।

অশোক যা ভেবেছিল ঠিক তাই, সোহিনীর হাত যেন তার মুঠোর মধ্যে মাখনের মতন গলে যাচ্ছে। অশোকের বুকের মধ্যেও যেন কিছু গলে গলে মিশে যাচ্ছে রক্তে।

জায়গাটা পার হবার পর অশোক হাত ছেড়ে দিল।

এইটুকু সময়ের মধ্যেও অশোক একটাও কথা বলতে পারলো না।

আবার একটু পরেই আর একটা বেশ বড় গর্ত। সোহিনী তাকালো অশোকের দিকে।

অশোক ভীরু গলায় বললো, হাতটা ধরবো ?

সোহিনী বললো, আমাকে না ধরলে আমি যদি পড়ে যাই ? সেটা কী ভালো হবে ?

এবার হাত ধরার পর সোহিনীর গায়ের সঙ্গেও একবার ছুঁয়ে গেল অশোকের গা। এ যেন আশাতীতভাবে হঠাৎ স্বর্গ পাওয়া। সোহিনীর কাছে অবশ্য ব্যাপারটা যেন কিছুই না। পাশাপাশি হাঁটতে গেলে এরকম তো হয়ই। এইটুকু ছোঁয়াছুঁয়িতে কী বা আসে যায় ?

সোহিনী বললো, আমার বরটার কাণ্ড দেখেছেন ? ও তো জানে, একবার আমার পা মচকে ছিল। রাস্তায় এরকম গর্ত দেখে ওর কি উচিত ছিল না পিছিয়ে এসে আমাকে সাহায্য করা ?

অশোক মনে মনে বললো, ভাগ্যিস বসন্ত পিছিয়ে আসেনি !

সোহিনী বললো, বিয়ের পর সাত সাতটা বছর কেটে গেল তো ! আগে ও আমায় সর্বক্ষণ হাত দিয়ে ঘিরে রাখতো ! এখন আমি পুরনো হয়ে গেছি।

অশোকের কাছে কথাটা অবিশ্বাস্য মনে হলো। এমন সুন্দর রমণী কখনো

পুরনো হতে পারে ? তাও মাত্র সাত বছরে ? বসন্ত বিশ্বাসের বয়েস পঞ্চাশের কম নয়, মোটে সাত বছর আগে বিয়ে করেছে ! দ্বিতীয় পক্ষ নাকি ? সোহিনী একা একা বিদেশে ছিল, বিয়ের আগে, না পরে ? নিশ্চয়ই অনেকেই এ রমণীর প্রেমে পড়েছিল তখন।

এসব কথা মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করা যায় না।

সোহিনী বললো, আমি আগে কখনো কোনো কবির সঙ্গে পাশাপাশি হাঁটিনি। কবিরা বুঝি কথা বলে না ?

এবারে অশোক বললো, যারা কবিতা লেখে তারা সকলেই একরকম নয়। কোনো কোনো কবি খুব সুন্দর করে কথা বলতে পারে। কেউ পারে না। আমার মনে হচ্ছে, কথা বললে সব নষ্ট হয়ে যাবে।

সোহিনী বললো, কী নষ্ট হয়ে যাবে ?

অশোক বললো, এই ভালো লাগা।

সোহিনী এ কথাটাকে গুরুত্ব না দিয়ে বললো, দেখেছেন, আমার বরটা শুধু তিস্তার সঙ্গেই গল্প করে চলেছে। আমি আসছি কি না তাও লক্ষ্য করছে না।

গর্তটা পার হয়ে গিয়ে আবার সমতল রাস্তা। অশোকের খেয়াল নেই, সে এখনো সোহিনীর হাত ধরে আছে। সোহিনীও হাত ছাড়িয়ে নিচ্ছে না।

একটু পরে সে বললো, আপনি এই হাত দিয়ে কবিতা লেখেন। আমাকে ছুঁয়ে আছেন, ভালো লাগাটা তো আমার !

অশোক বললো, আপনার মতন একজন রমণীর স্পর্শ পাওয়া একজন কবির পক্ষে যে কত বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার, তা আপনি জানেন না ?

সোহিনী বললো, তাই নাকি ?. এর আগে কত লোক তো আমার হাত ধরেছে, কেউ তো কিছু বলেনি ! আমার স্বামী তো আমার হাত ধরতেই চায় না।

অশোক বললো, আমি তো ভাবতেই পারিনি যে আপনি নিজে থেকে—

সোহিনী খানিকটা দুঃখী দুঃখী গলায় বললো, বিয়ের পর সাত বছর, তাতে সব কিছু এমন বদলে যায় ?

অশোক বললো, আমি ঠিক জানি না !

সোহিনী বললো, কী জানেন না ?

অশোক বললো, এই বিয়ের ব্যাপারটা।

এখন এই ধরনের কথা একেবারেই বলতে চায় না অশোক। তার চেয়ে নীরবতা অনেক ভালো। ঐ স্পর্শের সুখ সে পুরোপুরি উপভোগ করতে চায়।

কোনো কবিতার লাইন মনে আসেনি। মনে গুঞ্জরিত হচ্ছে একটা গানের লাইন, 'তাই তে কী ভয় মানি, বন্ধু জানি তোমার আছে তো হাতখানি'। বন্ধু ? সোহিনীর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হওয়া কি সম্ভব ? হয়তো জীবনে আর কোনোদিন দেখাই হবে না। আজকের এই হাত ধরাধরি করে যাওয়া কি সোহিনীর মনে থাকবে ? সে তো বললো, অনেকেই তার হাত ধরে।

সামনের দিকে দলটা থেমে গেলে।

সোহিনী চেঁচিয়ে বললো, বসন্ত, আর কতদূর যেতে হবে ?

বসন্ত বললো, এসে গেছি। শোনো, সামনে দুটো দোকান খোলা আছে। তুমি ভেজ্ না ননভেজ্ খেতে চাও ?

কথা বলতে বলতে সে এগিয়ে এলো সোহিনীর কাছে। চোখে পড়লো, তার স্ত্রীর হাত ধরে আছে অশোক। তার ভুরু কুঁচকে গেল। রাস্তায় হাঁটার সময় নিজে সে স্ত্রীর হাত ধরে না বটে, অন্য কারুর হাত ধরাটাও পছন্দ করে না।

অশোক কিছুই খেয়াল করছে না। সোহিনী নিজে থেকে হাত ছাড়িয়ে না নিলে সে ছাড়বে কী করে ?

স্বামীর চোখের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণভাবে হেসে উঠলো সোহিনী।

তারপর অশোককে বললো, আপনি আমার হাত ধরে আছেন কেন ? আপনার বুঝি পায়ে ব্যথা ?

খিদে

রাস্তাটা কাঁপে দুপুরবেলার রোদ্দুরে। দু'পাশের গাছগুলো ধোঁয়া ধোঁয়া দেখায়
মাত্র দেড় মাস আগে এই রাস্তাটায় পিচ ঢেলে পাকা করা হয়েছে, নতুন-নতু
গন্ধ পাওয়া যায়। আগে যখন মাটির রাস্তা ছিল, বড় জারুল গাছটার কা
ছিল একটা বিরাট খোঁদল, একবার বর্ষার জলে ওর মধ্যে খলাৎ খলাৎ কর
দেখা গিয়েছিল দুটো কই মাছকে, কোথা থেকে তারা এসেছিল কে জানে

এখন সেই গর্তটা একেবারে নিশ্চিহ্ন।

রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ ব্যথা করে বিজুর। এই চাঁ
ফাটা রোদে কেউ বাইরে বেরোয় না. চতুর্দিক একেবারে শুনশান। খাল পা
বাস থামে, বাস থেকে নামা যাত্রীরা এই পথেই হেঁটে আসবে, কেউ আসে না
তবু বিজু এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। এক একসময় তার মনে হয় আসছে
একজন আসছে, পা-জামার ওপর হাফ শার্ট পরা, কাঁধে একটা ঝোলা, দু'হা
দুটি পুঁটলি, সেই পুঁটুলি দুটোর ভারে যেন নুয়ে পড়ে হাঁটছে। একেবারে চাল
ডাল আরও কত খাবার কিনে নিয়ে ফিরছে দাদা। কিন্তু কয়েক পলকের মধ্যে
সেই দৃশ্য মিলিয়ে যায়, রাস্তা আবার ফাঁকা।

একটা গাছের ছায়ায় মাটিতেই পা ছড়িয়ে বসে থাকে বিজু, তার খাঁ
হাফ প্যান্টের রং এখন ধুলো ধুলো, খালি গা, গলায় একটা সুতোয় বাঁ
মাদুলি। তার তের বছরের শরীরটা একবার ঘামে ভিজে জবজব করছে
একবার শুকোচ্ছে, আবার বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে বেরুচ্ছে। একটা কাঠি দি
মাটিতে ভূতের ছবি আঁকছে বিজু, সেও মরে গিয়ে ভূত হবে।

তিন দিন হয়ে গেল, দাদা এখনো ফিরলো না।

এক সময়ে জল তেষ্টায় বিজুর বুক শুকিয়ে যায়, সে উঠে এক দৌড়ে চলে আসে কলতলায়। সেখানেও কেউ নেই।

কিছুদিন আগেও সবাই পুকুরের জল খেত. ঘোষদের পুকুরটার নাম মিষ্টিপুকুর, সেখানে কেউ গরু-মোষ নামায় না, পদ্মদামে ভরা, ওই পুকুরের জল আনতো সব বাড়ির মেয়েরা। এখন মহাদেব সাউ তার মায়ের নামে টিবউবওয়েল বানিয়ে দিয়েছে এ গ্রামের মানুষের জন্য, যেমন তেমনভাবে দান নয়, বেশ মজবুত টিউবওয়েল, চারপাশে অনেকখানি সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। একটা নয়, তিনটে তিন জায়গায়।

টিউবওয়েলের ধার ঘেঁসে শুয়ে আছে ভুলি নামে কুকুরটা। ওর পেটের কাছে টুঁসোটুঁসি করছে চারটে ছানা, ভুলির জিভ বেরিয়ে পড়েছে অনেকখানি, মাথাটা নাড়ছে, ও বেচারারও তেষ্টা পেয়েছে খুব।

এক হাতে পাম্প করে জল খাওয়ার খুব অসুবিধে। টিউবওয়েলের মুখটা চেপে ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে পাম্প করতে লাগলো বিজু। তারপর হাতটা একটু ফাঁক করতেই পিচকিরির মতন জল বেরুতে লাগলো। সেখানে মুখ লাগিয়ে স পেট ভরিয়ে ফেললো। তারপর আবার দুহাতে পাম্প করতে করতে বললো, যেন ভুলি, খা, জল খা।

ভুলির বাচ্চাগুলোর চোখ ফুটে গেছে অনেকদিন, তবু ওরা মায়ের দুধ ছাড়েনি। ভুলির পেটের তলাটা ফোলা ফোলা, এখনো দুধ আছে বোঝা যায়, সদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিজুর মনে হয়, কতদিন দুধ খায়নি সে। কবে খেয়েছিল, কবে? সেই যেবারে বিজু ক্লাস থ্রিতে উঠেছিল, বাবার সঙ্গে গিয়েছিল সোনামুখী শহরে। একটা মিষ্টির দোকান থেকে কাঁচাগোল্লা কিনেছিল বাবা, একটা বিরাট কড়াইতে ফুটছিল দুধ, যেন একটা দুধের পুকুর। বিজুর দৃষ্টি দেখেই বাবা বুঝতে পেরেছিল, জিজ্ঞেস করেছিল, খাবি!

দুটো মাটির ভাঁড়ে দিয়েছিল গরম গরম দুধ, একটুখানি সর ফাউ, সেই দুধে চুমুক দেবার পর বাবার গোঁফটা সাদা হয়ে গিয়েছিল, বিজুর স্পষ্ট মনে আছে। তারপর কি আর কখনো দুধ খেয়েছে বিজু? নাঃ, বাড়িতে দুধ আসবে কোথা থেকে। তাদের গরু নেই। সোনামুখীর দোকানের সেই দুধ, আঃ ঠিক যেন অমৃত!

জল খেলেই পেট ব্যথা করবে বিজু জানতো। হ্যাঁ, ঠিক শুরু হয়েছে। যেদিন থেকে ভাত খাওয়া বন্ধ হয়েছে, সেদিন থেকেই এরকম। শুধু জল খেয়ে যদি পেট ভরানো যেত, তা হলে কী মজাই না হতো। খালি পেটে অনেকখানি জল

খেলে পেটটা ভর্তি হয়ে ফুলে যায় বটে, তারপরই ব্যথা শুরু হয়। পেট ব্য
হলেই মনটা আরও খারাপ হয়ে যায়।

পেটে থাবড়া মারতে মারতে বাড়ির দিকে এগোলো বিজু।

গ্রামের এক টেরে দুটি মাত্র বাড়ি। ধরণীকাকার বাড়ির লোকদের স
বিজুদের কথা বন্ধ। কী নিয়ে ধরণীকাকার সঙ্গে বাবার খুব ঝগড়া হয়েছিল
ও বাড়ির উঠোনে বিজুদের পা দেওয়াও নিষেধ। মা আর এ বাড়ির মেয়ে
একই পুকুরে স্নান করতে যায়, কিন্তু কেউ কারুর দিকে তাকায় না।

বাবার সঙ্গে এ-গ্রামের অনেকেরই ঝগড়া, বাবা যে খুব রাগী। সবাই না
দিয়েছে রগচটা পশু। বাবার আসল নাম পশুপতি, কিন্তু সবাই পশু পশুই বলে
এত রাগী বলেই তো বাবা এখন জেল খাটছে।

মঙ্গলবারের হাটে বাবা একজন পুলিশকে মেরেছিল। পুলিশ যাকে ইচে
মারতে পারে। কিন্তু পুলিশকে কখনো মারা চলে না, রাগের মাথায় বা
সে-ই ভুলটাই করে ফেলেছিল। এ গ্রামে অনেকেই বাবাকে পছন্দ করে ন
তবু তারাও স্বীকার করেছে, সেদিন বাবার কোনো দোষ ছিল না। মুরুব্বিজ্যা
তো এই সেদিনও বললেন, পশুপতিটা দুর্মুখ, চাঁছাছোলা কথা বলে, সাম
আড়ালে মানে না, তা বলে সে চোর-ছ্যাঁচোড় নয়, এটা মানতেই হবে। পুলি
কেন ওকে আগে মারতে গেল ? পুলিশের কোনো দোষ তো গভর্নমেন্ট দে
না !

বাবা জেল খাটছে, তা বলে কেউ বিজু কিংবা তার দাদা বাসুকে চোর
ডাকাতের ছেলে বলে না। বরং পুলিশকে মেরেছে বলে লোকের চোখে বাবা
সম্মান হঠাৎ যেন বেড়ে গেছে। পুলিশের ওপর কার না রাগ আছে ? কি
কেউ তো পুলিশের মুখের ওপর কিছু বলতেই সাহস পায় না।

ধরণী বর্মণের বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে বিজু দেখলো এই ভর দুপু
তুলসীমঞ্চে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ননীপিসি। একটা হলুদ শাড়ি আলুথা
ভাবে পরা, মাথার চুল পেছন দিক থেকে ঘুরিয়ে এনে ছড়ানো আছে বুকে
ওপর। বড় বড় চোখ মেলে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে শূন্যের দিকে।

সেদিকে তাকিয়েই বিজুর বুকটা ছমছম করে উঠলো।

দুই পরিবারের ঝগড়া হলেও ননীপিসি কিন্তু বিজুর সঙ্গে ডেকে ডেকে কথ
বলে। ননীপিসি তো এখানে থাকে না, বিয়ের পর চলে গেছে পুরুলিয়া। তা
বিয়ের আগে বিজুদের সঙ্গে ভাব ছিল, তাই ননীপিসি আগের সম্পর্কটা
রাখতে চায়।

কিন্তু ননীপিসিকে দেখলে বিজুর ভয় ভয় করে। বাচ্চা হবার জন্য ননীপিসি বাপের বাড়ি এসেছিল। দু' মাস আগে ননীপিস একটি মৃত সন্তান প্রসব করেছে। বিয়ের দশ বছর পর প্রথম সন্তান, সেও বাঁচলো না। তার পর থেকে ননীপিসির কেমন যেন পাগল পাগল ভাব, যখন-তখন হু হু করে কাঁদে, কথা বলতে বলতে উৎকট গম্ভীর হয়ে যায়, হঠাৎ হঠাৎ ছুটে গিয়ে পুকুরে ঝাঁপ দেয়। সাঁতার জানে অবশ্য, ডোবে না।

ওই পাগল-পাগল ভাবের জন্যই শুধু নয়, এক একসময় তো ননীপিসি বেশ ভালোভাবেই কথা বলে বিজুর সঙ্গে, তবু ননীপিসি সামনে এলেই কেন যে বিজুর বুক কাঁপে, তা সে জানে না। বিয়ের আগের তুলনায় ননীপিসির শরীরটা যেন অনেক বড় হয়ে গেছে। উরু দুটো অনেক চওড়া, বুক দুটো বাতাবি লেবুর মতন, হাঁটার ভঙ্গিটাও অন্যরকম। ননীপিসির দিকে সোজাসুজি চোখ তুলে তাকাতে বিজুর লজ্জা করে, আবার তাকাতে ইচ্ছেও করে। সে আড়াল থেকে দেখে।

তের বছর বয়েস হয়ে গেল বিজুর, সে মেয়েদের সম্পর্কে একেবারে অবোধ নয়। সে জানে যে সন্তান-সম্ভবা হলে মেয়েদের বুক দুধে ভরে যায়। ভুলি কুকুরটার যেমন হয়েছে। ননীপিসিমার ছেলে বেঁচে নেই কিন্তু বুকে দুধ আছে, তাই বুক দুটি এখনো অত বড়।

ননীপিসি তুলসী মঞ্চে ঠেস দিয়ে মূর্তির মতন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিজুকে দেখতে পেল না। বিজুও সাড়া শব্দ না করে সে বাড়ির সামনেটুকু পেরিয়ে চলে এলো, তবু তার মনে হলো, ননীপিস একবার তাকে ডাকলে কী ভালোই না লাগতো!

বাড়িটা একেবারে নিস্তব্ধ। বিজুর ঠিক পরের বোন ওর মাত্র এক বছরের ছোট। রং ফর্সা বলে বাবা ওর নাম রেখেছে পুতুল। বাইরে অত রাগী হলেও বাবা কখনো পুতুলকে কিংবা বিজুকে মারে না। শুধু দাদাকে একদিন বেদম পিটিয়েছিল। দাদা ইস্কুলে কিছু একটা গণ্ডগোল করেছিল, সেই জন্য। দাদাও জেদী কম নয়। বিজু আর দাদা এক ঘরে শোয়, মার খাবার পর রাত্তিরবেলা দাদা বলেছিল, বাবা যদি ফের আমার গায়ে হাত তোলে, আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো।

পুতুল মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, চোখ বোজা। একটা ঝ্যালঝেলে সবুজ ফ্রক পরা, ভাই-বোনদের মধ্যে পতুলই সবচেয়ে রোগা। পুতুল একেবারে খিদে সহ্য করতে পারে না।

মা ঘুমোয়নি, মহাভারত বইখানা খুলে বসে আছে পেছনের বারান্দায়।

কাছেই সন্ধ্যামালতী ফুলগাছের বড় একটা ঝাড়। উঠোনের এক পাশে দুটো কলাগাছও রয়েছে, একটাতেও মোচা ধরেনি।

মায়ের পাশে বসে পড়ে বিজু মিনমিন করে বললো, মা, আমার পেট ব্যথা করছে।

মহাভারত থেকে চোখ তুলে মা বললো, জল খা। কলসিতে জল আছে।

বিজু এবার ঝাঁঝালোভাবে বললো, জল খেয়েই তো পেট ব্যথা করতে আরম্ভ করলো!

ছেলের দিকে একটুক্ষণ চেয়ে রইলো অভয়া। এ পেট ব্যথার কোনো ওষুধ তার জানা নেই। তবু সে বললো, বোনের পাশে পেট চেপে শুয়ে থাক, দ্যাখ যদি কমে।

বিজুও তাকিয়ে রইলো মায়ের দিকে। তার চোখ ভরা অভিমান। সে জানে, মায়ের কোনো সাধ্য নেই, তবু তার কষ্টের কথা আর কার কাছে বলবে? তার যে বিষম খিদে পাচ্ছে। সে যেন খিদের চোটে মরেই যাবে।

সারাদিন সে কিছুই খায়নি। কথাটা একেবারে সত্যি নয় যদিও। পুতুল আর সে গুচ্ছের কলমি শাক তুলে এনেছিল, তাই সেদ্ধ করে খেতে দিয়েছিল মা। বাড়িতে এক ফোঁটা তেল নেই, শুধু নুন আর কাঁচালংকা। তা দিয়ে আর কতখানি কলমি শাক খাওয়া যায়? যা খেয়েছিল, তা কখন হজম হয়ে গেছে

বিজু বললো, মা, রাত্তিরে কী খাবো?

মা চুপ করে রইলো।

কলমি শাক সেদ্ধ এখনো অনেকটা রয়ে গেছে। রাত্তিরে অবার তাই খেতে হবে? বিজুর তা হলে বমি হয়ে যাবে।

বিজু আবার বললো, রাত্তিরে কী খাবো, বলো না!

মা বললো, ওই মাদুলিটা চেপে ধরে ভগবানকে ডাক। তিনি যেন আজই তোর দাদাকে ফিরিয়ে দেন।

বিজু বললো, সকালে তো কতক্ষণ ডাকলাম!

মা বললো, বারবার ডাকতে হয়। ভগবান কত কাজে ব্যস্ত থাকেন...বাসু ফিরে এলে...ও নিশ্চয়ই চাল কিনে আনবে, গরম গরম ভাত খাবি।

একটা কথা আজ সকাল থেকেই বিজুর মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, সে কথাটা মাকেও বলা যায় না।

জেল থেকে ছাড়া পেতে বাবার এখনো ন'মাস একুশ দিন বাকি। কে যেন বলছিল এক মাস কমিয়েও দিতে পারে। তা হলেও তো আরো আট মাস একুশ দিন। বাবা ফিরে এলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ধার করেই হোক,

আর যে করেই হোক, বাবা কখনো ছেলেমেয়েদের না-খাইয়ে রাখেনি। কিন্তু আরও আট মাস একুশ দিন ওরা বেঁচে থাকবে কী করে ?

থানার সেপাই রণছোড় সিং হাটের ছোট ছোট দোকানদারদের কাছ থেকে তোলা নিত। অনেক কাল ধরেই এরকম চলে আসছে, রণছোড়ের আগে অন্য সেপাই নিত। কেউ তোলা দিতে আপত্তি করলে তার দোকানটাই উঠে যায়। বাবা রণছোড় সিংকে বাধা দিতে গিয়েছিল, তাই নিয়ে গণ্ডগোলের শুরু। একে বলে পরের ব্যাপারে নাক গলানো। কে পুলিশকে পয়সা দেবে কি না দেবে, তা নিয়ে পশুপতি দাসের মাথাব্যথার কী দরকার ছিল !

পশুপতি দাস আট-দশ বছর কাজ করেছে যাত্রা দলে। এক সময় সেখানেও ঝগড়া মারামারি করে কাজ ছেড়ে চলে আসে। এখানে গণাবাবুর কাপড়ের দোকানে একটা চাকরি পেয়েছিল। জমি-জিরেত নেই কিছু, চাকরিটাই সম্বল। বড় ছেলে বাসুদেব ক্লাস টেন-এ পড়ে, কোনোক্রমে পাসটা করতে পারলে তাকেও গণাবাবু একটা কাজ দেবেন বলে রেখেছিলেন। গণাবাবু পশুপতির চোটপাটও সহ্য করতেন, কারণ লোকটা বিশ্বাসী। এই ভাবে বেশ তো চলছিল। কিন্তু কিছু লোকের যে পরের ব্যাপারে মাথা গলানোর অভ্যেস। নিজের স্বার্থে ঘা না লাগলেও অন্যের প্রতি অন্যায়ও সহ্য করতে পারে না। হাটের তোলা নিয়ে রণছোড়ের সঙ্গে বচসা। পশুপতিকে একটা খুব খারাপ গালাগালি দিয়ে রণছোড় তার পাছায় একটা লাথি কষিয়েছিল। আর যায় কোথায় ! হাটের মধ্যে অত লোকজনের মাঝখানে রণছোড়কে বেধড়ক মারতে শুরু করে দিয়েছিল পশুপতি। যাত্রাদলের সেনাপতির পার্ট করেছে সে একসময়ে, তার গায়ের জোর কম নয়, রণছোড়ের তিনখানা দাঁত ভেঙে দিয়ে সে হাতের ধুলো ঝেড়েছিল।

পুলিশকে মেরে কে কবে পার পেয়েছে ?

পশুপতিকে যখন দারোগাবাবু এসে ধরে নিয়ে যায়, তখন আলুবেচা দামু আর এক ডিমওয়ালি বুড়ি ছাড়া কেউ তার হয়ে একটাও কথা বলেনি। রণছোড় যাদের কাছ থেকে তোলা নেয়, তারা দূরে বোবার মতন দাঁড়িয়ে রইলো। ওই দুজনের কথা গ্রাহ্য করেননি দারোগাবাবু, পশুপতির চুলের মুঠি চেপে ধরেছিলেন। থানায় নিয়ে গিয়ে সব কটা সেপাই মিলে মারতে মারতে আধমরা করে ফেলেছিল পশুপতিকে।

জজ সাহেব পশুপতির দেড় বছর কারাদণ্ডের হুকুম দিলেন।

জজ সাহেবের কী সুন্দর চেহারা, একটা দারুণ সিল্কের জামা পরেছিলেন।

সেদিন মা, দাদা, বিজু তিনজনেই গিয়েছিল আদালতে, শুধু পতুল ছিল বাড়িতে। জজ সাহেব কয়েক পলক তাকিয়েছিলেন এই তিনজনের দিকে, বিজুর সঙ্গে তাঁর চোখাচোখিও হয়েছিল, তবু তিনি এই দণ্ড উচ্চারণ করে হাতুড়ি ঠুকে দিলেন টেবিলে।

জজ সাহেব কি একবারও ভাবলেন না, রাগের মাথায় পশুপতি একটা কাণ্ড করে ফেলেছে বলে তাকে শাস্তি দেওয়া হলো, কিন্তু এরপর তার সংসার চলবে কী করে ? তার বউ-ছেলেমেয়েরা খাবে কী ? তারা কি কোনো দোষ করেছে ? আইন এসব মানে না। একজনকে শাস্তি দেয়। বিজুর খুব অভিমান হয়েছিল সেদিন।

ওদের পক্ষের উকিল বরদাবাবু বলেছিলেন, আমার জন্যই তোমরা বেঁচে গেলে, বুঝলে ? পুলিশের গায়ে হাত তোলার কেস, এর সঙ্গে আরও অনেক কেস ঝুলিয়ে দিয়ে অন্তত সাতটি বছর ঘানি ঘোরাবার ব্যবস্থা করে দিত। আমার সওয়াল শুনেই তো হাকিম শাস্তি অত কমিয়ে দিলেন। আমি নিজে দুদিন আসামীকে দেখতে গেছি, নইলে হাজতেই ওকে পিটিয়ে মেরে তেলে সেপাইরা গায়ের ঝাল মেটাতো। ঠিক কি না ?

অন্য উকিলরা মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিলেন।

হয়তো উকিলবাবুর কথাই ঠিক। মায়ের দু'খানি সোনার চুড়ি বেচে তাঁকে ফি দেওয়া সার্থক হয়েছে !

মায়ের আর কোনো গয়না নেই। আরও আট মাস একুশ দিন বাকি !

রাত্তিরে কী খাবে, সেটাই বিজুর প্রধান চিন্তা। দিনের বেলা তবু চালিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু রাত্তিরে পেট খালি থাকলে তো ঘুম আসে না।

ঘুম না এলে যত রাজ্যের ভয় এসে মাথা জুড়ে বসে। অনেক দূরে অশত্থ তলায় শ্মশান। সেখানে দাউ দাউ করে জ্বলে চিতার আগুন, ঘরে শুয়েও যেন দেখতে পাওয়া যায়।

—মা রাত্তিরে কী খাবো ?

—দুটো বড় বড় পেঁপে আছে। সেদ্ধ করে নুন মরিচ দিয়ে মেখে দেবো, দেখবি খুব ভালো লাগবে।

—শুধু পেঁপে সেদ্ধ ? ভাত খাবো না ?

—বোকার মতন কথা বলিস না, বিজু। বড় হয়েছিস, এখনো বুঝিস না কেন ? ঘরে এক দানা চাল না থাকলে কেউ ভাত খায় ? বাসু ফিরে আসবে, চাল কিনে নিয়ে আসবে, হয়তো আজ সাড়ে সাতটার বাসেই...

বাবা জেলে যাবার আগে মাকে বলেছিল চোখ পাকিয়ে, যদি না খেয়ে মরতে হয়, মরবে, তাও সই, তবু খবরদার কারুর কাছে ভিক্ষে করবে না। ফিরে এসে যদি শুনি আমার ছেলে-মেয়েরা ভিখিরি হয়ে গেছে, তা হলে তোমাকেই আগে খুন করবো।

এখন অবশ্য ওদের কেউ ভিক্ষেও দেবে না। প্রথম প্রথম গ্রামে কিছু লোক ওদের সাহায্য করেছে। কিন্তু মানুষের দয়া-মায়া বেশিদিন থাকে না, শুকিয়ে যায়। ছ'মাস ধরে কে ওদের সংসার টানবে। ঘটি-বাটি পর্যন্ত সব বিক্রি হয়ে গেছে। এখন কেউ ধারও দিতে চায় না। ধরণীকাকাকের বাড়িতে ভাত রান্না হয়, এ বাড়িতে সেই গন্ধ আসে। একটা বেড়াল ও বাড়ি থেকে মাছের কাঁটা মুখে করে এনে এ বাড়ির উঠোনে বসে খায়। উষা কাকিমা একদিন পুতুলকে এক বাটি চিঁড়ে দিয়েছিলেন, তারপর ধরণীকাকার কী চ্যাঁচামেচি !

বীণাপাণি অপেরা থেকে বাবা যখন ঝগড়া করে কাজ ছেড়ে চলে আসে, তখন বাবার দু'শো সাতাশ টাকা মাইনে বাকি ছিল। বাবা বলতো, ও চশমখোরটার মুখও আমি দেখতে চাই না, তাই সেই টাকা আদায় করতে যায়নি কোনো দিন। বীণাপাণি অপেরার মালিক আবার মায়ের পিসতুতো দাদা হয় সম্পর্কে। মায়ের ধারণা তার সেই দাদাটি মানুষ খারাপ নয়, কিন্তু স্বামীর উগ্র মেজাজ দেখে সে কথা উল্লেখ করার সাহস হয়নি এতদিন। এখন বাঁকুড়ায় সেই দাদার কাছে একটা চিঠি লিখে বাসুকে পাঠানো হয়েছে। এ তো ভিক্ষে নয়, ধারও নয়, ন্যায্য পাওনা আদায়। বাসু যেখানে গেছে, সেটা তো এক হিসেবে তার মামাবাড়ি, ওরা বাড়ির দরজা থেকে বাসুকে ফিরিয়ে দেবে না।

কিন্তু বাসু ফিরছে না কেন ? একদিন যায়, দু'দিন যায়, পাঁচদিন কেটে গেল। বাসুই তাদের শেষ আশা-ভরসা। দু'শো সাতাশ টাকা পেলে এই ক'টা মাস স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে। বাসু অবশ্য বলে গেছে, মা, তোমাদের জন্য আমি একশো টাকার চাল কিনে দেব, আর বাকি টাকায় আমি ব্যবসা করবো। এই তো নতুন আলু উঠতে শুরু করেছে, গ্রাম থেকে আলু কিনে হাটে বিক্রি করলে কিছু লাভ থাকবেই। গনাবাবু তাঁর দোকানে পশুপতির ছেলেদের যেতে বারণ করে দিয়েছে, পুলিশ মারার কেস, এখন তাঁর দোকানের ওপরেই না পুলিশের কোপদৃষ্টি পড়ে। বাসু বসবে হাটের অন্য এক কোণে।

বাসু আসছে না, তার কি কোনো দুর্ঘটনা হলো ? কেই-বা খবর আনতে পারে, বাস ভাড়া দেবার মতন আর একটা পয়সাও নেই।

দুপুর থেকে পুকুর ধারে ছিপ ফেলে বসে আছে বিজু। এ পুকুরে মাছ

নেই। পাঁচ শরিকের পুকুর, যে-যখন পারে বেড়া জাল টেনে দেয়। আগের গ্রীষ্মে এ পুকুরের জল কমে কোমর পর্যন্ত নেমে গিয়েছিল, মাছ থাকবে কী করে ?

তবু বিজু ফাৎনার দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে মনে মনে জপ করতে থাকে, হে ভগবান, একটা মাছ দাও ! একটা বড় দেখে কাৎলা, অন্তত দেড় কেজি, একটা মাছ কি এই পুকুরে লুকিয়ে থাকতে পারে না ? সে রকম একটা মাছ পেলে, নিজেরা খাব না, মাছটা দৌড়ে মহাদেব সাউয়ের বাড়িতে নিয়ে গেলে নিশ্চয়ই অনেক চাল দেবে। রতন দুলে একবার নদীতে একটা দু'হাত লম্বা মৃগেল মাছ ধরেছিল, অতবড় মাছ কেনার খদ্দের হাটেও থাকে না। সে মহাদেব সাউয়ের বাড়িতে নিয়ে গেলে ওরা খুশি হয়ে কিনে নিয়েছিল।

গলার মাদুলিটা চেপে ধরে বিজু বারবার বলতে লাগলো, হে ভগবান, হে ভগবান, একটা মাছ দাও।

সকাল থেকে কিছুই খায়নি বিজু। এ পুকুর ধারে কলমি শাকও হয় না। ঘোষদের মিষ্টি পুকুরের পাড়ের কলমি শাকও ফুরিয়ে এসেছে। তারপর কী হবে ? পুতুল সারা দিনে পাঁচ বার বমি করেছে। পুতুলই কলমি শাক তুলে আনে, কিন্তু সে বেচারি নিজে কলমি শাক কিছুতেই সহ্য করতে পারে না।

এই গরমের মধ্যেও হঠাৎ হঠাৎ একটা ভয়ের কাঁপুনিতে বিজুর শীত করছে। তারা সত্যি সত্যি মরে যাবে ? যে-কথাটা মাকেও বলা যায় না, সেই কথাটাই বেশি ভয় ধরিয়ে দেয়। দাদা কি ইচ্ছে করে ফিরছে না ? টাকাটা নিয়ে অন্য কোথাও সরে পড়েছে। দাদা ব্যবসা করতে চায়। ভাই-বোন-মায়ের জন্য বাজে খরচ না করে দাদা যদি পুরো টাকাটা নিয়ে অন্য কোথাও ব্যবসা করতে বসে যায় ? বাবার ওপর দাদার রাগ ছিল, কিন্তু মাকে তো সে ভালবাসতো। তবু দাদা ফিরছে না কেন ?

দাদা যদি সত্যিই না ফেরে তা হলে আর বাঁচার আশা নেই। সে আগে মরবে ? মা প্রায়ই বলে, আমি মরলে তোরা আর এখানে থাকিস না। অন্য গাঁয়ে গিয়ে ভিক্ষে করিস। কোনো মন্দিরের চাতালে পড়ে থাকবি, কেউ তাড়িয়ে দেবে না।

রোগা হতে হতে মা এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছে যে চামড়ার তলার সব হাড়গুলো দেখা যায়। চোখ দুটো বেশি জ্বলজ্বল করে। তবু মা কাঁদে না কখনো. মহাভারত খুলে বসে থাকে। বিজুর ধারণা, আগে মরবে পুতুল। ও সব সময় কাঁদে, কোনো শব্দ করে না, অনবরত চোখ দিয়ে জল গড়ায়।

জেলখানায় বিনা পয়সায় খেতে দেয়, বাবা দু' বেলাই খাচ্ছে। বেশ মজায় আছে। বাবা বেঁচে থাকবে। দাদা অতগুলো টাকা নিয়ে ব্যবসা করছে, দাদা বেঁচে থাকবে। শুধু হারিয়ে যাবে, মা, পুতুল, আর বিজু। না না, না, বিজু কিছুতেই মরতে চায় না। হে ভগবান, বাঁচিয়ে দাও, তুমি এত কাজে ব্যস্ত, তবু আমাদের দিকে একবার তাকাও।

পেটের মধ্যে নাড়ি-ভুঁড়িও যেন সব হজম হয়ে গেছে। তারপরেও আগুন জ্বলছে। শ্মশানের আগুনের মতন। মাঝে মাঝে মাথাটা ঝিম ঝিম করে, ঘুম পায়। বিজুর ধারণা, দিনের বেলা ঘুমিয়ে পড়লেই সে মরে যাবে। ক্ষিদের সময় সব কিছু খাওয়া যায় না কেন ? গতকাল সে চুপি চুপি অনেকগুলো ঘাস তুলে চিবিয়ে খেয়েছিল, একটু পরেই বমি হয়ে গেল। গরু তো ঘাস খায়, তাদের বমি হয় না। আম গাছের পাতা খাওয়া যায় ! তাতেও যদি বমি হয় ! বমির সময় বড় কষ্ট, যেন গলার কাছটা কেউ মুচড়ে ধরে।

বিজু মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকায়। মেঘ নেই, রোদ্দুরে ঝকমক করছে। আকাশ খাওয়া যেত যদি। আকাশ খেলে বমি হতো না। তরমুজের ফালির মতন এক টুকরো আকাশ কেটে আনা যায় না ?

হে ভগবান, আমাদের মেরো না, মেরো না, দাদাকে ফিরিয়ে দাও। দাদা কি মামাবাড়ি দুধ ভাত খাচ্ছে, না দাদা নিজেই হঠাৎ মরে গেছে। যদি টাকা নিয়ে ফেরার সময় ডাকাতে ধরে দাদাকে ?

একটা মাছ, একটা মাছ, বড়-ছোট যে-কোনো মাছ, আয়, আয়, আয়, মাছ আয়, মাছ আয়।

মহাদেব সাউয়ের মেয়ের বিয়েতে গ্রাম সুদ্ধু মানুষকে কত খাইয়েছিল। দাদা আর বিজু বসেছিল পাশাপাশি, শেষ পাতে একখানা লুচি আর সে খেতে পারেনি। দাদা বলেছিল ফেলিস না, খেয়ে নে, খেয়ে নে, বিজুর মুখে তখন রসগোল্লা, সে মাথা নেড়েছিল। কেন নষ্ট করেছিল সে দিন। সেই একখানা লুচি এখন যদি পেতো...আর কোনোদিন সে লুচি খাবে না, ভাত খাবে না, কলমি শাক খেতে খেতে বমি করে মরে যাবে।

ঝপাস করে একটা শব্দ হলো। ননীপিসি ঝাঁপ দিয়েছে পুকুরে। উপুড় হয়ে ভাসছে, চুলগুলো কিলবিল করছে সাপের মতন, আর উঠছে না কেন, ননীপিসিও মরে গেল নাকি ? বিজু জানে, সাঁতার শিখলে কেউ জলে ডোবে না। উপুড় হয়ে নিশ্বাস নিচ্ছে কী করে ননীপিসি !

ভাসতে ভাসতে মাঝপুকুর পর্যন্ত গিয়ে ননীপিসি চিৎ হলো। চিৎ সাঁতার

কেটে ননীপিসি ফিরে এলো ঘাটের কাছে। কোমর জলে দাঁড়িয়ে আপন মনে ওঃ ওঃ শব্দ করছে। ননীপিসির কষ্ট হচ্ছে খুব। আজ সকালে বিজু পাশের বাড়িতে ঝগড়া শুনতে পেয়েছে, ননীপিসিকে কী জন্য যেন বকাবকি করছিল খুব ওর মা। এ গ্রামেও সবাই জেনে গেছে, ননীপিসিকে ওর স্বামী আর ফিরিয়ে নেবে না। সে দুর্গাপুরে চাকরি করে, মৃত সন্তানের জন্ম দেবার পর একবারও ননীপিসিকে দেখতে আসেনি।

এই ঘোর দুপুরে আর কেউ পুকুরে আসে না। ননীপিসি জলে দাঁড়িয়ে কাঁদছে একা একা। এক একবার ডুব দিলে উঠছে না অনেকক্ষণ। কেউ জল তোলপাড় করলে তখন আর মাছ ধরার কোনো আশাই থাকে না। বিজু এখন আর ফাৎনার দিকে তাকাচ্ছে না, ননীপিসিকে দেখছে। খিদের কথাটা এখন আর মনে করছে না। ননীপিসির মসৃণ ঘাড় আর কাঁধ, পাশ ফিরলে দেখা যায় দুধে ভরা দুই বুক। ননীপিসি লক্ষই করেনি বিজুকে।

একটু পরে ননীপিসি ঘাটের ওপরের সিঁড়িতে বসলো। ওখানে বাটনা বাটা শিলের চেয়ে একটু বড় একটা পাথর রাখা আছে। মেয়েরা ওই পাথরটায় আছড়ে কাপড় কাচে, অনেকে জল ভর্তি ঘড়া, রাখে, মাঝখানটায় একটু গর্ত মতন।

ননীপিসি সারা শরীর মুচড়ে মুচড়ে কাঁদছে তো কাঁদছেই। স্বামী না নিলে ননীপিসি কি সারাজীবন বাপের বাড়িতে থাকবে? ওর বাবা যে দারুণ কৃপণ সবাই জানে। ননীপিসিকে সবাই কষ্ট দেবে। ননীপিসির এত বড় শরীর, আস্তে আস্তে রোগা হয়ে যাবে। ঘোষেদের বাড়ির চারুপিসিকেও তার স্বামী নেয় না, তার খুব শুচিবাই, সবাইকে গালাগালি করে, এমনকি বাতাসকেও বকুনি দেয়। ননীপিসিও কি সেইরকম...

বিজু দারুণ চমকে উঠে দেখলো ননীপিসি আঁচল সরিয়ে নিজের একদিকের বুক চেপে ধরলো এক হাতে। তারপর সেই বুক থেকে ছরছরিয়ে ঝরে পড়তে লাগলো দুধ। ননীপিসি নিজের বুকের দুধ ফেলে দিচ্ছে। একবার এই বুক, একবার আর এক বুক। চোখ ঠিকরে আসছে বিজুর।

পাথরের খোঁদলে ঝরে পড়ছে সেই বুকের দুধ।

একটু পরে থেমে ননীপিসি এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো পাথরটার দিকে। আর একটু কেঁদে উঠে দাঁড়ালো।

বিজুর মনে পড়ে গেল ভুলি কুকুরটার কথা। সেটা যদি আশেপাশে থাকে,

অমনি এসে চকাস চকাস করে ওই দুধটুকু চেটে খেয়ে নেবে। ননীপিসি ঘাট থেকে চলে যেতেই বিজু আর দেরি করলো না। ছিপ ফেলে রেখে দৌড়ে সেখানে গিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো। জিভ দিয়ে চাটতে লাগলো সেই দুধ। নোনতা নোনতা লাগছে, তবু যেন তার শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে।

একটা শব্দ পেয়ে মুখ তুলে দেখলো। ননীপিসি ফিরে এসে বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে আছে তার দিকে। কুকুর হয়ে গেছে বিজু। এ তো ভিক্ষের চেয়েও খারাপ। ধরা পড়া চোরের মতন সে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে বলতে লাগলো, আমার খুব খিদে পেয়েছে, আমি মরে যাচ্ছি, আমি মরে যাচ্ছি।

ননীপিসি কাছে এসে বসে পড়লো। যেন আগের কথাটা শুনতে পায়নি। সেইরকম ভাবে জিজ্ঞেস করলো, তোর কী হয়েছে রে, বিজু ?

বিজুর ঠোঁটে লেগে আছে দুধ। সে আবার বললো, আমি কিছু খাইনি, খিদেয় আমি মরে যাচ্ছি, এবার ঠিক মরে যাবো।

ননীপিসির নিজেরই এখন খুব কষ্ট। অন্যের দুঃখের দিকে মন দেবার সময় নেই। তবু সে বললো, কেন, কিছু খাসনি কেন ?

বিজু বললো,আমাদের কিছু নেই।

ননীপিসি বললো, আয়, আমাদের বাড়িতে আয়, এক বাটি মুড়ি দেবো এখন।

বিজু প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বললো তোমার বাবা বকবে। আমার মা-ও বকবে আমাকে।

ননীপিসি করুণ চোখে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলো বিজুর দিকে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বুকের আঁচলটা আবার সরিয়ে বললো, খিদে পেয়েছে, খা !

বাসনা

মাদারিপুর শহর থেকে পিতার সঙ্গে বাড়ি ফিরছে মহাদেব ঘোষাল। ব্রিটিশ আমলের পূর্ববঙ্গ, এই সব অঞ্চলে ট্রেন লাইন তো নেই-ই, বাসও চলে না, বর্ষাকালে নৌকোপথেই যাতায়াত করতে হয়। গ্রীষ্মকালে পায়ে হাঁটা বা গরুর গাড়ি। ঘোষালদের নিজস্ব নৌকো ও গরুর গাড়ি দুই-ই আছে। মহাদেব ঘোষাল কলকাতায় পড়াশুনো করে। বিএ পরীক্ষা দিয়ে সদ্য আবার গ্রামে ফিরেছে, তার বাবা তাকে বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপার বুঝিয়ে দিচ্ছেন। মাদারিপুর যেতে হয়েছিল জমি-জমা সংক্রান্ত একটি মামলার তদারক করতে।

নৌকোটি বেশ প্রশস্ত, ঠিক বজরা নয়, মাঝের অংশটি ছই-ঘেরা। আকাশ মেঘলা, গরম তেমন নেই, তাই মহাদেবের বাবা জগদিন্দ্র ঘোষাল ছই-এর বাইরে একটি বেতের চেয়ারে বসে হুঁকো টানছেন। কোঁচানো ধুতির ওপর হলুদ বেনিয়ান পরা, মাথার চুল তেল চুকচুকে, প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স হলেও জগদিন্দ্র ঘোষালের চুল পাকেনি, বেশ বলিষ্ঠ চেহারা, নাকের নীচে পাকানো গোঁফে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, চোখের দৃষ্টি দেখলেই বোঝা যায়, কিছু মানুষের ওপর আধিপত্য করাই তাঁর স্বভাব।

মহাদেব নবীন যুবক, ফর্সা দোহারা চেহারা, চুলে অ্যালবার্ট কাটা। ধুতির ওপর হাফ শার্ট পরে আছে, হাতে ঘড়ি। চটি খুলে সে নৌকোর গলুইতে বসে জলে পা ডুবিয়ে আছে। এ নদীতে কখনও সখনও কুমির দেখা যায় বটে, কিন্তু নৌকো থেকে মানুষ টেনে নেবার মতো ঘটনা কখনও শোনা যায়নি।

আড়িয়াল খাঁ নদীতে খানিকটা যাবার পর নৌকো একটা খালে ঢুকল। ঘোষালদের গ্রাম খুব বেশি দূরে নয়। খালপথে খানিকটা যাবার পর সোনাদিঘির

বাঁধ। সোনাদিঘি এক মস্ত বড় জলাশয়। প্রায় একটা হ্রদের মতন। এই দিঘির গা ঘেঁষে খালটা চলে গেছে, কিন্তু খালের জল আর দিঘির জল যাতে মিশে না যায়, সেই জন্য এক জায়গায় বাঁধ দেওয়া আছে। প্রয়োজনে সেই বাঁধ খোলাও যায়, সেইখান দিয়ে নৌকো ঢোকে দিঘিতে।

এই দিঘিতে অনেকগুলি ঘাট, এক একটি বাড়ির নিজস্ব। কারও ঘাট বেশ বড় করে বাঁধানো, সিঁড়ি ও দুপাশে বসবার জায়গা, কারও ঘাটে শুধুই কয়েকটি তালগাছের গুঁড়ি ফেলা। বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর, কোনও ঘাটে জেলেরা জাল ফেলে মাছ ধরছে, কোনও ঘাটে স্নান করছে নারী পুরুষ। স্ত্রীলোকেদের জন্য আলাদা ঘাট নেই, তবে পুরুষ ও নারীরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে স্নান করতে আসে, যেন একটা অলিখিত নিয়ম আছে।

চক্রবর্তীদের ঘাটে এখন শুধু মেয়েরা স্নানে নেমেছে। বিভিন্ন বয়সের সাত-আটজন। মহাদেব জল থেকে পা তুলে উঠে দাঁড়িয়েছে, জগদিন্দ্র ঘন ঘন হুঁকোয় টান দিচ্ছেন, একটু দূরেই দেখা যাচ্ছে ঘোষালদের ঘাট, সেখানে দাপাদাপি করছে কয়েকটি কিশোর। মেয়েদের স্নানের দৃশ্যে পুরুষদের তাকাতে নেই। ব্লাউজ বা সায়া সেমিজ পরে মেয়েরা স্নান করতে আসে না, শুধু গায়ে একটি শাড়ি জড়ানো থাকে। জলে ভিজলে শরীরের রেখা স্পষ্ট হয়ে যায়, সুতরাং সেদিক থেকে পুরুষদের মুখ ফিরিয়ে রাখাই নিয়ম। তবে, আড়চোখে দু-একবার দেখবে না, এমন পুরুষও এ জগতে দুর্লভ।

জগদিন্দ্র, মহাদেব ও এই নৌকোর দাঁড়ি-মাঝি সকলেই চক্রবর্তীদের ঘাটের দিকে বেশ কয়েকবার চকিতে দৃষ্টিপাত করল। তার কারণ, সেখানে এক যুবতীকে দেখা যাচ্ছে, যাকে কেউ চেনে না। নতুন মুখ। কোমর জলে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি, অন্যদের থেকে একটু আলাদা হয়ে। ষোড়শী বা সপ্তদশী হবে, বেশ স্বাস্থ্যবতী, এরই মধ্যে মাথার ঘন চুল চোখে পড়ার মতন, সেই চুলের পটভূমিকায় মুখখানি দেখলে রজনীগন্ধা ফুলের কথা মনে পড়ে।

জগদিন্দ্র তাঁর গোমস্তা হরিচরণকে জিজ্ঞেস করলেন, ওই ছেমরিটা কে?

হরিচরণ দু দিকে মাথা নেড়ে বললেন, জানি না।

দুই

মহাদেব ঘোষালের বিয়ের সম্বন্ধের জন্য ঘটকদের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে। এর মধ্যে পাত্রী দেখাও হয়ে গেছে তিন জায়গায়। মহাদেবের বয়স শিগগিরই তেইশ হবে। আর অপেক্ষা করা যায় না। জগদিন্দ্রর ইচ্ছে, তাঁর জ্যেষ্ঠ

সন্তান গ্রামে থেকে বিষয়-সম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধি ঘটাবে। মহাদেব কলকাতা শহরের স্বাদ পেয়েছে, সে তার মাকে চুপি চুপি জানিয়ে রেখেছে যে, তার ইচ্ছে কলকাতায় গিয়ে চাকরি নেবে। কলকাতায় একটা আশ্রয়স্থল থাকলে ছোট ভাইবোনেরা সেখানে গিয়ে পড়াশুনো করতে পারবে। তার কাকা বিনয়েন্দ্র জমিদারির কাজ ভাল বোঝেন, তিনিই এখানকার সব কিছু দেখাশুনো করতে পারবেন। তাছাড়া জগদিন্দ্রর স্বাস্থ্য এখনও যথেষ্ট ভাল আছে। অন্য কারও ভার নেবার প্রশ্নই ওঠে না আপাতত। প্রজারা জমিদারবাবু বলে সম্বোধন করলেও ঘোষালদের জমিদারি এমন কিছু বড় নয়। লাঠিয়াল নেই, বন্দুক পিস্তলও নেই।

আরও দুটি পাত্রী দেখা হল, পছন্দ আর হয় না কিছুতেই। একটি মেয়েকে যদি বা কিছুটা চোখে ধরেছিল, কুষ্ঠি মিলিয়ে দেখা গেল, দুজনের একই রাশি। তা হলে তো আর প্রশ্নই ওঠে না।

চক্রবর্তীদের ঘাটের সেই তরুণীটি জলকন্যার মতন অদৃশ্য হয়ে যায়নি, তাকে চর্মচক্ষে আরও কয়েকবার দেখা গেছে। দিগম্বর চক্রবর্তীর বোন কিরণময়ীর বিয়ে হয়েছিল পাবনাতে, সম্প্রতি বিধবা হয়ে সে তিনটি সন্তান নিয়ে ফিরে এসে পিত্রালয়ে। তার বড় মেয়েটির নাম পুষ্পময়ী। স্নানের ঘাটে সেই কন্যাকে দেখার পর থেকে মহাদেবের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটেছে, নানা ছুতোয় সে চক্রবর্তীদের বাড়ির পাশ দিয়ে দিনে দু-তিনবার হেঁটে যায়। কিন্তু তার এই দুর্বলতার কথা সে মা-বাবার কাছে কিছুতেই প্রকাশ করতে পারবে না, এরকম বেয়াদপ্পি ঘোষালবংশে কেউ কখনও করেনি।

মহাদেবের মা ছেলের বিয়ের জন্য উতলা হয়েছিলেন, পুষ্পময়ীর কথা তাঁরও কানে গেল। মেয়েটির শশীকলার মতন রূপ আছে তো বটেই, পাবনার স্কুলে সে ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছে, রবি ঠাকুরের কবিতা মুখস্থ বলতে পারে, গানের গলাটিও বেশ। পাত্রী হিসেবে একেবারে আদর্শ বলা যেতে পারে। মহাদেবের মাকে পড়শিনীরা জনে জনে এসে বলে যেতে লাগল, ঘরের কাছেই এত ভাল মেয়ে থাকতে মহাদেবের জন্য আর পাঁচ জায়গায় পাত্রী খোঁজাখুঁজি করার দরকার কী? মহাদেবের মা দ্রবময়ীও একদিন চক্রবর্তীদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে মেয়েটিকে দেখলেন, তার সহজ-সরল ব্যবহার দেখে মুগ্ধ হলেন, তার মুখে 'হৃদি বৃন্দাবনে বাস' গানটি শুনে বললেন, আহা কলের গানও এত মিষ্টি শোনায় না।

কিন্তু বাধা আছে কয়েকটা। দিগম্বর চক্রবর্তী তার বিধবা বোনকে পুত্রকন্যা সমেত আশ্রয় দিতে পারে বটে, কিন্তু ভাগনির বিয়েতে টাকাপয়সা বিশেষ খরচ করতে পারবে না। মহাদেব বিএ পাস পাত্র, তার জন্য যে-কোনও মেয়ের বাপই

বিশ-পঁচিশ ভরি সোনার গয়না দিতে প্রস্তুত, তার ওপর পণের টাকা তো আছেই। দরাদরি করেও হাজার পাঁচেক পাওয়া যাবেই, সে সব কি ছাড়া যায় ? জগদিন্দ্র রাজি না হলেও দ্রবময়ীর এতই পছন্দ হয়েছে মেয়েটিকে যে তিনি ওসব ছাড়তেও রাজি। এর পরেও বিভিন্ন দূত মারফত জানা গেল যে পুষ্পময়ীর মা এই মেয়ের বিয়ের জন্য পনেরো ভরির গয়না আলাদা করে রেখেছেন, প্রণামীর কুড়িখানা শাড়ি ধরা আছে, পণের টাকাও হাজার দু-এক জোগাড় করা যাবে, পঞ্চাশজন বরযাত্রী খাওয়াবার ব্যবস্থা হবে। আর কী চাই ? দ্রবময়ী স্বামীকে ধরে বসলেন, তুমি রাজি হয়ে যাও !

জগদিন্দ্র রাজি নন। দ্বিতীয় বাধাও আছে। দিগম্বর চক্রবর্তীর বোনের বিয়ে হয়েছিল ভট্টাচার্য পরিবারে। ভট্টাচার্যরা ব্রাহ্মণ হলেও ঘোষালদের সমতুল্য নয়। দিগম্বর চক্রবর্তী নিজেই ভঙ্গকুলীন, তাদের সঙ্গে ঘোষালদের বিবাহ-সম্পর্ক হয় না।

দ্রবময়ী এই বাধাটিকেও গুরুত্ব দিলেন না। ছেলে যে কলকাতা শহরে নিয়ে হুট করে নিজের পছন্দ মতন কোনও খেঁদি-পেঁচিকে বিয়ে করে আসেনি, সেই তো যথেষ্ট। ভঙ্গকুলীন নিয়ে অত খুঁতখুঁতুনি আর এ যুগে চলে না। জগদিন্দ্রর আপন জ্যাঠা তাঁর এক মেয়েকে ভঙ্গকুলীনের ঘরে বিয়ে দিয়েছেন, তা মনে নেই ?

জগদিন্দ্র তবু দৃঢ়ভাবে দু দিকে মাথা নাড়ালেন।

ইতিমধ্যে চারি চক্ষুর মিলন ঘটে গেছে। একবার চক্রবর্তীদের বাড়ির পিছনের সুপুরি বাগানে, কোনও কথা হয়নি অবশ্য, দু জনেরই বুক ধক ধক করেছিল। আর একবার সীতাপতি রায়ের বাড়িতে সত্যনারায়ণের সিন্নির দিনে। গ্রামসুদ্ধু সবার নিমন্ত্রণ ছিল, মহাদেব পুষ্পময়ীর খুব কাছে চলে এসেছিল, এত কাছে যাতে ওর শরীরের ঘ্রাণ পাওয়া যায়, তবু কথা বলতে পারেনি। পুষ্পময়ী চোখ তুলে তাকিয়েছিল, সে দৃষ্টিতে ঝরে পড়ছিল কোমল আলো।

সোনালি স্বপ্ন বুনতে শুরু করেছিল মহাদেব। কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে বাড়ি ভাড়া নেবে মহাদেব, সে বাড়ির সঙ্গে একটা বাগান থাকবে। সওদাগরি অফিসের চাকরি সেরে প্রতিদিন সন্ধের আগে বাড়ি ফিরে আসবে মহাদেব, বাগানে দাঁড়িয়ে থাকবে পুষ্পময়ী, বনদেবীর মতন দুহাত বাড়িয়ে তাকে অভ্যর্থনা করবে...। মহাদেব জানে, মায়ের যখন পছন্দ হয়েছে, তখন আর মহাদেবকে মুখ ফুটে কিছু বলতে হবে না। বাবা বাইরে যতই প্রতাপ দেখান, অন্দরমহলে মায়ের কাছে তাঁর বিশেষ জারিজুরি খাটে না।

কিন্তু জগদিন্দ্র ঘোষাল আপত্তিতে অনড় হয়ে রইলেন। শুধু তাই নয়, এর

মধ্যে কারুকে কিছু না জানিয়ে তিনি কোটালিপাড়া গ্রামে গিয়ে এক চাটুজ্যেবাড়ির মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ের পাকা কথা দিয়ে এলেন। চাটুজ্যেরা বেশ গরিব, চোদ্দ ভরির বেশি সোনা দিতে পারবে না, পণ মাত্র তিন হাজার। প্রণামী দশখানা, সে মেয়েও এমন কিছু ডানাকাটা পরী নয়।

পাকা কথা দিয়ে এসেছেন, তার ওপর কোনও কথা চলে না। মহাদেব কাঁদল, দীর্ঘশ্বাস ফেলে খালপাড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল, তবু বাবার ইচ্ছের প্রতিবাদ করতে পারল না। জগদিন্দ্রর জেদ বজায় রইল, সতেরো দিনের মাথায় মহাদেবের সঙ্গে বীণাপাণির পরিণয় সম্পন্ন হয়ে গেল।

সকলেই আড়ালে বলতে লাগল, বীণাপাণির চেয়ে পুষ্পময়ীর সঙ্গেই মহাদেবকে মানাত ভাল। বীণাপাণির গায়ের রঙ মাজামাজা হলেও চোখ দুটো ছোট, সে কখনও প্রাণ খুলে হাসে না, কারণ সে বেচারির ডানপাশের একটা দাঁত ভাঙা, সেই ভাঙা দাঁত দেখাতে সে লজ্জা পায়। গয়না বা টাকাও বেশি পাওয়া যায়নি, তবু পুষ্পময়ীকে বাদ দিয়ে ওই চাটুজ্যেবাড়ির মেয়েকে বউ করে আনার জন্য জগদিন্দ্র কেন জেদ ধরে রইলেন, তা বোঝা গেল না, সেটা রহস্যই রয়ে গেল।

আসল কারণটা জগদিন্দ্র ছাড়া কেউ কোনওদিনই জানবে না।

সেই প্রথমদিনে নৌকো করে আসার সময় সোনাদিঘিতে চক্রবর্তীদের ঘাটে নতুন মেয়েটিকে দেখে সহসা মুগ্ধ হয়েছিলেন জগদিন্দ্র। এক কোমর জলে দাঁড়ানো সেই কন্যার ঝলমলে যৌবনের দিকে কয়েক পলক তাকিয়েই জগদিন্দ্র কামমোহিত হয়েছিলেন, তাঁর পৌরুষ দপ করে জ্বলে উঠেছিল। তা মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য। জগদিন্দ্র মান্যগণ্য ব্যক্তি। পরের বাড়ির কুলবালার প্রতি কুনজর দেওয়া তাঁকে মানায় না। কাম প্রবৃত্তি বশে সজ্ঞানে পরনারী হরণ করাও তাঁর স্বভাব নয়। ব্রাহ্মণ পরিবারে একাধিক বিবাহ করা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার, তাঁর বাপ-জ্যাঠার তিনটি করে স্ত্রী ছিল, কিন্তু জগদিন্দ্র সে চিন্তা কখনও মনে স্থান দেননি। কিন্তু কোনো নারীকে দেখে মুগ্ধ হওয়াটা তো দমন করা যায় না। শরীর যদি উত্তেজিত হয়, সেটাও শরীরের ধর্ম। তবু শরীরের তাড়নায় জোর করে সেই নারীকে ভোগ করার জন্য কখনও ছুটে যাননি জগদিন্দ্র, কেউ তাঁকে বর্বর, লম্পট বলতে পারবে না।

যে যুবতীকে দেখে তিনি মনে মনে কামবোধ করেছিলেন, তাঁকে কি নিজের পুত্রবধূ করে ঘরে আনা যায়? বাড়ির মধ্যে ঘুরতে ফিরতে তাকে দেখা যাবেই, যদি আবার বিচলিত হয় শরীর? পুত্রবধূ তো কন্যাসমা, কিন্তু পুষ্পময়ীকে সেই চক্ষে দেখেননি জগদিন্দ্র। না, ও মেয়েকে বাড়িতে আনা চলে না। মাঝে মাঝে

তামাক টানতে একলা একলা বসে অন্যমনস্ক হয়ে যান। লজ্জায়, অনুতাপে, ধিক্কারে তাঁর মন ভরে যায় তখন। তিনি নিজেও খুব ভালই বুঝেছিলেন যে ওই পুষ্পময়ীর সঙ্গেই মহাদেবের বিয়ে দিলে অনেক ভাল হত। রাজযোটক হত তাঁর নিজের দোষেই তা হতে পারল না

তিন

মহাদেবের বিয়ের দেড়মাস পরেই পুষ্পময়ীরও বিয়ে হয়ে গেল এক স্কুল মাস্টারের সঙ্গে। ছেলেটির নাম ভবানীপ্রসাদ, বাড়ি কুমিল্লায়, এই গ্রামে সে এসেছিল তার দিদিকে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিতে। ভবানীপ্রসাদের সঙ্গে পুষ্পময়ী চলে গেল কুমিল্লায়, যাবার সময় সে খুব কেঁদেছিল। তাদের নৌকো যখন সোনাদিঘি ছেড়ে যায়, সেই সময় ঘোষালদের ঘাটে দাঁড়িয়েছিল মহাদেব। পাথরের মূর্তির মতন স্থির। দুজনেরই শরীর থেকে বেরিয়ে বিদেহী আত্মার মতন তাদের বাসনা জড়াজড়ি করে রইল শূন্যে।

কলকাতা শহরে আর যাওয়া হল না মহাদেবের, হঠাৎ শুরু হয়ে গেল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। তখন শহর ছেড়ে অনেকেই গ্রামে পালাচ্ছে। মহাদেব ঘোষাল মাদারিপুর ট্রেজারিতে একটা চাকরিও পেয়ে গেল। বীণাপাণিকে স্ত্রী হিসেবে পেয়ে কি অসুখী হয়েছে মহাদেব ঘোষাল? তা ঠিক বলা যাবে না। স্বামীর সেবাযত্নে বীণাপাণির কোন ত্রুটি নেই। সে ভাল লেখাপড়া জানে না, বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস পড়তে গেলে মানে বোঝে না, মহাদেব শেকসপিয়র আবৃত্তি করে শোনালে সে হাঁ করে চেয়ে থাকে, সে গানও জানে না, কিন্তু তার রান্নার হাত চমৎকার। অচিরেই সে সুগৃহিণী হিসেবে এই সংসারে নিজের গুরুত্ব প্রমাণ করল। পর পর তিনটি সন্তানের জন্ম দিল সে।

মহাদেব মাদারিপুরে বাসা ভাড়া করে একলা থাকে, সপ্তাহান্তে বাড়িতে আসে। কিন্তু পুষ্পময়ীকে নিয়ে দেখা তার সোনালি স্বপ্নটা কিছুতেই মুছে যায় না। ভবানীপুরের সেই কল্পিত বাড়িটি সে এখনও দেখতে পায়, সেখানে বাগানের ঘন গাছপালার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে পুষ্পময়ী, দুটি হাত বাড়িয়ে তাকে ডাকছে।

অফিসের কাজে তাকে একবার যেতে হয়েছিল কুমিল্লায়। ইস্কুলমাস্টার ভবানীপ্রসাদের বাড়ি খুঁজে বার করা এমন কিছু কঠিন নয়। দুজনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। এখন দেখা সাক্ষাতে কোনও দোষ নেই। গ্রাম সম্পর্কে কুটুমের বাড়িতে তো লোকে যায়ই। মহাদেব তবু গেল না। পুষ্পময়ীকে পরস্ত্রী হিসেবে সে কিছুতেই সহ্য

করতে পারবে না। ডাকবাংলায় সারা রাত তার ঘুম এল না। ছটফট করল বিছানায়। বালিশে মুখ গুঁজে সে ফিসফিস করে ডাকতে লাগল, পুষ্পময়ী, পুষ্পময়ী!

পুষ্পময়ী সম্পর্কে আকর্ষণের এই তীব্রতায় নিজেই অবাক হয়ে যায় মহাদেব। বিয়েটা নিয়তিব ব্যাপার। যার সঙ্গে যার কপালের লেখা থাকে, তার সঙ্গেই বিয়ে হয়।

পুষ্পময়ীকে ভাল লেগেছিল, কিন্তু কপালে নেই। তাকে স্ত্রী হিসেবে পাবে কী করে? তার নিজের স্ত্রী এখন গর্ভবতী। পুষ্পময়ীর সঙ্গে হয়তো আর কোনওদিনই দেখা হবে না। তবু মনে পড়ে। তার কথা কেন এত মনে পড়ে?

পুষ্পময়ীর জীবনও সুখের হল না। ভবানীপ্রসাদের সংসারটি সচ্ছল নয়, তাও পুষ্পময়ী মানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু তার স্বামীটি একেবারেই রসকষহীন। ভবানীপ্রসাদ বেশি কথা বলে, সর্বক্ষণ কথা বলে, অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কথা বললেও সে কিছুতে থামতেই চায় না। সে গানবাজনার ধার ধারে না। ইস্কুলে সে অঙ্ক পড়ায়, বাড়িতেও সে দু-চার পয়সা খরচ করতে হলেও অঙ্ক কষে। অন্যদিক দিয়ে অবশ্য মানুষটি খারাপ নয়। মায়া দয়া আছে, সচ্চরিত্র। পুষ্পময়ীর অসুখী হবার কারণটি তার নিজস্ব।

সবাই ধরেই নিয়েছিল, মহাদেবের সঙ্গে তার বিয়ে হবে। তার এক মামাতো বোন বলেছিল, তুই কী ব্রত করেছিলি রে পুষ্প, একেবারে সাক্ষাৎ মহাদেবের মতন স্বামী পাবি! মহাদেবের সঙ্গে সামনাসামনি কখনও কথা বলেনি পুষ্পময়ী, দূর থেকে অনেকবার দেখেছে। সুন্দর, স্বাস্থ্যবান পুরুষ, গম্ভীর, লেখাপড়া জানার ছাপ আছে তার মুখে। একদিন দুপুরে সে দেখেছিল, মহাদেব একটা আমলকি গাছতলায় দাঁড়িয়ে আপনমনে কবিতা আবৃত্তি করছিল: 'কে যেন আমারে এনেছে ডাকিয়া ভুলে...'। দূর থেকে দাঁড়িয়ে পরম তৃষিতের মতন শুনেছিল পুষ্পময়ী। সেদিনই সে মহাদেবকে মনপ্রাণ সমর্পণ করেছিল। সেই মানুষটি তাকে এতবড় আঘাত দিল? তার বাবা অন্য জায়গায় বিয়ে ঠিক করলেও সে একবারও প্রতিবাদ করল না? যাক, যা হয়ে গেছে, তা তো আর ফেরানো যাবে না! হিন্দুর ঘরে মেয়ে হয়ে জন্মেছে, যে পুরুষ সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছে, তার সঙ্গেই সারা জীবন কাটাতে হবে। গর্ভে ধারণ করতে হবে তাব সন্তান।

বিয়ের পর পরপুরুষের কথা চিন্তা করতে নেই। পুষ্পময়ীও মহাদেবকে মন থেকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করলো। শুধু অপমানের কাঁটাটা বুকে বাজে। মহাদেব ঘোষাল তাকে অবহেলা করে অন্য নারীকে স্ত্রী হিসেবে বরণ করে নিল বাপের সুপুত্র হয়ে? না, ও নাম আর সে মনে করবে না।

কিন্তু মনকে শাসন করার কোনও উপায় আজ অবধি বেরিয়েছে কি ? এমন একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটল যাতে পুষ্পময়ী ভয়ে কেঁদেকেটে অস্থির। বিয়ের কয়েকদিন পরে, স্বামী-স্ত্রী মিলিত হয়েছে, ঘর অন্ধকার, সেই রতিক্রীড়ার সময় পুষ্পময়ীর হঠাৎ মনে হল, ভবানীপ্রসাদ নয়, যেন মহাদেব ঘোষাল তার সঙ্গে সঙ্গম নিরত। অন্ধকারেও পুষ্পময়ী স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তার মুখ !

একথা কি কাবুকে বলা যায় ? ছি ছি, কী পাপ, কী পাপ ! পুষ্পময়ী নিভৃতে কেঁদে ভাসাল, দেয়ালে মাথা ঠোকে। তবু এর পরেও আর একদিন, অবিকল সেইরকম, তার বুকের ওপর ভবানীপ্রসাদের বদলে সে দেখতে পায় মহাদেবকে। ভবানীপ্রসাদ ফিসফিস করে কী সব বলছে, অথচ পুষ্পময়ী শুনতে পাচ্ছে মহাদেবের কণ্ঠস্বর !

পুষ্পময়ী লজ্জা, আত্মগ্লানি, অপরাধবোধে একা একা ভোগে। তার আর একটা ভয় হল, এরপর যদি তার একটি ছেলে জন্মায়, যদি তার মুখে মহাদেবের আদল আসে ? যে আসবে, সে কি মহাদেবেরই সন্তান হবে ? এই লজ্জা থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায় আত্মহত্যা।

যথাসময়ের একটু আগেই পুষ্পময়ীর সন্তান প্রসব হল, ছেলে নয়, মেয়ে। পুষ্পময়ীর আর আত্মহত্যা করা হল না। তার পাপ গোপনই রয়ে গেল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার এক বছর পরেই শুরু হয়ে গেল দাঙ্গা। তারপর খুব হুড়োহুড়ি করে দেশবিভাগ ও স্বাধীনতা। কারা কোথায় বসে কোটি কোটি মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলে দেশ ভাগ করল, তা এই সব গ্রামের মানুষ কিছু জানলই না। দেশ বিভাগ এমনকি স্বাধীনতারও তাৎপর্য প্রথম প্রথম বোঝা যায়নি। চতুর্দিকে নানারকম গুজব। কারা যেন রটিয়ে দিতে লাগল, পূর্ববাংলা এখন পাকিস্তান, এটা মুসলমানদের দেশ হয়ে গেছে। এখানে হিন্দুরা আর থাকতে পারবে না। তাই শুনে জগদিন্দ্র ঘোষাল চোটপাট করে বলেন, কী, আমাদের সাতপুরুষের বসতবাড়ি, এখান থেকে কে আমাদের তাড়াবে ? আসুক দেখি ! কয়েকখানা বর্শা ও একটা তলোয়ার আছে বাড়িতে, তিনি সেগুলোকে শান দিতে লাগলেন। স্বাধীনতার পরে দাঙ্গা আরও বেড়ে গেল। পশ্চিমবাংলায়, বিহারে দাঙ্গা হয়, তার প্রতিক্রিয়া শুরু হয় পূর্ব পাকিস্তানে। শহর থেকে ক্রমশ দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল গ্রামে। বাইরে থেকে একদল দাঙ্গাকারী যখন এ গ্রামে হামলা করতে এল, স্থানীয় মুসলমানরাই ঘোষালদের বাড়ি ঘিরে রক্ষা করল।

দূর-দূরান্ত থেকে নানারকম খবর আসে। কুমিল্লার ভয়াবহ দাঙ্গার খবর শুনে মহাদেব দারুণ আশঙ্কায় মুষড়ে পড়ে। পুষ্পময়ীরা কেমন আছে ?

মহাদেবের ইচ্ছে করে কুমিল্লায় ছুটে যেতে। যাওয়া হয় না অবশ্য। কয়েক বছর টিকে থাকার পর পঞ্চাশ সালে অবস্থা মারাত্মক হল। গ্রামের শুভার্থী মুসলমানরাই একদিন জগদিন্দ্র ঘোষালকে বলল, কর্তা, আর বুঝি ঠেকানো যায় না। কারা গ্রামে গ্রামে আগুন ছড়াচ্ছে বুঝি না—চক্রবর্তীরা, রায়েরা, ব্যানার্জিরা, চৌধুরিরা এর মধ্যেই বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। গ্রাম প্রায় ফাঁকা। প্রতি রাতেই দূরে দূরে দেখা যায় আগুনের শিখা, মানুষের গর্জন আর আর্ত চিৎকার। আর ভরসা করা যায় না। একদিন সকালে দুটি বড় বড় নৌকোয় জিনিসপত্র ও কাচ্চাবাচ্চা সমেত তেরো জনকে তুলে ঘোষাল পরিবার পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে পাড়ি দিল অনিশ্চয়তার দিকে। সোনাদিঘির বাতাস ভরে রইল কান্নায়।

জগদিন্দ্রর ছোট ভাই বিনয়েন্দ্র শুধু রয়ে গেলেন। তিনি বিয়ে করেননি, তিনি বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে রাজি নন। মরতে হয়, এখানেই মরবেন।

নৌকো দুখানি শেষ পর্যন্ত কলকাতায় পৌঁছতে পারল না। লুট হয়ে গেল মাঝপথে। তখনকার মতন সবাই প্রাণে বাঁচলেও বেনাপোলে এসে কলেরায় মারা গেল মহাদেবের একটি ভাই। ভারতের মাটিতে পা দেবার পরেও মহাদেব দেখল, তার সামনে গভীর অন্ধকার।

চার

রিফিউজি কলোনিতে কিছুতেই থাকতে রাজি নন জগদিন্দ্র ঘোষাল। বারো জাতের লোকের সঙ্গে মিশে, সরকারের অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে ভিখিরিদের মতন লাইনে দাঁড়িয়ে ডোল নিতে হবে, এর চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। হুণ্ডি করে আগে থেকে দু হাজার টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, লুটপাট হবার পরেও বীণাপাণি কিছু গয়না বাঁচিয়ে রেখেছে, তা দিয়ে যে কটা দিন ভদ্রলোকের মতন বাঁচা যায় বাঁচবে। তারপর সবাই মিলে গলায় দড়ি দেবে।

ভবানীপুরের সেই বাগানওয়ালা স্বপ্নের বাড়ি নয়। দুখানা মাত্র ঘর ভাড়া নেওয়া হল নারকলডাঙায়। পাকা বাড়ি, ওপরে টালির ছাদ, পাশেই বিশাল বস্তি। লোকসংখ্যা যেমন হু হু করে বাড়তে কলকাতায়, তেমনই বাড়ছে বাড়ি-ভাড়া। নারকেলডাঙার এই বাড়িটাতে আরও তিনটি পরিবার ভাড়া থাকে, একটিমাত্র টিউবওয়েল, জলের জন্য প্রতিদিন ঝগড়া হয়।

সাড়ে তিন মাস ঘোরাঘুরি করার পর অতি কষ্টে একটা চাকরি জোগাড় করল মহাদেব ঘোষাল, মার্চেন্ট অফিসে কেরানিগিরি, একশো বত্রিশ টাকা মাইনে। পাঁচটি ভাইবোন, নিজের তিনটি ছেলেমেয়ে, মা-বাবা, স্ত্রী, এতগুলি

মানুষের সংসার। জমানো টাকা এর মধ্যেই প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, বাড়ি ভাড়া পঁয়তাল্লিশ টাকা। বাকি টাকা দিয়ে সংসার চালাতে হবে। মাথা উঁচু করে, বংশমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে এরকম অনেক পরিবারই বেশিদিন টিকতে পারেনি। নীচে নেমে গেছে। দারিদ্র্য বড় চরিত্র নষ্ট করে দেয়। এসব পরিবারের ছেলেরা ছিঁচকে চোর কিংবা গুণ্ডা মাস্তান হয়ে যায়। রাজনৈতিক নেতার আশ্রয়পুষ্ট হয়ে খুন-টুন করতেও শেখে, বোমা-পাইপগান তৈরিতে হাত পাকায়। মেয়েগুলো রাতারাতি নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু মহাদেব প্রথমেই একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, একবেলা না খেয়ে থাকবে তবু সই, কিন্তু ছেলে-মেয়েদের কিছুতেই অধঃপাতে যেতে দেবে না। এই অচেনা জায়গায় নির্বান্ধব পরিবেশে সসম্মানে টিকে থাকার একটা উপায় আছে, লেখাপড়া শিখতে হবে, লেখাপড়া শিখে অন্যদের ওপর টেক্কা দিতে হবে।

কঠোর শাসন প্রবর্তন করল মহাদেব। ইস্কুলে যাওয়া ছাড়া কেউ যখন তখন বাড়ি থেকে বেরুতে পারবে না। বস্তির ছেলেদের সঙ্গে মিশতে পারবে না। প্রত্যেকদিন সন্ধেবেলা সে নিজে তাদের পড়াশুনো দেখবে। একটা চাবুক জোগাড় করে রেখেছে। অবাধ্য সন্তানদের সে চাবুক মারতেও দ্বিধা করে না। ভাইবোনরাও তাকে যমের মতন ভয় পায়।

এত শাসন সত্ত্বেও মহাদেবের একটা বোন পালিয়ে গেল বস্তির এক ড্রাইভারের সঙ্গে। দুটি বোনই বিবাহযোগ্যা, তার মধ্যে ছোট বোনটাই এই কীর্তি করল। অন্য বোনটির বিয়ে দেবার সামর্থ্য নেই। সবাই তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন হয়েছে মহাদেবের বাবা জগদিন্দ্র ঘোষালের। অত দোর্দণ্ডপ্রতাপ মানুষটি একেবারে চুপসে গেছেন, ছ মাসের মধ্যেই রোগা হয়ে গেছেন দারুণ, কথাবার্তাও প্রায় বলেন না। তাঁর মেয়ে কোন অজাত-কুজাতের সঙ্গে পালাল, তা নিয়ে তর্জন-গর্জন না করে তিনি নিঃশব্দে কাঁদলেন কয়েকটা দিন। দুটি মাত্র ঘরে এতজনের ঠাসাঠাসি, তিনি সারাদিন বাড়ির বাইরের রকে বসে থাকেন। তামাক খাওয়া বন্ধ, তাঁরই বয়সী আর একজন বৃদ্ধ তাঁকে মাঝে মাঝে এক-আধটা বিড়ি দেয়। সেই বিড়ি ধরাবার সময় তাঁর হাত কাঁপে।

লালবাজারের কাছে মহাদেবের অফিস। পয়সা বাঁচাবার জন্য সে ট্রামে বাসে চড়ে না, হেঁটে বাড়ি ফেরে। একদিন ছুটি পর খুব বৃষ্টি নামল। রাস্তায় একটা গাড়িবারান্দার তলায় দাঁড়িয়ে আছে মহাদেব, ধুতির ওপর একটা মলিন পাঞ্জাবি পরা, পায়ে বরারের চটি, আগেকার মতন স্বাস্থ্যও তার নেই। ভিড়ের

মধ্যে সে অতি সাধারণ, কেউ তার দিকে চেয়েও দেখবে না। কেউ বিশ্বাসও করবে না, মাত্র কয়েক বছর আগে সে ছিল এক গ্রামের জমিদারপুত্র, রাস্তা দিয়ে গেলে প্রজারা তাকে নমস্কার ও সেলাম জানাত।

হঠাৎ মহাদেবের বুকটা ধক করে উঠল। ছাতা মাথায় দিকে এক মহিলা একটি শিশুর হাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছে ট্রাম স্টপেজের দিকে। পুষ্পময়ী না? মহাদেবের ইচ্ছে হল দৌড়ে যেতে, তক্ষুনি মহিলাটি একবার মুখ ফেরাল। না, চেহারার কিছুটা মিল থাকলেও অন্য নারী। মহাদেব তবু একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। সে দিকে। কোথায়, কেমন আছে পুষ্পময়ী? কুমিল্লার কেনও খবর পাওয়া যায় না। বুক মুচড়ে মুচড়ে মহাদেব অস্ফুট স্বরে বলতে লাগল, পুষ্পময়ী, পুষ্পময়ী!

এত দারিদ্র্য, হতাশা, এত তিক্ততা, তবু যৌবনের স্বপ্ন একেবারে হারিয়ে যায় না। পুষ্পময়ীর কোমল মুখখানি ফিরে ফিরে আসে তার কাছে।

পুষ্পময়ীরও মুখ অবশ্য তেমন কোমল আর নেই। কুমিল্লা ছেড়ে তারাও চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। তবে ভবানীপ্রসাদ কলকাতার দিকে না এসে, আশ্রয় নিয়েছে ত্রিপুরায়। ওদিক থেকে কাছাকাছি হয়। ভবানীপ্রসাদের এক আত্মীয় আগরতলায় আগেই-গিয়ে একটা মনোহারি দোকান খুলেছিল। ভবানীপ্রসাদ সেখানে হিসেব রাখার কাজ পেল। অতি সামান্য কাজ। সেই আত্মীয়ের বাড়িতেই আশ্রয়। এর মধ্যে তার তিনটি সন্তান জন্মেছে, কিন্তু তার পুত্রভাগ্য নেই, তিনটিই মেয়ে। পুষ্পময়ীর রূপ ঝরে গেছে। বিবর্ণ শালিখ পাখির মতন চেহারা। মাঝে মাঝে তার মাথার গোলমালও দেখা দেয়। তখন সে পাগলের মতন মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে কাঁদে, মেঝেতে গড়াগড়ি দেয়। আবার পরপর বেশ কিছুদিন সে ভাল থাকে। রান্নাবান্না তো করেই, মেয়েদের গান শেখাতে বসে।

ভবানীপ্রসাদকে সারাদিন দোকানে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, সে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরলে পুষ্পময়ী তার পা টিপে দেয়।

রাত্তিরের দিকে পুষ্পময়ীর পাগলামি বাড়ে। বিশেষত যে সব রাতে ভবানীপ্রসাদ তার সঙ্গে উপগত হতে চায়। এই শারীরিক প্রক্রিয়াটি পুষ্পময়ীর কাছে এখন বিভীষিকা। অন্য সময় ভুলে গেলেও ওই সময় মহাদেবের মুখ তার মনে পড়বেই। দিনের পর দিন এই পাপ সে সহ্য করতে পারে না, আবার মরতেও পারে না মেয়েদের মুখ চেয়ে। অন্ধকারে মশারির মধ্যে ভবানীপ্রসাদ যখন তাকে বুকে টেনে নিতে চায়, তখনই পুষ্পময়ী ছটফট করে বিছানা থেকে নেমে আসে। দৌড়ে বাইরে চলে যায়। দেয়ালে মাথা ঠুকে কাঁদে। ভবানীপ্রসাদ

কিছুই বুঝতে পারে না। তবু নিজের স্ত্রীকে সে ছাড়বে কেন ? আর একটি সন্তান তার চাই-ই চাই। সে সন্তান নিশ্চয়ই ছেলে হবে। ভবানীপ্রসাদ স্ত্রীকে পাগলামির ওষুধ খাওয়ায়।

পুষ্পময়ীর মেয়ে তিনটি বেশ ভাল হয়েছে। তারা মাকে খুব ভালবাসে। মায়ের পাগলামির উপক্রম দেখা দিলে তারা মাকে জড়িয়ে ধরে। তারা লেখাপড়া শিখছে, গান শিখছে।

বছর তিনেক বাদে একটা খুব ভাল ব্যাপার ঘটে গেল। পুষ্পময়ীর বড় মেয়ের নাম শুভ্রা। গানে ও নাচে তার বেশ নাম হয়েছে। মেজ মেয়ে দীপালি চমৎকার কবিতা আবৃত্তি করে। স্থনীয় লাইব্রেরিতে রবীন্দ্র জয়ন্তী হবে, সেখানে শুভ্রাকে একটা নৃত্যনাট্যে অংশ নিতে হবে। শুভ্রা অনেকটা মায়ের রূপ পেয়েছে, তার গান ও নাচ দেখে সবাই মুগ্ধ। একটা মেডেলও দেওয়া হল তাকে।

দুদিন পর তাদের বাড়ির সামনে একটা জিপ গাড়ি থামিল। তার থেকে নামল এক পুলিশ সাহেব। পুলিশ দেখলেই সবাই ভয় পায়। কিন্তু পুলিশ সাহেবটি বিনীতভাবে ভবানীপ্রসাদকে বললেন, শুভ্রার গান শুনে তাঁর স্ত্রীর খুব পছন্দ হয়েছে, শুভ্রাকে তাঁরা ছেলের বউ হিসেবে চান। তাঁদের ছেলে সদ্য ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছে, ছেলেরও অমত নেই।

ভবানীপ্রসাদ আকাশ থেকে পড়লেন। পুলিশরা বড়লোক হয়, ভবানীপ্রসাদ দারিদ্র্যের একেবারে নীচের তলায়। ইঞ্জিনিয়ার পাত্র মানে আকাশের চাঁদ। শুভ্রার বয়েস মাত্র পনেরো, আজকাল এই বয়েসে কেউ মেয়ের বিয়ে দেয় না।

তবু বিয়েটা হয়ে গেল। পুলিশ সাহেবের কেনও দাবিদাওয়া নেই, তাঁরা শুধু মেয়েটিকে চান। বিয়ের দিনে তাঁরাই সোনা মুড়ে শুভ্রাকে সাজিয়ে দিলেন। বিয়ের কিছুদিন পর শুভ্রা স্বামীর সঙ্গে চলে গেল জামশেদপুর। সঙ্গে নিয়ে গেল একেবারে ছোট বোনটিকে। সেখানে সে তাকে পড়াবে। পুষ্পময়ী বারান্দায় পা ছড়িয়ে মাঝে মাঝে বসে থাকে উদাস চোখে। যেন সে বহু দূর পর্যন্ত দেখতে পায়। মেজ মেয়ে দীপালি এসে তার গা ঘেঁসে বসে জিজ্ঞেস করে, মা, তুমি কী ভাবছ ? পুষ্পময়ী ঘোর ভেঙে বলে, আয়, তোকে একটা কবিতা শেখাই। 'কে যেন আমারে এনেছে ডাকিয়া, এসেছি ভুলে—'

পাঁচ

মহাদেবের বড় ছেলের নাম অনঙ্গ। স্কুল ফাইনালে সে নবম স্থান অধিকার করে নারকেলডাঙার ধনপতি বিদ্যালয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে ফেলল। গত দু

বছর এই স্কুল থেকে একটি ছেলেও ফার্স্ট ডিভিসন পায়নি। অনঙ্গের সাফল্যের জন্য স্কুলের কৃতিত্ব অবশ্য কিছু নেই প্রায়, কোনও প্রাইভেট টিউটর রাখার সামর্থ্যও তার ছিল না, সে পড়েছে তার বাবার কাছে। পুরনো আমলের বিএ পাস মহাদেব, অঙ্ক আর ইংরিজি গ্রামার খুব ভাল জানে। অনঙ্গ আই এসসিতে তৃতীয় এবং বি এসসিতে কেমিস্ট্রি অনার্সে ফার্স্ট হল। এখন আর তার পড়াশুনোর কোনও খরচ লাগে না, বরং স্কলারশিপের টাকা থেকে কিছু কিছু সংসারকে দেয়। মহাদেব যা চেয়েছিল, তা মোটামুটি পূর্ণ হতে চলেছে। তার কড়া শাসনে এই ঘোষাল পরিবারটি নীচের দিকে নেমে যায়নি, ছেলেমেয়েরা কেউ লুচ্চা লুমপেন হয়নি, আধপেটা খেয়ে ছেঁড়াজামা গায়ে দিয়েও পড়াশুনো আঁকড়ে ধরে রেখেছে।

পরিবারটি ছোট হচ্ছে ক্রমশ। জগদিন্দ্র নিঃশব্দে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন কিছুদিন আগে। মহাদেবের পরের দুটি ভাই আই এসসি পর্যন্ত পড়ে চাকরি পেয়েছে খিদিরপুর কারখানায়। তারা আলাদা বাড়ি ভাড়া নিয়ে উঠে গেছে। মহাদেবেরও চাকরিতে কিছুটা উন্নতি হয়েছে এর মধ্যে, নারকেলডাঙার বস্তির পরিবেশ ছেড়ে সে এখন চলে এসেছে মানিকতলার কাছে। অনঙ্গ এম এসসি পড়তে পড়তে তার এক সহপাঠিনীকে বিয়ে করল, তার নাম দীপ্তি। দীপ্তির বাবা ব্যাঙ্কশাল কোর্টের উকিল, তাঁরা ব্রাহ্মণ নন, কিন্তু মহাদেবের দিক থেকে আপত্তি জানাবার প্রশ্নই ওঠে না। তাদের আমলের চেয়ে এখনকার কলেজ ইউনিভার্সিটির পরিবেশ বদলে গেছে। মহাদেবের আমলে মেয়েরা আগে ক্লাসে ঢুকত না, প্রফেসরের সঙ্গে সঙ্গে আসত, প্রফেসরের সঙ্গেই দল বেঁধে বেরিয়ে যেত, সহপাঠিনীদের সঙ্গে কথা বলারই রেওয়াজ ছিল না। এখন ছাত্রছাত্রীরা জোড়ায় জোড়ায় মাঠে বসে থাকে।

দীপ্তি প্রথম থেকেই যৌথ পরিবারে থাকতে চায়নি। শ্বশুরশাশুড়ির প্রতি সে ভক্তি শ্রদ্ধা কম দেখায়নি, কিন্তু ঘোমটা টেনে বাড়ির বউ হয়ে থাকবার পাত্রী সে নয়। অনঙ্গ চাকরি পেল দুর্গাপুরে, সুতরাং তাদের তো সেখানে চলে যেতেই হবে, পরিবারটি ভাগ হয়ে গেল আবার। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই অনঙ্গ-দীপ্তির প্রথম সন্তান জন্মাল। এতদিন পর। এই প্রথম কলকাতার বাইরে সস্ত্রীক বেড়াতে এল মহাদেব। দুর্গাপুরে তার ছেলের মস্ত বড় কোয়ার্টার। কী সুন্দর ফুলের বাগান। সেই বাগান দেখে তার দীর্ঘশ্বাস পড়ে। যুদ্ধ না লাগলে, দেশ ভাগ না হলে, কলকাতায় এরকম বাগানওয়ালা বাড়িতে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব কিছু ছিল না।

নাতির মুখ দেখে মহাদেব জিজ্ঞেস করল, ওর নাম কী রাখবি রে ? আমি তো ভেবেছি, গৌরাঙ্গ রাখলে কেমন হয় !

অনঙ্গ হেসে বলল, কী যে বল বাবা ! ওরকম সেকেলে নাম আজকাল চলে ? দীপ্তি বলল, ঠাকুর-দেবতার নাম আমার খুব অপছন্দ। বিয়ের আগে থেকে আমি ঠিক করে রেখেছি, ছেলে হলে নাম রাখব ধীমান।

মহাদেব বলল, বাঃ বেশ নাম !

দিন সাতেক দুর্গাপুরে কাটিয়ে বীণাপাণিকে নিয়ে ফিরে এল মহাদেব। বীণাপাণি এর মধ্যে অস্বাভাবিক মোটা হয়ে গেল। এখন সে সুখী ঠাকুমা।

অনেক উদ্বাস্তু পরিবার ছিন্নভিন্ন, নষ্ট, অধঃপতিত হয়ে গেলেও ঘোষাল পরিবারের শ্রীবৃদ্ধিই হতে লাগল দিন দিন। প্রথম দশটা বছর খুবই কষ্টে গেছে। এর মধ্যে মহাদেব তার অন্য বোনের বিয়ে দিয়েছে, ছোট বোনটা ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বিয়ে করে সেই যে বোম্বে চলে গেল, আর তার সঙ্গে যোগাযোগ নেই। নিজের অন্য ছেলেমেয়ে দুটোও মানুষ হচ্ছে ! সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেলে এখন মহাদেবের হাঁপ ধরে। রিটায়ার করার আর মাত্র এক বছর বাকি। হঠাৎই সে চোখ বুজলেও পরিবারটা আর ভেসে যাবে না, অনঙ্গ নিশ্চয়ই দেখবে। অনঙ্গর ছেলে ধীমান এই ঘোষাল পরিবারের সবচেয়ে উজ্জ্বল সন্তান হয়ে উঠতে লাগল ক্রমে ক্রমে। যেমন সে সুপুরুষ, তেমনই সে সব বিষয়ে চৌখস। লেখাপড়ার ব্যাপারেও বংশের ধারা পেয়েছে। যদিও সে ভাল রেজাল্ট করে, কিন্তু বাবার মতন ফার্স্ট হয় না। তার খেলাধুলোর দিকেও ঝোঁক। প্রেসিডেন্সি কলেজের সে ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন। মেয়েরা সব সময় তাকে ঘিরে থাকে।

ধীমান এদেশে জন্মেছে, পূর্ববাংলার কোনও স্মৃতি নেই, টানও নেই। বংশগৌরব নিয়েও সে মাথা ঘামায় না। সে অর্থনীতির ছাত্র, কিন্তু রাজনীতি নিয়ে চিন্তা করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-কোনও বিতর্ক সভায় ধীমান ঘোষাল সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র। ধীমানের বিয়ের ব্যাপার নিয়ে দীপ্তির খুব দুশ্চিন্তা। সে নিজেও যদিও সহপাঠীকে বিয়ে করেছিল, কিন্তু তার ছেলে কোনও সহপাঠিনীকে বিয়ে করুক, এটা সে চায় না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়সের খানিকটা ব্যবধান থাকা ভাল। অনঙ্গর তুলনায় এখন দীপ্তিকে বেশি বয়স্কা দেখায়। অনেক দেখেশুনে ধীমানের একটা ভাল বিয়ে হওয়া দরকার। ধীমানের সঙ্গে রোজই নতুন নতুন মেয়ে ঘোরে, হুট করে ওদের মধ্যে কাকে বিয়ে করে ফেলবে ঠিক নেই। দীপ্তি এ ব্যাপারে ধীমানকে কিছু বোঝাতে গেলে, সে হেসে উড়িয়ে

দেয়। তার কত বান্ধবী, এর মধ্যে কাকে ছেড়ে কাকে সে বিয়ে করবে ? বিয়ে না করলেই বরং সবাই বান্ধবী থাকবে !

মহাদেব হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে তিন বছর আগে। নাকে অক্সিজেন লাগানো অবস্থায় সে ভেবেছিল, আমি মরে যাচ্ছি। পুষ্পময়ী কি এখনও বেঁচে আছে ? আর দেখা হল না তার সঙ্গে। কোনওদিন একটি কথাও বলা হল না।

মহাদেব জেনে গেল না যে পুষ্পময়ী আরও আগে বিদায় নিয়েছে পৃথিবী থেকে। শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে সে ভবানীপ্রসাদের হাত চেপে ধরে বলেছিল, তুমি আর একটা বিয়ে করো। তাকে নিয়ে তুমি সুখী হবে।

অনঙ্গ ভাইবোনদের ব্যবস্থা করে দিয়েছে, মাকে এনে রেখেছে নিজের কাছে। বীণাপাণির সঙ্গে প্রায়ই দুপুরে বসে দীপ্তি ধীমানের বিয়ে সম্পর্কে আলোচনা করে। দীপ্তির ওই একমাত্র সন্তান, আর হয়নি, কিংবা সে চায়নি।

জি আর ই পরীক্ষা দিয়ে ধীমান আমেরিকায় একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পি. এইচ. ডি. করার সুযোগ পেয়ে গেল। দীপ্তির তাতে ঘোর আপত্তি। একমাত্র ছেলেকে সে দূরে যেতে দিতে চায় না। আজকাল আমেরিকায় গেলে আর কেউ ফিরে আসে না। সে ছেলেকে বলল, তোর বাবা এম. এসসি-তে ফার্স্ট হয়েছিল, ইচ্ছে করলে সে বিদেশে যেতে পারত না ? আমারও রেজাল্ট খারাপ ছিল না। আমরা দুজনেই বিদেশে সেট্‌ল করতে পারতাম। আমরা স্যাক্রিফাইস করেছি, আর তুই—

ধীমান হেসে বলল, কী যে বল মা ! তোমরা স্যাক্রিফাইস করেছ বলে দেশের কি উন্নতি হয়েছে ? আমি কি থাকতে যাচ্ছি নাকি ? ফিরে আসব, অনেক ফরেন এক্সচেঞ্জ নিয়ে আসব, তাতে দেশের উপকার হবে।

এয়ারপোর্টে দীপ্তি চোখের জল সামলাতে পারল না। ধীমান টারম্যাক দিয়ে যাবার সময় একবারও পেছনে তাকাল না। অনঙ্গ ভাবল আমরা পূর্ববঙ্গ থেকে চলে এসেছি, পশ্চিম আমাদের টানতে টানতে নিয়ে চলেছে। আরও পশ্চিমে।

প্লেনে ধীমানের ঠিক সামনের সিটে বসেছে একটি বাঙালি তরুণী। ধীমানের সঙ্গে আলাপ হল, ওর নাম সুনেত্রা সান্যাল, যাদবপুর থেকে ইংরিজিতে এম. এ. পাস করেছে, সেও যাচ্ছে আমেরিকায়। এরকম অনেক মেয়ের সঙ্গেই ধীমানের ভাব হয়। গল্প, ইয়ার্কি-ঠাট্টা চলে। কিন্তু প্লেনে যখন রাত হল, পাশের লোকটিকে অনুরোধ করে জায়গা বদল করে, সুনেত্রার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলার পর একবার হাতে হাত ছোঁয়ার পরই ধীমানের বুকে যেন একটা ধাক্কা লাগল। সে তার কারণটা ঠিক বুঝতে পারল না।

তারপর থেকে সুনেত্রার সঙ্গে চোখাচোখি হলেই একটুক্ষণ ওরা কোনও কথা না বলে চুপ করে যায়।

নিউ ইয়র্কে নামার পর, সুনেত্রা যাবে মেরিল্যান্ড, ধীমান যাবে ইন্ডিয়ানার ব্লুমিংটনে, দুজনকেই একটা দিন অপেক্ষা করে প্লেন ধরতে হবে। সুনেত্রাকে তার বাবার এক বন্ধু নিউ ইয়র্কে রিসিভ করবে, ধীমানের চেনাশুনো কেউ নেই। সুনেত্রা বলল, আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন ? আমার বাবার বন্ধুকে বলে দেখতে পারি, নিশ্চয়ই তাঁদের বাড়িতে জায়গা হয়ে যাবে।

ধীমান বলল, না। আমি হোটেলে থাকব। আমার হোটেল বুক করা আছে। সুনেত্রার বাবার বন্ধুর নাম বিশ্বদেব, অতিশয় ব্যস্তসমস্ত মানুষ। ধীমানের সঙ্গে আলাপ হবার পর সে হোটেলে থাকবে শুনে বললেন, পাগল নাকি ? আমার অত বড় বাড়ি খালি পড়ে আছে, আমার বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে দেশে গেছে, তোমরা দুটিতে বেশ গল্প করবে—

নিউ জার্সিতে আস্ত একটা দোতলা বাড়ি, সেখানে আর কেউ নেই। বিশ্বদেব ওদের পৌঁছে দিয়ে একটু পরে বেরিয়ে গেলেন, তাঁর অফিসের পার্টি আছে, ফিরতে রাত হবে। একালের ছেলেমেয়েরা ফাঁকা বাড়িতে থাকলেই পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে না। ধীমান ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোনও বান্ধবীর সঙ্গে নিজের ঘরে বসে গল্প করেছে, কখনও চুমু খাবারও চেষ্টা করেনি। সুনেত্রাকে দেখলেই বোঝা যায়, তাদের বাড়িরও একটা বিশেষ সহবত আছে, সে নিজের সম্ভ্রম বজায় রাখতে জানে। কিন্তু আজ তার কী হল ? ধীমান তাকে চুম্বকের মতন টানছে। ধীমানেরও মনে হল তার কোনও বান্ধবীর সঙ্গেই সুনেত্রার তুলনা হয় না। সে যেন এই মেয়েটির জন্যই এতকাল অপেক্ষা করে ছিল।

দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। মুখে কিছু বলতে হল না, তাদের দুজনের দৃষ্টিতেই বোঝা যাচ্ছে, পরস্পরকে তারা তীব্রভাবে চায়, এক্ষুনি।

ধীমানের মুখখানা যেন এখন অবিকল মহাদেবের মতন। আর সুনেত্রার সঙ্গে তার দিদিমা পুষ্পময়ীর কী আশ্চর্য মিল। এরা কেউ জানে না যে এদের ঠাকুর্দা, দিদিমা পরস্পরকে চিনতেন। পূর্ব বাংলার সেই গ্রাম থেকে কত দূরে এসে, তিন প্রজন্ম ধরে প্রবাহিত দুজন নারী-পুরুষের অতৃপ্ত বাসনা আজ পূর্ণ হতে চলেছে।

ওরা পরস্পরের কাঁধে হাত রাখল।

আশ্রয়

প্রভা জানলা দিয়ে দেখতে পেল, সামনের গলি দিয়ে তার মেয়ের পাশাপাশি হেঁটে আসছে একটি তরুণ। শিখার পাশে সেই ছেলেটিকে বেশ ঢ্যাঙা দেখাচ্ছে. প্যান্টের ওপর কলার দেওয়া পাঞ্জাবি পরা, মাথায় বড় বড় চুল। ছেলেটিই হাত-পা নেড়ে কথা বলে যাচ্ছে, শিখার মুখ নিচু।

তাহলে এই কি সেই ছোকরাটি ? অন্তত দু'জনের কাছে প্রভা শুনেছে যে শিখা নাকি স্টেশনের পাশে চায়ের দোকানে একটা লম্বা ছেলের সঙ্গে মাঝে মাঝে বসে। পাশের বাড়ির বেলা একদিন ওই রকম একটা ছেলের সঙ্গে শিখাকে সাইকেল রিকশা করে যেতে দেখেছে, বাড়ির দিকে নয়, লগার মাঠের দিকে।

এসব শুনে প্রভা অবশ্য আতঙ্কিত হয়নি। মেয়ে বড় হয়েছে, লেখাপড়া শিখে চাকরি পেয়েছে, ট্রেনে চেপে রোজ ভিড় ঠেলে অফিস যায়, সে পুরুষ মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করবেই। এসব নিয়ে কথা বলতে যাওয়াই বোকামি।

কিন্তু এ পর্যন্ত কারুকে বাড়িতে নিয়ে আসেনি শিখা।

কলকাতা থেকে শিখা ছটা পঞ্চাশের ট্রেনে ফেরে, স্টেশান থেকে হেঁটে আসতে লাগে বড় জোর মিনিট দশেক। তাই সাতটা বাজলেই প্রভা জানলার ধারে এসে রাস্তার দিকে চেয়ে থাকে। প্রায়ই দেরি হয়, ট্রেনের গোলমাল তো লেগেই আছে, ছুটির পর প্রথম ট্রেনটা ধরতে না পারলে শিখার ফিরতে ফিরতে এক একদিন নটাও বেজে যায়। প্রভার মনের মধ্যে উদ্বেগ থাকে, ছটফটানি থাকে, কিন্তু মেয়েকে তা জানাবার উপায় নেই। শিখা একদিন বলেছিল, তোমার যদি মেয়ের বদলে ছেলে অফিস যেত, সেকি রোজ এক সময়ে বাড়ি ফিরতো ? আমি তো একা ফিরছি না। ট্রেন ভর্তি লোক!

ছেলেটিকে কি বাড়ির মধ্যেই নিয়ে আসবে, না দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে ছেলেটি বিদায় নেবে ?

ছোট্ট দোতলা বাড়ি, একতলাটা পাকা, ওপরে একটি ঘরে মাত্র ঘরে টালির ছাদ। সেটাই বড় ঘর, মা ও মেয়ের শোবার ঘর। একতলাটা স্যাঁতসেঁতে, বর্ষার সময় জল ঢুকে আসে, বাথরুমে ব্যাঙ দেখা যায়, একদিন ভাঁড়ার ঘরে মস্ত বড় একটা তেঁতুল বিছে বেরিয়েছিল।

দোতলা থেকে নিচে এলো প্রভা। উঠোনের পাশে ছোট বারান্দা। তার পাশে একটা ঘর শিখার নিজস্ব। সে ওখানে শোয় না বটে, তবে ওঘরেই তার সব জিনিসপত্র থাকে, ওই ঘরে পড়াশুনো করেই সে পরীক্ষায় পাস করেছে। বাইরের কেনও লোক এলে ওই ঘরেই বসাতে হয়, আর তো জায়গা নেই। বাইরের লোক আর কটাই বা আসে।

রান্নাঘরে টিমটিমে আলোয় বামুন দিদি ছ্যাঁকছোঁক শব্দে কী যেন ভাজছে। বামুনদিদি প্রায় সারাদিন ওই রান্নাঘরেই কাটায়। রাত্তির ওই ঘরেই শোয়। পোকা-মাকড়, আরশোলা, ইঁদুর, মশা কিছু গ্রাহ্য করে না। রান্নাঘরটা অবশ্য বেশ চওড়া।

সদর দরজায় ছিটকিনিটা নামিয়ে দিয়ে প্রভা তাড়াতাড়ি ভাঁড়ার ঘরে চলে এলো। মেয়ে তার একজন পুরুষ বন্ধুকে নিয়ে বাড়িতে আসছে, মায়ের সঙ্গে তার আলাপ করাতে চায় কি না কে জানে! দেখা যাক! প্রথমে আড়ালে থাকাই ভাল।

ভাঁড়ার ঘরে গুচ্ছের বাজে জিনিস জমে আছে। শিখা দেখতে পেলেই বলে, ফেলে দাও, ভাঙা হাঁড়িকুড়ি সব ফেলে দাও! সে আর হয়েই ওঠে না। একটা ভাঙা তিন চাকার সাইকেল পর্যন্ত রয়ে গেছে এক কোণে। খোকার বাবা ওটা শখ করে কিনে দিয়েছিল। খোকাও নেই, তার বাবাও নেই, তবু কি সাইকেলটা ফেলে দেওয়া যায় ?

সদর দরজা ঠেলে ঢুকলো শিখা, তার পেছনে চটির শব্দ। হ্যাঁ, দুজনেই এসেছে।

শিখা নিজের ঘরের দরজাটা খুলে ছেলেটিকে বসালো। তারপর ডাকলো, মা, মা—

প্রভা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। কী মধুর শোনালো ওই ডাকটা। চাকরি-করা মেয়ে, সে বাইরের লোকের সামনে তার মাকে গুরুত্ব দিতে নাও পারতো।

ময়লা, আটপৌরে শাড়ি-পরা, এই অবস্থায় কি কোনো বাইরের লোকের সামনে যাওয়া যায় ? হয়তো ভাববে বাড়ির ঝি। কিন্তু শিখা তো এমন ভাবে কারুকে আগে আনেনি, প্রভা সেজেগুজে থাকবে কী করে ? বড়লোকদের কথা আলাদা, সাধারণ গেরস্ত ঘরের মা-মাসিরা তো এইরকম ভাবেই থাকে।

আঁচল দিয়ে মুখের তেলতেলে ভাবটা মুছে প্রভা বেরিয়ে এলো।

শিখা বললো, মা, এসো, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, ইনি তপন চাকলাদার, আমরা প্রায়ই ট্রেনে এক সঙ্গে আসি—

ছেলেটি ঝপাস করে প্রভার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে ফেললো। প্রভা ত্রস্তে সরে যাবারও সময় পেল না।

তারপর ছেলেটি সাবলীল ভাবে বললো, মাসিমা, আপনার বাড়িতে এক কাপ চা খেতে এলাম। আমি খুব চা খাই।, দিনে দশ-বারো কাপ তো হবেই।

শিখা বললো, মা, তুমি তাহলে একটু বসো, আমি চা-টা করে আনি ?

প্রভা ব্যস্ত হয়ে বললো, না, না, তোরা গল্প কর। আমি চা বানিয়ে দিচ্ছি।

রান্নাঘরে এসে প্রভা দেখলো বামুনদিদি উনুনে আলুপটলের তরকারি চাপিয়েছে। একটাই উনুন। সে বললো, ও বামুনদিদি, কড়াইটা যে একবার নামাতে হবে। চায়ের জল বসাবো।

শেলাই-ফোঁড়াই করার সময় প্রভার চশমা লাগে। বামুনদিদির বয়েস অনেক বেশি, তবু চশটা টশমার বালাই নেই। কানেও ভালো শোনে।

দু'জন মাত্র প্রাণীর জন্য রান্নার লোক রাখার প্রশ্নই ওঠে না। সে সাধ্যও এদের নেই। বামুনদিদিকে সে জন্য রাখা হয়নি, সে এ পরিবারের কেউ নয়। প্রভা একদিন এই বুড়িকে স্টেশনের ধারে বসে অঝোরে কাঁদতে দেখেছিল। বাংলাদেশের রিফিউজি, ওর সঙ্গের লোকেরা ওকে ফেলে চলে গেছে। এ রকম একটা বুড়ির দায়িত্বের বোঝা কেই বা বইতে চায়। বনগাঁর বর্ডার দিয়ে অনবরত ওরা আসে, বড় রাস্তার ধারে মিউনিসিপ্যালিটির জমিতে ঝুপড়ি বেঁধে থেকে যায়। এই বুড়ির একা একা সে রকম একটা আস্তানা তৈরি করারও সামর্থ্য নেই। প্রভা দুটো একটা সহানুভূতির প্রশ্ন করতেই বুড়ি হাউ হাউ করে কেঁদে বলেছিল, ওগো, আমি বামুনবাড়ির বিধবা, কখনো ভিক্ষা করতে শিখি নাই।

পরিত্যক্ত হওয়ার বেদনা কী, তা প্রভা জানে। তাই সে বুড়িকে নিজের বাড়িতে এনে আশ্রয় দিয়েছিল। এর আগেই এরকম দু'জন নিরাশ্রয় মহিলাকে বাড়িতে স্থান দিয়েছিল প্রভা। তারা কিছুদিন পরেই চলে গেছে, এই বামুনদিদি যায়নি। আব যাবে না, এই বাড়িতেই সে মরবে।

কড়াইটা নামিয়ে বামুনদিদি বললো, একটা পুরুষ মানুষ আসলো না ? অর সাথে শিখার বিয়ে হবে ?

প্রভা বললো, চুপ, চুপ, ওরকম বলো না। শিখা রাগ করবে।

বামুনদিদি তবু বেশ জোরে জোরেই বললো, ইদিকের মাইয়া, পোলারা তো নিজেরা নিজেরাই বিয়া করে দেখি। ছেলেটা চাকরি করে ?

বামুনদিদি তার সরল-সোজা কথার জন্য শিখার কাছে প্রায়ই বকুনি খায়। কিন্তু এই বয়সে মানুষ কি তার স্বভাব বদলাতে পারে ? বামুনদিদির ধারণা, বিয়ে না করে শিখার বাইরে একা একা চলাফেরা করা মহা সর্বনাশের ব্যাপার। পুরুষ নামের বাঘরা-চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কুমারী মেয়ে দেখলেই টপ করে গিলে ফেলতে চায়। একমাত্র স্বামী নামের বাঘটিই নিরাপদ।

প্রভা এক নজরেই দেখে নিয়েছে, তপন নামের ছেলেটির পাঞ্জাবিটা ডান কাঁধের কাছে সেলাই করা, মুখে দু'তিনদিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পায়ে বড় বড় নোখ, চটিজোড়ায় বহুদিন পালিশ পড়েনি। এই সব দেখেই ছেলের অর্থনৈতিক অবস্থা খানিকটা আন্দাজ করা যায়।

চা দিতে গিয়ে প্রভা দেখলো, তপন অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে, আর শিখা মুগ্ধ হয়ে শুনছে। প্রভার দিকে আর তারা মনোযোগ দিল না।

ঘণ্টাখানেক ধরে তপন প্রায় একাই কথা বলে গেল। বাইরে থেকে প্রভা একটু আধটু শুনতে পেল, মধ্যপ্রদেশের কী একটা জঙ্গলের কথা শোনাচ্ছে সে।

প্রভা ওপরে গিয়ে সেলাই মেশিনে বসলো। সিঁড়ির মুখে খানিকটা জায়গা আছে, সেখানে মেশিনটা বসানো, পা দিয়ে চালাতে হয় ! এই মেশিনে বসলে তার মনের চঞ্চলতা দূর হয়ে গেল।

ছেলেটি চলে যাবার পর শিখা ওপরে এসে শাড়ি বদলালো, রেডিও খুলে কিছুক্ষণ শুনলো, প্রভা তাকে কোনও কথা জিজ্ঞেস করলো না। শিখা নিজে থেকেই অনেক কথা বলে, কিন্তু বেশি কৌতূহল প্রকাশ করলে চটে যায়।

রাত্তিরে খাওয়ার সময় সাড়ে নটা। বছরখানেক আগে পর্যন্ত মেঝেতে আসন পেতে খেতে বসার ব্যবস্থা ছিল, চাকরি পাবার পর শিখা একটা সানমাইকা বসানো টেবিল ও চারটে চেয়ার কিনে এনেছে। রান্নাঘরের মধ্যে এক পাশে রাখা, সেই টেবিলে বসে খাওয়া হয় এখন। বামুনদিদি প্রথম প্রথম ঘোর আপত্তি তুলেছিল, ম্লেচ্ছদের মতন এঁটো কাঁটার জ্ঞান নেই, খেতে খেতেই বাঁ হাত দিয়ে, ডাল তুলে নেওয়া হচ্ছে, এরকম সে কখনও দেখেনি। শিখা বলেছিল, তুমি তা হলে নিচে বসে খেও, তোমার ডাল-তরকারি সরিয়ে রেখো

আগে থেকে যাতে এঁটো না হয়—। বেশ কয়েকমাস গজগজ করার পর এখন বামুনদিদি দিব্যি টেবিলে বসেই খেতে শিখে গেছে।

ডাল দিয়ে ভাত মাখতে মাখতেই বামুনদিদি জিজ্ঞেস করলো, ওই ছেলেটা কে ?

শিখা মুখ না তুলে বললো, আমার বন্ধু।

বামুনদিদি চোখ বিস্ফারিত করে বললো, বন্ধু ? কও কি খুকী ? মাইয়ামানুষের আবার ব্যাটাছেলে বন্ধু হয় নাকি ?

শিখা গম্ভীরভাবে বললো, শোনো বামুনদিদি, 'মাইয়া মানুষ', 'ব্যাটাছেলে' এই ধরনের শব্দ তুমি আমার সামনে উচ্চারণ করবে না। ভালো করে কথা বলতে পারো তো বলবে। নইলে চুপ করে থাকবে।

বামুনদিদি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে প্রভার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী খারাপ কথা বললাম ? মাইয়া মানুষেরে মাইয়া মানুষ কওয়া যায় না ?

প্রভা একটু হেসে বললো, তোমাকে এত করে শেখানো হয়, তবু তুমি বাঙাল ভাষা ছাড়তে পারলে না ?

তারপর মেয়ের সমর্থনে সে আবার বললো, মেয়েদের কোনো পুরুষ বন্ধু হতে পারবে না কেন ? তুমি ছিলে পূর্ব বাংলার কোন্ অজ পাড়াগাঁয়ে, সেকেলে ধারণা নিয়ে পড়ে আছো। সময় কত বদলে গেছে তাও জানো না। এখন মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে সমান তাল রেখে এক অফিসে চাকরি করে। পাশাপাশি বসে, গল্প করে। তাদের বন্ধুত্ব হবে না ?

বামুনদিদি বললো, কী জানি বাপু, আমি এসব বুঝি না।

শিখা চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, যা বোঝো না, তা নিয়ে কথা বলতে আসো কেন ?

প্রভা বললো, আহা, রাগ করিস কেন ? বুড়ো মানুষ, ওর কথা অত ধরতে নেই। ওই তপন কি তোর অফিসে কাজ করে ?

শিখা বললো, না। আমার সঙ্গে ট্রেনে আলাপ।

—রোজ দেখা হয় ?

—প্রায় রোজই। ও থাকে নৈহাটি।

বামুনদিদির বেশিক্ষণ চুপ করে থাকা সম্ভব নয়। সে ফস করে বলে ফেললো, ওমা, রেলের কামরায় দেখা, সেই মানুষকে কেউ বাড়িতে আনে ? যদি চোর-ছ্যাঁচোড় হয় ?

শিখা খাওয়া থামিয়ে চোখ গরম করে বললো, মা, বামুনদিদি যদি এই ধরনের কথা বলে, তা হলে আমি আর খাবো না বলে দিচ্ছি !

বামুনদিদি যা বললো, প্রভার মনেও সেই কথাটা এসেছিল। শুধু ট্রেনের কামরায় যার সঙ্গে আলাপ, তাকে বাড়িতে আনার কী দরকার। তপন থাকে নৈহাটিতে, সে শ্যামনগরে নামে কেন?

তবু মেয়েকে খুশি করার জন্য সে বামুনদিদিকে মৃদু ধমক দিয়ে বললো, তুমি কী উল্টো-পাল্টা কথা বলো! শিখা এত বড় হয়েছে, সে কি মানুষ চেনে না? লোকে তো লোকের বাড়ি যায়ই। ছেলেটি চা খেতে এসেছিল।

বামুনদিদি বললো, ও শিখা, আমারে তুই তাড়ায়ে দিতে চাস? তুই আমারে সহ্য করতে পারোস না, না?

শিখা আরও চটে গিয়ে বললো, দেখেছো, দেখেছো, কী বাজে কথা! আমি কোনোদিন তোমাকে তাড়িয়ে দেবার কথা বলেছি? তুমি নিজের মনে থাকতে পারো না? আমার সব ব্যাপারে অত মাথা গলাও কেন?

বামুনদিদি বললো, ওই ছেলেটা কি তোরে বিয়া করবে? কিছু কইছে?

প্রভা হেসে ফেললো। বামুনদিদিকে চুপ করানো একটা অসাধ্য ব্যাপার।

শিখা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে বললো, বুঝেছি, তুমিই আমাকে এ বাড়ি থেকে তাড়াতে চাও। আমি বিয়ে করে চলে গেলে, তোমার সুবিধে হয়। যত ইচ্ছে বকবক করবে, কেউ বাধা দেবে না। আমার মা তো কানে কালা হয়ে গেছে।

বামুনদিদি এই ধমক সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বললো, আমার আর কয়দিন? ভগবান যে কোনোদিন আমায় কাছে টেনে নেবে। তোর বিয়াটা দেইখ্যা গেলে মনে শান্তি হয়।

শিখা বললো, ওই যে মোড়ের মাথায় স্যাকরা বুড়ো থাকে। তার বউ মরেছে অনেকদিন। তুমি ওকে বিয়ে করো না, তা হলে আরও বেশি শান্তি পাবে!

বামুনদিদি এক গাল হেসে বললো, কি যে কস! আমি বিধবা মাগী, ছি ছি ছি।

শিখা বললো, বিধবাদেরও বিয়ে হতে পারে। তোমাদের বাঙাল দেশে হয় কি না জানি না, এখানে হয়।

বামুনদিদি বললো, হায় আমার কপাল! কত সোমত্থ মাইয়ারই বিয়া হয় না দেখি। ও শিখা, চাকলাদার কারো পদবি হয় রে, কোন জাত?

শিখা বললো, কারো সঙ্গে পরিচয় হলে কেউ তার জাত জিজ্ঞেস করে না। সেটা অসভ্যতা। তোমাদের আমলে ঐ সব অসভ্যতা চলতো। আর একটা কথা বলবে না বলছি। মুখ বুজে থাকো।

প্রভা মনে মনে বেশ খুশিই হচ্ছে। তার নিজের প্রশ্নগুলোই বামুনদিদি করে ফেলছে, বকুনি বামুনদিদিই খাচ্ছে।

খাওয়া দাওয়া শেষ হবার পর প্রভা ওপরে গিয়ে আবার সেলাই মেশিনে বসলো। ঘুমোবার আগে শিখা কিছুক্ষণ ক্যাসেটে গান শোনে। নিজের গলা মিলিয়ে গুনগুনিয়ে গায়। সুর জ্ঞান আছে, কিন্তু গলাটা তার সুরেলা নয়।

একটু পরে শিখা বাইরে বেরিয়ে এসে বললো, মা, তোমাকে বারণ করেছি না, রাত্তিরে সেলাই করবে না ? চোখ যে যাবে।

প্রভা বললো, আর, দুটো মাত্র বাকি আছে। রথীন কালই নিতে আসছে। বেশিক্ষণ লাগবে না।

শিখা বললো, মা, তুমি এবার সেলাইয়ের কাজ বন্ধ করে দাও। আর কী দরকার।

প্রভা বললো, সেকি। সারা দিন তা হলে আমি বাড়িতে বসে কী করবো ? তা ছাড়া আমার তো কষ্ট হয় না কিছু। এতদিন তো এই করেই সংসার চালিয়েছি।

শিখা বললো, হ্যাঁ, এতদিন তুমি চালিয়েছো। এবার আমাকে চালাতে দাও। লোকে কী বলবে ? সবাই জানে, আমি এখন চাকরি করছি, তবু মাকে খাটাচ্ছি ! আমি যা পাই, তাতে আমাদের কষ্টেসৃষ্টে চলে যাবে।

লোকে কি মনে করবে ? লোক মানে কারা ? শিখা যখন স্কুল-কলেজে পড়েছে, তখন তার মা তো শায়া-ব্লাউজ-ফ্রক সেলাইয়ের পয়সাতেই সব খরচ চালিয়েছে। তখনো লোকে অনেক কিছু বলেছে। রথীনের বাপ হেমেন ছিট কাপড় দিয়ে সেলাই করিয়ে নিত, ঘন ঘন আসতো এ বাড়িতে। তার নাম জড়িয়ে প্রভাকে কেউ কেউ বদনাম দেয়নি ? সে সব গ্রাহ্য করেনি প্রভা। লোকের কথায় কান দিলে কি সংসারটাকে এতদূর টেনে আনতে পারতো সে ?

পরীক্ষায় ভাল ফল করেছে শিখা। কলকাতায় সরকারি অফিসে চাকরি পেয়েছে। সরকারি চাকরি মানে সোনার চাকরি। কোনদিন হারাতে হবে না।

তবে, একটা কথা প্রভার মনে হয় প্রায়ই। লোকে কি বলবে, সেটা সে তুচ্ছ করে এসেছে এতদিন। কিন্তু নিজের মেয়ে কি ভাবছে, সেটা কি তুচ্ছ করা যায় ? মা এখনো সেলাই-ফোঁড়াই করে টাকা রোজগার করে, এতে কি চাকরি করা মেয়ের অপমান বোধ হয় ? শিখা যদি কখনো বিয়ে করতে চায়, তা হলে এই পরিচয়টা মুছে না ফেললে সে ভালো পাত্র পাবে কী করে ?

দুই

তপন চাকলাদার এখন প্রায়ই আসে। শিখার সঙ্গে সে এক সঙ্গে ফেরে, অনেকক্ষণ গল্প করে, তিন চারবার চা খায়। তার ব্যবহার অত্যন্ত সাবলীল। প্রভাকে সে মাসিমা বলে ডাকে, বামুনদিদিকেও চিনে ফেলেছে, রান্নাঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একদিন সে বললো, ও বামুনদিদি, এক রোববারে আসবো, তোমার হাতের রান্না খাওয়াবে না ?

রবিবারে নয়, সপ্তাহের মাঝখানে একটা দিন সে এলো বিকেল চারটের সময়। শিখা যথারীতি অফিসে গেছে।

প্রভার বিস্মিত ও কৌতূহলী দৃষ্টি দেখে তপন বললো, আমি দু'দিন অফিস যাচ্ছি না, আমার ছুটি চলছে। শ্যামনগরে একটা কাজে এসেছিলুম, তাই ভাবলুম, আপনার বাড়িতে একটু বসে যাই, শিখার সঙ্গেও ক'দিন দেখা হয়নি। ও তো এসে পড়বে।

প্রভা বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ...বসো।

এক কাপ চা এনে দেবার পর তপন বললো, মাসিমা, আপনি কি খুব ব্যস্ত ? আপনার সঙ্গেই গল্প করতে ইচ্ছে করছে। অন্যদিন তো বেশি কথাই হয় না।

এক ডজন ফ্রক সেলাই করার অর্ডার আছে, কাল সকালের মধ্যেই শেষ করা দরকার। এই রকম ভাবে কারুর সঙ্গে গল্প করার অভ্যেসই নেই প্রভার। তবু সে বসলো।

চেয়ারে, গা এলিয়ে তপন একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো, জানেন মাসিমা, আপনাদের এখানে একটা জমি দেখতে এসেছিলুম। ভাবছি নিজে একটা আলাদা বাড়ি করে থাকবো। আজ যে-জমিটা দেখলুম, ঠিক পছন্দ হলো না। দেখবেন তো, আপনার সন্ধানে এদিকে ভালো জমি যদি থাকে, এই সাত-আট কাঠার মতন।

কথাটা শুনেই প্রভার মনে হলো, তা হলে কি ছেলেটি বিবাহিত ? বাবার বাড়ি ছেড়ে একা এই বয়েসী ছেলে তো সাধারণত আলাদা বাড়ি করে না।

তপন নিজেই আবার বললো, নৈহাটিতে বাজারের কাছেই আমাদের বেশ বড় বাড়ি। আমরা সাত ভাই-বোন, বাবা ইস্কুল মাস্টার ছিলেন, এখন রিটায়ার করেছেন, তবু তাঁর কাছে এখনো অনেক লোকজন আসে, সব সময় বাড়িতে হই হট্টগোল চলে। তাই বাড়িতে আমার মন টেঁকে না।

প্রভা জিজ্ঞেস করলো, তোমার মা—

তপন বললো, মা তো অনেকদিনই নেই। আমার তখন চোদ্দ বছর বয়েস, দুই দাদা বিয়ে করেছে, বউদিদের মধ্যে সব সময় ঝগড়া—

—তুমি কি শিখার অফিসের কাছেই কোথাও চাকরি করো ?

না, না। আপনার মেয়ে যায় ওয়েলিংটনে, সেখানে একটা বাড়িতে অনেকগুলো সরকারি অফিস...আমি, মানে একটা ওষুধের কম্পানিতে, ঘুরে ঘুরে বেড়ানোর কাজ। ট্রেনে পরপর কয়েকদিন শিখার সঙ্গে একটি কামরায় জার্নি করে ওর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। জানেন তো অফিস ভাঙার পর কেমন ভিড় হয়। একদিন এক ব্যাটা শিখার ব্যাগটা হাতিয়ে নিয়ে সরে পড়ার মতলবে ছিল, আমি খপ করে ধরে ফেলি। এসব ব্যাপারে লাইফের রিস্ক থাকে, ওদের অনেক বড় দল থাকে, একজনকে ধরলে অন্যরা রিভেঞ্জ নেবার চেষ্টা করে, আমি ওসব পরোয়া করি না।

—বাবা, শুনলেই ভয় করে। মেয়েটা একা একা যায়।

—একা কোথায় ? আরও কত মেয়ে যায়। মেয়েরা দল বেঁধে একদিকে বসে। একদিন মেয়েরাই একজন ছিনতাইবাজকে ধরে খুব ঠ্যাঙানি দিয়েছিল। মেয়েরা আজকাল অনেক কিছু পারে, বুঝলেন। আমার বাবা খুব গোঁড়া, আমার এক দিদি বি এ পাস, তাকে চাকরি করতে দেয়নি। বিয়ের কিছুদিন পরেই দিদি বিধবা হলো, তখন বয়েস হয়ে গেছে, তখন আর দিদিকে কে চাকরি দেবে। দিদির জীবনটাই বরবাদ হয়ে গেল। আপনি শিখাকে চাকরিতে পাঠিয়ে খুব ভালো করেছেন।

—আমি শিখাকে কখনো কিছু বারণ করিনি। ওর বুদ্ধি-বিবেচনা আছে, নিজে যা ভালো বুঝবে তাই করবে।

—আপনাদের এ বাড়িটা বেশ নিরিবিলি।

—হ্যাঁ, মোটে তিনটি প্রাণী।

—মাসিমা, খুব ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসি। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরি। হাজারিবাগ, ডাল্টনগঞ্জ, জলদাপাড়া...আপনি জলদাপাড়া গেছেন ?

না।

একবার বেড়াতে যাননি ? বড় অপূর্ব জায়গা।

—আমাদের আর বেড়ানো। কোথাও যাওয়া হয়নি।

—আমি নিয়ে যেতে পারি। একবার চলুন আমার সঙ্গে।

তুমি নিশ্চয়ই আর এক কাপ চা খাবে ? নিয়ে আসি চা—ঘর থেকে বেরিয়ে এসে প্রভা স্বস্তি বোধ করলো। তপনের কথাবার্তা একটু যেন অসংলগ্ন। হঠাৎ

হঠাৎ এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে চলে যায়, প্রভা ঠিক তাল রাখতে পারছিল না।

ছেলেটি কি সামান্য ট্যারা ? কথা বলার সময় মুখের দিকে তাকায়, মনে হয় যেন অন্য দিকে তাকিয়ে অন্য কারুর সঙ্গে কথা বলছে।

বামুনদিদি রান্না ঘরের মেঝেতে শুয়ে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে। ভাবনা-চিন্তা না থাকলেই মানুষ এমন নিশ্চিন্তে দিনের বেলা ঘুমোতে পারে।

চায়ের জল বসাতে বসাতে প্রভা ভাবলো, শিখার ফিরতে আরও অন্তত ঘণ্টাখানেক দেরি আছে। ততক্ষণ বসে ঐ তপনের সঙ্গে গল্প করতে হবে নাকি ?

ট্রেনের কামরায় আলাপ, তবু তপন এ বাড়িতে কেন ঘন ঘন আসছে ?

মেয়ে যৌবনে পা দিলে মায়ের মন তার নিরাপত্তার কথা চিন্তা করবেই। নিরাপত্তা মানে বিয়ে। এই ছেলেটি কি শিখাকে বিয়ে করতে চায় ?

প্রভা জানে, স্বাভাবিকভাবে সম্বন্ধ করে তার মেয়ের বিয়ে হওয়া শক্ত।

প্রথম কথা, শিখার রূপ নেই। গুণ আছে অনেক, কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে লোকে তো মেয়ের রূপটা আগে দেখে। প্রভার নিজের রং মাজা মাজা, শরীরের বাঁধুনি আছে, মেয়েটা যে কী করে কালো আর বেঁটে হলো কে জানে। ওর বাবা বেশ লম্বা ছিল। শিখার পরে প্রভার আর একটি ছেলে জন্মেছিল, সে ছিল টুকটুকে ফর্সা। সবাই তাকে বলতো সোনার গৌরাঙ্গ। ভগবানের কী বিচার, ছেলেটাকে কালো করে মেয়েটাকে ফর্সা করতে পারতেন না ? পুরুষ মানুষ কালো হোক, ফর্সা হোক, বেঁটে হোক, লম্বা হোক কিছু আসে যায় না।

সম্বন্ধ করে মেয়ের বিয়ে দিতে গেলেই তারা জিজ্ঞেস করবে, মেয়ের মা সেলাই করে এতদিন সংসার চালিয়েছে কেন ? মেয়ের বাবা নেই।

মেয়ের বাবা যে থেকেও নেই।

মানুষ কত বিচিত্র হয়। অদ্ভুত মানুষের সংসার। শিখার বাবা বিশ্বেশ্বর ছিলো মেকানিক, যে-কোনো রেডিও, ঘড়ি, সেলাইকল, জলের পাম্প সারিয়ে দিতে পারতো চোখের নিমেষে। গম্ভীর ধরনের মানুষ, বাড়িতেও কথাবার্তা বলতো খুব কম। দমদমে একটা বড় দোকানে কাজ করতো, কোনোদিন তাকে কেউ বেচাল দেখেনি।

এই বিশ্বেশ্বর একদিন হঠাৎ উধাও হয়ে গেল। সবাই বলে, পুত্রশোক সহ্য করতে না পেরে বিবাগী হয়ে গেছে। একেবারে নিরুদ্দেশ। সবাই তা বিশ্বাস করলেও প্রভা কোনদিন বিশ্বাস করেনি। শিখারও ধারণা, তার বাবা হরিদ্বার-

লছমনঝোলার ওদিকে কোথাও সন্ন্যাসী হয়ে আছে। প্রভা সে ধারণা ভাঙতে চায় না।

ছেলের নাম ছিল গৌর। বড় প্রাণবন্ত, সুন্দর ছেলে, তাকে ভালো না বেসে পারা যায় না। বিশ্বেশ্বরের ছিল ছেলে অন্ত প্রাণ। শিখাকে সে কখনো তেমন ভাবে আদর করেনি, কিন্তু ছেলেকে নিয়ে তার আদিখ্যেতার শেষ ছিল না। প্রায় দিন ছেলের জন্য কিছু না কিছু কিনে আনতো। মাত্র দু'দিনের জ্বরে সেই ছেলে ধড়ফড়িয়ে মারা গেল, কী যে অসুখ তা বোঝারও সময় দিল না। গৌরের তখন মাত্র পাঁচ বছর বয়েস, শিখার এগারো।

ছেলের শোকে বিশ্বেশ্বরের একেবারে উন্মাদের মতন অবস্থা হয়েছিল। মাটিতে আছড়ে পড়ে কাঁদতো। তারপর ঠিক তিন দিনের মাথায় কারুকে কিছু না জানিয়ে বাড়ি ছেড়ে গেল চিরকালের মতন।

মায়ের চেয়ে বাবার শোক বেশি হয়? পুত্রহারা পত্নী আর অল্প বয়েসী কন্যাকে অসহায় অবস্থার মধ্যে রেখে যে পালায়, সে কি মানুষ না অমানুষ? এরকম স্বার্থপর লোকেরা সন্ন্যাসী হয়?

সবাই জানতো, বিশ্বেশ্বর এক বস্ত্রে গৃহত্যাগ করেছে, সঙ্গে কিছুই নেয়নি। তার মানিব্যাগটা পর্যন্ত রয়ে গিয়েছিল দেরাজে। কয়েকদিন খানিকটা সামলে উঠে একটা ব্যাপার আবিষ্কার করে দারুণ অবাক হয়েছিল প্রভা। আর কিছুই নিয়ে যায়নি বিশ্বেশ্বর, কিন্তু বাড়িতে যে তার কয়েকটা ছবি ছিল, সেগুলো নেই। একটা ছিল তার ফ্রেমে বাঁধানো ছবি, একটা বিয়ের পরপরই প্রভা ও বিশ্বেশ্বরের এক সঙ্গে, আর একটা অল্প বয়েসে ফুটবল খেলার টিমের এগারোজনের মাঝখানে। মোট এই তিনটি ছবি, সেগুলো অদৃশ্য হয়ে গেছে। আর কে নেবে সেই ছবি?

তখনই প্রভার সন্দেহ হয়েছিল, বিশ্বেশ্বরের আলাদা কোনো গোপন জীবন আছে। অন্য কোনো রমণীর সঙ্গে সম্পর্ক আছে। মাঝে মাঝে সে দোকানের কাজে পাটনা যেতে হবে, জামশেদপুর যেতে হবে, এই বলে দু'তিনদিন বাড়ি ফিরতো না। গৌরকে সে সত্যি ভালোবাসতো, গৌরের টানে সে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারেনি। গৌর চলে যাবার পর সেই দ্বিতীয় সংসারই তাকে টেনেছে। ছবি নেই বলে পুলিশেও তার খোঁজ পাবে না।

প্রভার এই সন্দেহ পরে অনেকটা দৃঢ় হয়েছিল। সে পাঁচ বছর পরের কথা। বিশ্বেশ্বর চলে যাবার পর সে কারুর দয়া-দাক্ষিণ্য চায়নি, শিখাকে নিয়ে সম্ভ্রম বাঁচিয়ে টিকে থাকার চিন্তাটাই তার কাছে প্রধান ছিল। যে-কোনো উপায়ে হোক মেয়েটাকে মানুষ করতে হবে, কিছুতেই আত্মসম্মান বিসর্জন দেবে না। দাঁতে

দাঁত চেপে লড়ে গেছে প্রভা, নিজে একবেলা না খেয়ে থেকেছে, তবু মেয়ের বই-খাতা-কলমের কোনো অভাব বুঝতে দেয়নি। সেলাইয়ের কাজ সে আগেই ভালো জানতো, এই সেলাই-ই তাকে বাঁচিয়েছে। যত অর্ডার পেয়েছে, সে কখনো না বলেনি, দিন-রাত পাগলের মতন সেলাই করে গেছে।

বছর পাঁচেক পর প্রভার এক মাসতুতো ভাই একটা খবর দিয়েছিল। রতন নামে সেই ভাইটি আসতো মাঝে মাঝে, সে কিছু কিছু সেলাইয়ের কাজও জোগাড় করে দিয়েছে।

সেই রতন বলেছিল, এখান থেকে অনেক দূরে, সিউড়ি শহরে নাকি সে বিশ্বেশ্বরকে দেখেছে। সেখানে সে রেডিও সারাবার ছোট্ট দোকান করেছে, একটা বাড়িতে তার বউ ছেলেমেয়েও আছে। দিদি, তুই আমার সঙ্গে সিউড়ি চল, চাক্ষুষ প্রমাণ হয়ে যাবে, দাড়ি রেখেছে অবশ্য, তাও তুই কি চিনতে পারবি না ? কেস ঠুকে দিলে জামাইবাবুকে জেলে ঘানি ঘোরাতে হবে।

প্রভা যেতে রাজি হয়নি। পাঁচ বছর লড়াই করার পর সে তখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। বাড়িতে বসেই যে-কোনো দরজির চেয়ে তার রোজগার বেশি। কেউ বলতে পারবে না, সে কখনো নারীত্বের অবমাননা করেছে। এখন কি সে আবার তার স্বামীকে পায়ে ধরে ফিরিয়ে আনতে যাবে ? তাকে সে শাস্তি দিতেও চায় না, তাতে সব জানাজানি হয়ে যাবে, শিখা মনে আঘাত পাবে। নাঃ, বিশ্বেশ্বর মুছে যাক তাদের জীবন থেকে।

শুধু এক একবার প্রভার ইচ্ছে হয়েছে, কাবুকে কিছু না বলে, রতনকেও সঙ্গে না নিয়ে, সে একা একা গোপনে সিউড়ি ঘুরে আসবে। বিশ্বেশ্বরের জন্য নয়, বিশ্বেশ্বর যে স্ত্রীলোকটির জন্য এই সংসার ছেড়ে চলে গেছে, একবার দেখে আসবে তাকে। কী তার আকর্ষণ। প্রভার চেয়ে তার রূপ, গুণ কোনটা বেশি ! বরাবরই প্রভার শরীরের গড়ন ভালো, অনেক মেয়ের তুলনায় তার গায়ের রঙ উজ্জ্বল, এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েসেও অনেকে তাকে যুবতী বলে মনে করে। শিখার সঙ্গে সে যখন রাস্তা দিয়ে যায়, তখন লোকে শিখার বদলে প্রভার দিকেই প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। তাতে প্রভা খুব লজ্জা পায়। সেই জন্যই প্রভা কখনো হাত-কাটা ব্লাউজ পরে না, রঙিন শাড়ি ব্যবহার করে না, খোঁপা বাঁধে না। মেয়ের জন্যই নিজের রূপ সে ঝরিয়ে ফেলতে চায়, শরীরের দাবিকে সে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে।

তের-চোদ্দ বছর ধরে এ বাড়িতে কোনো পুরুষ মানুষ নেই। স্বামী পরিত্যক্তা রমণীকে ছিঁড়ে খাবার জন্য শেয়াল, শকুনি, নেকড়ের অভাব নেই এ সমাজে।

প্রথম প্রথম দরদ দেখাবার জন্য অনেকে আসতো, প্রভা প্রথম দিনেই বুঝিয়ে দিত, এ বড় শক্ত ঠাঁই। জীবনে যাদের দেখেনি, এরকম কয়েকজন বিশ্বেশ্বরের আত্মীয় পরিচয় দিয়ে উদয় হয়েছিল, প্রভা তাদের সঙ্গে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে কথা বলেছে, ঢুকতেই দেয়নি বাড়িতে। প্রভার নিজের বাবা-মা চলে গেছেন অনেকদিন, দাদা-কিংবা ভাই নেই, আছে তার তিন বোন, তারা নিজেদের সংসার নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। মাসতুতো ভাই রতন এসে থাকতে চেয়েছিল এখানে, তাকেও পাত্তা দেয়নি প্রভা। রতনের নির্দিষ্ট কোনো উপার্জন নেই, সে গলগ্রহ হয়ে থাকতো। কোনো পুরুষ রক্ষীর দরকার নেই প্রভার, সে অবলা নয়।

একজন পুরুষ নিঃস্বার্থভাবে তাকে সাহয্য করেছে বেশ কয়েকবছর। এই বাড়ির বাড়িওয়ালা। দ্বিজেন কর্মকার ছিলেন সত্যিকারের ভালো মানুষ। কিন্তু তাঁর তিন ছেলের মধ্যে বড় দুটি ছেলে বখাটে ধরনের, দু'জনে দুটো রাজনৈতিক দলের ভিড়েছিল। বাপের অন্ন ধ্বংস করে।

বিশ্বেশ্বর অন্তর্হিত হবার পর জানা গিয়েছিল যে এ বাড়ির তিন মাসের ভাড়া বাকি রয়ে গেছে। সংসারের খরচপত্র সব বিশ্বেশ্বরই চালাতো, প্রভা বিশেষ কিছু জানতো না। দ্বিজেন কর্মকার সেই সময় এসে বললেন, মা, তোমার তো এখন মহা বিপদ, মেয়েকে নিয়ে খেয়ে পরে থাকতে হবে, বাড়ি ভাড়া জোগাড় করবে কী করে?

প্রভার তখন দিশেহারা অবস্থা, সে চুপ করে ছিল।

দ্বিজেন কর্মকার বলেছিলেন, আমি না হয় কয়েক মাসের ভাড়া নাই-ই বা নিলুম। তাতেও কি চলবে? বুড়ো হয়েছি, হঠাৎ যদি চোখ বুজি, আমার ছেলেরা তো ছাড়বে না? মেয়েকে নিয়ে তুমি পথে বসবে? তোমার স্বামী নেই, মাথার ওপর একটা আশ্রয় থাকাই সবচেয়ে বড় কথা। বাড়ির মধ্যে তুমি কী খাও না খাও, তা কেউ দেখতে আসছে না। ভদ্দরলোকের এই তো জ্বালা, পেটের ভাত না জুটলেও বাইরে মান-সম্মান বজায় রাখতে হয়।

দ্বিজেন কর্মকার তারপর পরামর্শ দিলেন, এই বাড়িতে থাকাটাই তোমাদের পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ। মাসে মাসে দেড়শো টাকা ভাড়া দিতে পারবে না, তুমি বরং এই বাড়িটা কিনে নাও।

প্রভা আঁতকে উঠেছিল। প্রথমে মনে হয়েছিল, এটা বাড়িওয়ালার একটা কূট চক্রান্ত। কুড়িয়ে বাড়িয়ে সব মিলিয়ে আড়াইশো টাকার বেশি সঙ্গতি নেই, সে এখন বাড়ি কিনবে কী করে? এটা একটা নির্মম রসিকতা নয়?

দ্বিজেন কর্মকার বললেন, টাকার কথা ভাবছো তো? গয়না-গাটি কী

আছে দেখো। গয়না বেচেও মাথার ওপর ছাদ কেনা অনেক ভালো। সোনা দানার চেয়েও জমি-বাড়ির দাম দিন দিন বেশি বাড়বে। আমি এই বাড়ি বেচে দেওয়ার কথা কিছুদিন ধরেই ভাবছি। আমি চোখ বুজলে আমার ছেলেরা বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে লাঠালাঠি করবে, মামলা-মোকদ্দমায় সব উড়িয়ে দেবে আমি জানি। তাই আগেই আমি জমি-বাড়ি সব বেচে দিতে চাই। তোমাদের তাড়িয়ে এ বাড়ি অন্য কারুকে বেচলে ধর্মে সইবে না। পরপারে গিয়ে কী জবাব দেব ?

দু'দিন ধরে চিন্তা করে দেখলো প্রভা। দ্বিজেনবাবুর যুক্তি সে বুঝলো। বাড়ি ভাড়া দিতে না পারলে ওর ছেলেরা এসে হামলা করবে। জোর করে তাড়িয়ে দিলে মেয়েকে নিয়ে সে কোথায় যাবে ! বাড়িটা নিজস্ব হলে তবু দরজা বন্ধ করে দিলে ভেতরে বসে থাকা যাবে। তরপর নুন-ভাত জুটুক বা না জুটুক, কেউ জানতে পারবে না।

বাড়ির দাম চোদ্দ হাজার টাকা। প্রভার সব গয়না বেচলেও ন' হাজার টাকার বেশি পাওয়া যাবে না। সে টাকা তাকে কে দেবে ?

পৃথিবীতে অনেক অভাবনীয়, অত্যাশ্চর্য ব্যাপার এখনো ঘটে। বাকি টাকাটা দিলেন ঐ বাড়িওয়ালা দ্বিজেন কর্মকার নিজেই। তিনি চুপিচুপি বললেন, আমি তোমাকে ছ'হাজার টাকা ধার দেবো। তুমি আস্তে আস্তে শোধ দিও। কেউ কিছু জানবে না। বাড়ি রেজিস্ট্রি করার সময় তুমি আমার ছেলেদের সামনে নগদ চোদ্দ হাজার টাকা গুনে দেবে !

পরে প্রভা বুঝেছিল, নিজস্ব বাড়ি হওয়ার জন্য তার কত না সমস্যা মিটে গিয়েছিল। দ্বিজেন কর্মকার একজন সামান্য অল্প শিক্ষিত লোক, বাজারের কাছে একটা ক্লাঠের দোকান চালাতেন, অথচ কত মহৎ মানুষ ছিলেন। তাঁর ছেলেরা আর ট্যাঁ-ফোঁ করার সাহস পায়নি। তারপরেও দ্বিজেন কর্মকার বেঁচে ছিলেন সাত-আট বছর, প্রভাকে প্রায় পাহারা দিয়ে রাখতেন। সেই আমলে চোদ্দ হাজার টাকার দাম ছিল, এখন এ বাড়ির মূল্য লাখ দেড়েক টাকা তো হবেই।

ওই দ্বিজেন কর্মকারই এক দর্জির দোকানের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন। শ্যামনগর আর কাঁকিনাড়ায় হেমেন ঘোষের দু'খানা বড় বড় দোকান। সেলাই মেশিনটা কিনে দিয়েছিলো সে। অর্ডার দিতে, ডেলিভারি দিতে হেমেন নিজেই আসতো। দ্বিজেন কর্মকারের সঙ্গে হেমেন ঘোষের তফাত আছে। তা তো থাকবেই, দুটো মানুষ এক হবে কী করে ? হেমেনের বয়স বেশি নয়, বেশ স্বাস্থ্যবান পুরুষ ছিল সে। হেমেন কাজের জন্য আসতো, তার

ঘন ঘন আসার জন্য পাড়ার লোক কেউ কেউ কুৎসিত ইঙ্গিত করতে ছাড়েনি। অনেকেই একটা রসের গল্প খোঁজে। দু'জন নারী-পুরুষকে দু'চারবার কাছাকাছি দেখলেই একটা অবৈধ সম্পর্ক কল্পনা করতে চায়। নিজেদের গোপন বাসনা অন্যের ওপর চাপায়।

হেমেন কখনো কু-প্রস্তাব দেয়নি, কখনো অসৎ ব্যবহার করেনি। টাকা পয়সা যেমন ঠিকঠাক দিত, তেমনি তার ব্যবহারটাও ছিল মাপা, প্রয়োজনের বেশি একটি কথাও সে বলতো না। তবে মাঝে মাঝে সে প্রভার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো। মুখের দিকে, শরীরের দিকে নয়। সে দৃষ্টির একটা ভাষা আছে, মেয়েরা ঠিক বুঝতে পারে। হেমেন যেন বলতে চাইতো, তুমি পুরুষ সঙ্গ বঞ্চিত একা রমণী, তুমি আমাকে পছন্দ করে আমার সঙ্গে নষ্ট হতে চাও, আমি রাজি আছি। আর যদি না চাও, তা হলে ঠিক আছে, আমি তোমাকে বিরক্ত করবো না।

দু'তিন বছর এরকম চলেছিল, হেমেন ওই ভাবে তাকালে প্রভাও চোখ সরাতো না। হেমেন মুখে কিছু না বললে সেও প্রত্যাখ্যানের ধমক দিতে পারে না। শুধু দৃষ্টিতে তো দোষ নেই। ততদিনে হেমেনের ওপর নির্ভরতা অনেক কমে গেছে, সেলাইয়ের জন্য বেশ নাম হয়েছে প্রভার। হেমেন গণ্ডগোল করলে সে হেমেনের বদলে অন্য দোকানের কাজ পেয়ে যাবে অনায়াসে।

হেমেন কিছুই বললো না, বছর তিনেক কেটে যাবার পর সে তার দৃষ্টি বদলে ফেলল। তারা দু'জনেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সংযমের দিক থেকে কেউ কারুর চেয়ে কম নয়। তারপর থেকে দু'জনে আর নারী-পুরুষ হিসেবে আলাদা রইলো না, হেমেনের ব্যবহার হলো প্রকৃত বন্ধুর মতন, সহজ, স্বাভাবিক। নানান বিষয়ে গল্প করত। শিখাকে কলেজে ভর্তি করার সময় সেই তো সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

বছর খানেক আগে একটা দুর্ঘটনায় হেমেনের কোমরে এমন চোট লেগেছে সে আর হাঁটাচলা করতে পারে না, বাড়ি থেকে বেরোয় না। এখন তার ছেলে রথীন আসা-যাওয়া করে। প্রভাই মাঝে মাঝে হেমেনকে দেখতে যায় তার কাঁকিনাড়ার বাড়িতে, নিকট আত্মীয়ের মতন তার বিছানার কাছে বসে থাকে। হেমেনের বউ বেঁচে নেই, তার জন্য লাউ-চিংড়ি, মোচার ঘণ্ট রেঁধে নিয়ে যায় প্রভা।

এতগুলো বছর শিখার গায়ে কোনো আঁচ লাগতে দেয়নি, এখন প্রভার মনে একটা চিন্তা কাঁটার মতন খচখচ করে। শিখা এখন নিজের পায়ে

দাঁড়িয়েছে। চাকরি পেয়েছে। সে প্রায়ই বলে মা তুমি সেলাই ছেড়ে দাও। তার মানে, এখন মেয়ের উপার্জনে সংসার চলবে। মেয়ের বিয়ে দিতে হবে না? বিয়ে হলে শিখা অন্য সংসারে চলে যাবে, তখন প্রভা একা হয়ে পড়বে। সে আর বামুনদিদি। তাতেও কি একাকিত্ব ঘুচবে? দু'জনে মিলে একা।

কিন্তু তখনো তো খাওয়া-পরার সমস্যা থাকবে। সেলাই ছেড়ে দিলে কে খাওয়াবে এই দু'জনকে। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে গিয়েও শিখা চাকরি করবে কি না কে জানে। যদি করেও, তার কাছ থেকে তখন টাকা নেওয়া যায় নাকি? ছি ছি।

খুব সহজে শিখার বিয়ে দেওয়া যাবে না। তার রূপ নেই। এ দেশে কালো মেয়েদের বিয়ে কি সহজে হয়? অনেক টাকা খরচ করলে, ঝনঝন করে টাকা বাজালে পাত্র পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু প্রভা অত টাকা পাবে কোথায়?

একমাত্র এই বাড়িটা সম্বল। বাড়ি বিক্রি করলে বেশ কিছু টাকা পাওয়া যাবে। এ বাড়ি তো শিখারই প্রাপ্য। কিন্তু বাড়ি বিক্রি করে দিলে বাকি জীবনটা প্রভা কাটাবে কোথায়?

ও মা, তা বলে কি মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করতে হবে না? সে যে চরম স্বার্থপরতা।

তিন

হাট-বাজার প্রভাকেই করতে হয় বরাবর। শিখা ওসব শেখেনি। বৃষ্টি-বাদলা শুরু হয়েছে। ছাতাটা খুঁজে পাচ্ছে না প্রভা। বামুনদিদি ভাঁড়ার ঘর থেকে একটা পুরোনো ছাতা এনে দিল। তারপর বললো, ও প্রভা, তুমি ছেলেটার বাড়ি একবার যাবে না।

প্রভা ভুরু কুঁচকে বললো, কোন ছেলেটা?

বামুনদিদি বললো, যে খুকির কাছে ঘন ঘন আসে, খালি চা খায় আর চা খায় আর বকবক করে। খুকির নাকি বন্ধু। হুঁঃ। তার খোঁজখবর নিতে হবে না?

প্রভা বললো, তপনের বাড়ি কোথায় আমি কী করে জানবো?

—বলেছিল না নৈহাটিতে থাকে?

—নৈহাটিতে গিয়ে আমি কোথায় খুঁজবো, একা একা হঠাৎ যাওয়া যায় নাকি?

—মেয়ের বাবা যখন নাই, তখন আর কে যাবে? ছেলের বাড়ি থিকা কি

কেউ সম্বন্ধ করতে আসে ? মাইয়া পক্ষকেই যেতে হয়।

—দাঁড়াও, আগে শিখা কি চায়, বুঝে নিই।

—ওরা যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘরের মধ্যে গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর করে, আমার কিন্তু বাপু এসব ভালো ঠেকে না। ঘি আর আগুন অত কাছাকাছি বেশিদিন থাকে ?

—বামুনদিদি, ওসব কথা বলো না। এখন যুগ পাল্টে গেছে। ছেলে-মেয়েরা গল্প করলেই খারাপ ভাবতে নেই।

—ওসব আমারে বুঝায়ো না। একটা কিছু বিপদ হয়ে গেলে তখন কেন্দেও কূল পাবে না।

প্রভা হাসলো। বামুনদিদিকে সত্যি বোঝানো যাবে না। বামুনদিদি এমনকি নিজের অধিকারের সীমাটাও বোঝে না। উল্টোপাল্টা কথা বলতে গিয়ে শিখার কাছে বকুনি খায়।

বিপদ আবার কী ? রেল স্টেশনে বড় বড় করে বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে, গর্ভপাত ? মারি স্টোপস ক্লিনিকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

অবিবাহিত ছেলেমেয়েরা রোজ ওই বিজ্ঞাপন দেখছে না ? বামুনদিদিদের আমলে কুমারী বা বালবিধবাদের গর্ভ সঞ্চার হলে আত্মহত্যা ছাড়া গতি ছিল না। এখন গর্ভপাত আইনসঙ্গত। কেউ ও নিয়ে বিশেষ মাথায় ঘামায় না। সমাজ বলে কিছু নেই, এমনকি এই মফস্বলেও।

তপন আর শিখা যখন গল্প করে, তখন প্রভা যে ঘরে যায় না বটে, কিন্তু কৌতূহল তো থাকেই। জানলা দিয়ে হঠাৎ হঠাৎ চোখ যায়। ওরা দু'জনে কখনো খুব ঘেঁষাঘেষি করে বসে না, হাত ধরাধরি করে না, বিসদৃশ কিছুই চোখে পড়েনি। তপন অনবরত চা আর সিগারেট খায়, চুমু টুমু খেতে চায় বলে তো মনে হয় না।

এখনকার ছেলে মেয়েরা এটা পারে।

বাজারের থলি নিয়ে বেরিয়ে পড়লো প্রভা, বামুনদিদির কথাটা সে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলো না। ওরা দুটিতে যখন পরস্পরকে এত পছন্দ করে, তখন বিয়ে করলেই তো পারে। তা হলে প্রভাকে অবশ্যই একবার পাত্রপক্ষের বাড়িতে যেতে হয়। সে একা যাবে ? আর তো কেউ নেই। এই সময় রতন এলে তাকে সঙ্গে নেওয়া যেত। কিন্তু সে যে কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায়।

বাজারের প্যাচপ্যাচ করছে কাদা, বৃষ্টি পড়েই চলেছে। প্রভা ইচ্ছে করেই

বেলা করে আসে। সকালের দিকে ভিড় হয় বেশি, লোকজনের গা ঘেঁষাঘেঁষি সে সহ্য করতে পারে না। দেরি করে এলে মাছ পাওয়া যায় না ইচ্ছে মতন। এমনিতেই বেশি মাছ ওঠে না। সব ভাল মাছ চলে যায় কলকাতায়। সত্যি কথা, ডেইলি প্যাসেঞ্জাররা কেউ কেউ কলকাতা থেকে ফেরার সময় মাছ কিনে নিয়ে আসে।

শিখা মাংস ভালবাসে না, ডিম তো ছুঁয়েই দেখে না, মাছই বেশি পছন্দ করে। এখন যা মাছ রয়েছে, তার ওপর মাছি ভ্যান ভ্যান করছে। তেলাপিয়াগুলো পর্যন্ত সরু। আজ শিখার অফিস ছুটি, বেশিক্ষণ পর্যন্ত ঘুমোবে, আজ ওকে ভালো মাছ কিছু খাওয়ানো যাবে না? এক জায়গায় কাটা পোনা পাওয়া যাচ্ছে, ওপরের চামড়ার ম্লান ভাব দেখলেই বোঝা যায় তেমন টাটকা নয়, তবু তাই-ই নিতে হবে।

শিখাকে কখনো বাজারে পাঠায়নি প্রভা। পড়াশুনোর ক্ষতি হবে বলে রান্নাও শেখায়নি। বাড়ির কাজ বিশেষ কিছু জানে না। যদি বিয়ে করে, শ্বশুরবাড়ি কেমন হবে কে কে জানে। যদি ওকে মোচা কিংবা থোড় কুটতে বলে? চাকরি করা মেয়েদের আজকাল এসব শিখতে হয় না।

হঠাৎ প্রভার বুকটা কেঁপে উঠলো। সত্যি সত্যি শিখা চলে যাবে পরের বাড়িতে? তারপর প্রভা কী নিয়ে বাঁচবে? বিশ্বেশ্বর চলে যাবার তার একটা জেদ ছিল, কারুর সাহায্য না নিয়ে, নিজের চেষ্টায় সে মেয়েকে শিক্ষায়-দীক্ষায় উপযুক্ত করে তুলবে। বাবা যদি দায়িত্ব এড়িয়ে যায়, মা একা পারবে না কেন? সেই জেদের বশে সে এতদিন চলেছে।

এখন মেয়ে বড় হয়েছে, সে নিজের দায়িত্ব নিতে পারবে। এখন যদি সে অন্য বাড়িতে, স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে চলে যায়, তা হলে প্রভা কী নিয়ে বাঁচবে?

মা হয়েও প্রভা একদিন ভেবেছিল শিখার বিয়ের আশা কম। মায়েরা সব সময় নিজের সন্তানদের সুন্দর দেখে। শিখা যখন ছোট ছিল, তখন প্রভারও মনে হতো, রং কালো তো কী হয়েছে, তার মেয়ের মুখখানি ভারি মিষ্টি। কালো মেয়ে কি সুন্দর হয় না? কিন্তু বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বোঝা গেছে শিখার মুখের গড়নটাও তেমন সুন্দর নয়, অনেকটা পুরুষালি, বাবার ধরনের। মেয়েটা যদি আর একটু লম্বা হতো!

সম্বন্ধ করা বিয়ের বাজারে শিখার বর জোটানোর সম্ভাবনা খুব কম। কিন্তু প্রেমের বিয়েও তো হতে পারে। ভালবাসার চোখে কে যে কাকে সুন্দর দেখে,

যা অন্য কেউ বুঝবে না। তপন নিশ্চয়ই শিখাকে পছন্দ করেছে, নইলে এত ঘন ঘন আসবে কেন ? তপনের চেহারা টেহারা তো মন্দ নয়, তার কি অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে ভাব হতে পারতো না ?

আবার প্রভার বুক কেঁপে উঠলো।

তপন বিশেষ কোনো মতলবে আসে না তো ? তপন কী ছাই চাকরি করে বোঝা যায় না, মাঝে মাঝে দুপুর বিকেলেও এসে বসে থাকে। বিনি পয়সায় চায়ের লোভে আসে ? ও নিজে বোধহয় বেকার, কিংবা খুব সামান্য রোজগার, একটা চাকরি-করা বউ চায়। বাড়িটার ওপর লোভ করেনি তো ? কয়েকবার এসেই নিশ্চয়ই তপন বুঝেছে, শিখাই এ বাড়িটার মালিক হবে।

তার মেয়েকে ঐ তপন যদি ঠকায় ? কাগজে প্রায়ই বেরোয়, সম্পত্তির লোভে, গয়না-টাকা-পয়সার লোভে কোনো মেয়েকে বিয়ে করে তারপর স্বামীটা বউকে মেরে ফেলে। গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়।

একটা চেনা রিকশাওয়ালাকে ডেকে প্রভা বললো, ও ফটিক, তুমি আমার এই বাজারের থলেটা বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসো তো। আমি একটা কাজে যাবো।

স্টেশনে এসে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো প্রভা। তপন বলেছিল, নৈহাটি স্টেশনের কাছেই বাজারের পাশে ওদের বাড়ি। চাকলাদার পদবি আর ক'জনের হয়। একটু খোঁজ করলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

নৈহাটি লোকাল এলো সতেরো মিনিট পর। উল্টোদিকের ট্রেন এইসময় একটু ফাঁকা থাকে। দৌড়াদৌড়ি না করে সামনের কামরাটাতেই উঠে পড়লো প্রভা। উঠেই তার চক্ষুস্থির হয়ে গেল।

সেই কামরারই এক কোণে তপন বসে আছে, তার পাশে একটি শিখারই বয়েসী মেয়ে। এ মেয়েটিও দেখতে ভাল নয়, গায়ের রং শুধু কালো নয়, চামড়া খসখসে, বেশ রোগা, মাথায় চুল কম। তার সঙ্গে হাত-পা নেড়ে গল্প করে যাচ্ছে তপন, মেয়েটা মুগ্ধ হয়ে শুনছে।

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, এখন আর নেমে পড়ার উপায় নেই।

ওদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে, দরজার ধারে বসলো প্রভা। পরের স্টেশনেই নেমে যেতে হবে। মাসিক টিকিট কেটে তপন কি ট্রেনে ট্রেনেই ঘুরে বেড়ায় ? বেছে বেছে অসুন্দর মেয়েদের সঙ্গে ভাব করে। যে-সব মেয়েদের বিয়ে হবার সম্ভাবনা নেই, তারা তপনের মতন একজন বন্ধু পেয়ে বর্তে যায়।

না, না, প্রভা এসব কী ভাবছে ? এরকম কিছু নাও হতে পারে। হয়তো এই মেয়েটি তপনের আত্মীয় কিংবা পাড়ার মেয়ে। শিখার সঙ্গে ভাব করেছে

বলে তপন কি অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা বলবে না ?

কৌতূহল চাপতে না পেরে প্রভা একবার আড় চোখে তাকালো। সাধারণ কথাবার্তা আর প্রেমের কথাবার্তার ধরনই আলাদা। চাহনি অন্য রকম হয়ে যায়। শিখার সঙ্গে যেমন মগ্ন হয়ে কথা বলে, তপন এখনো ঠিক সেইভাবে বলছে। টুকরো টুকরো শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, মধ্যপ্রদেশের কোনো জঙ্গলের গল্প।

তপন ঠিক দেখতে পেয়ে গেল। উঠে এসে বললো, একী, মাসিমা, আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?

প্রভা এমন মুখের ভাব করলো যেন তপনকে সে এইমাত্র দেখেছে। সে বললো, আমি মোটে এক স্টেশন যাবো। তুমি, তুমি আজ অফিস যাওনি ?

তপন অবহেলার সঙ্গে বললো, আমার রোজ না গেলেও চলে।

প্রভার পাশে বসে পড়ে বলালো, আপনি নৈহাটি চলুন না, আমাদের বাড়িটা দেখে আসবেন।

প্রভা ত্রস্তে বলে উঠলো, না, না, আমার একটা কাজ আছে। আর একদিন, শিখা যদি যেতে চায়।

তপন বললো, শিখা দু'দিন আমাদের বাড়ি ঘুরে গেছে।

তপনের ব্যবহারে কোনো আড়ষ্টতা নেই। ট্রেনের গতি কমে এসেছে, প্রভা উঠে দাঁড়াতেই সে বললো, শিখাকে বলবেন, কাল বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময় আমি ওর জন্য শিয়ালদা স্টেশনে অপেক্ষা করবো।

প্রভার মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ধরা-পড়া চোরের মতন। সে গোপনে তপনের বাড়ি দেখে আসতে চেয়েছিল, তপন কি তা বুঝে গেছে, সেইজন্যই বললো, চলুন আমাদের বাড়ি ?

প্রভা ঠিক করলো, এবার একদিন শিখার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতেই হবে।

তার আগে শিখাই একটা সাঙ্ঘাতিক খবর দিল।

পরদিন তপন সঙ্গে আসেনি, ট্রেন লেট হওয়ার জন্য দেরি করে ফিরলো শিখা। একতলার বাথরুমে গা ধুতে গিয়ে একটা গিরগিটি দেখতে পেয়ে চ্যাঁচামেচি করলো খানিকক্ষণ। বামুনদিদির সঙ্গে নিত্য নৈমিত্তিকভাবে কথা কাটাকাটি হলো একবার। ওপরে সেলাই মেশিন চালাতে চালাতে প্রভা সব শুনছে।

শিখা দোতলায় এসে কাপড় বদলালো, চুল আঁচড়ালো, একটুক্ষণ রেডিও শুনলো। তারপর বাইরে এসে প্রভার সেলাই মেশিনটা থামিয়ে দিয়ে বললো, মা, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

প্রভার বুকটা ধক্ করে উঠলো। আজই কি শিখা ওর বিয়ের কথা বলবে ? তপন ঠিক কেমন ছেলে, এখনো যে বোঝা গেল না।

শিখা বললো, মা, অফিস থেকে আমাকে দুর্গাপুর ট্রান্সফার করছে।

প্রভা প্রায় আঁতকে উঠে বললো, অ্যাঁ ? সে কি ? তোকে যেতে হবে নাকি ?

শিখা বললো, ট্রান্সফার অর্ডার হলে যেতে হবে না ? বাসন্তী আমাদের সঙ্গে কাজ করে, তোমাকে বলেছি তো বাসন্তীর কথা, আসলে ট্রান্সফার করেছিল ওকে। কিন্তু বাসন্তীর দুটো ছেলেমেয়ে দমদমে ইস্কুলে পড়ে। ওর পক্ষে যাওয়া খুব মুশকিল। সেইজন্য আমাকে যেতে হবে। আমার তো ওসব ঝঞ্ঝাট নেই !

—কেন, তোকেই যেতে হবে কেন ? আরও পুরুষ মানুষও তো কাজ করে তোদের অফিসে।

—কেউই কলকাতা ছেড়ে সহজে যেতে চায় না। যারা বিয়ে টিয়ে করেছে, তাদের পক্ষে যাওয়াও অনেক অসুবিধের। আমার তো কেউ নেই।

—তোর কেউ নেই ?

—তুমি আছো ! কিন্তু মা-বাবা থাকার ব্যাপারটা অফিস বোঝে না। মা অসুস্থ, শয্যাশায়ী একথাও তো বলতে পারবো না। ভালোই হবে কিন্তু, ওখানে কোয়ার্টার দেবে, তুমি মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতে পারবে। তোমার তো কোথাও যাওয়া হয় না।

—আমি এ বাড়ি ফেলে যাবো কী করে ?

—বামুনদিদিকে রেখে যাবে। দু'চারদিনের জন্য লোকে বাইরে যায় না ! এখানে রোজ রোজ ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করে অফিস যাওয়া, ভিড়ে যা কষ্ট হয় ! ওখানে কোয়ার্টারের পাশেই অফিস, হাঁটা পথ। বেশ খোলামেলা জায়গা।

—তুই অতদূরে একা একা থাকবি ?

—প্রথম কথা, দুর্গাপুর এমন কিছু দূর নয়। ইচ্ছে করলে শনি-রবিবার বাড়ি ঘুরে যেতে পারি। আর একা একা মানে—

—তুই তো আগে কোনোদিন বাইরে বাইরে থাকিসনি !

—মা, মানুষের যত বয়েস বাড়ে, ততই আগে করেনি এমন অনেক কিছু করতে হয়।

—একা থাকতে তোর ভয় করবে না ?

—একটু একটু করবে। সে ব্যাপার ভেবেছি। তপন দুর্গাপুরে গিয়ে আমার সঙ্গে থাকতে চায়।

যেন একটুক্ষণের জন্য প্রভার রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেল।

মনে পড়লো, রেলের কামরায় সেই দৃশ্য। অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে তপন। বেলা সওয়া দশটায়। এ কথাটা শিখাকে জানাতেই হবে।

শিখার চোখে চোখ রেখে প্রভা প্রায় ফিসফিস করে বললো, তুই তপনকে বিয়ে করছিস ?

আস্তে আস্তে দু'দিকে মাথা দুলিয়ে শিখা বললো, না।

প্রভার আবার সব কিছু গুলিয়ে গেল। নিজের মেয়ে, এতকাল ধরে তাকে দেখছে, অথচ এখন শিখার কথাবার্তা যেন সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য লাগছে।

প্রভা বললো, তুই কী বলছিস, খুকী! ওকে বিয়ে করবি না, অথচ দুর্গাপুরে নিয়ে যেতে চাস।

ফিক করে হেসে ফেলে শিখা বললো, তাতে কী হয়েছে ? ও বেচারার চাকরি নেই, নিশ্চয়ই এতদিনে বুঝেছো, দুর্গাপুরে আমার কাছে থেকে একটা কিছু খুঁজে নিতে পারবে। ওখানে কন্ট্রাকটরদের কাছে বলে কয়ে চাকরি করিয়ে দেওয়া যায়।

—তোর বাড়িতে থাকবে ?

—হ্যাঁ। তুমি যেমন বামুনদিদিকে আশ্রয় দিয়েছো, সেই রকম আমি একজনকে আশ্রয় দিতে পারি না ?

—বামুনদিদি আর একজন পুরুষ মানুষ কি এক হলো ? তোর যদি তপনকে পছন্দ হয়, তা হলে ওকে বিয়ে করবি না কেন ? তপন রাজি নয় ?

—তপন রাজি হলেও আমি রাজি নই।

—কেন রে খুকী, কেন এই কথা বলছিস ?

—এই জন্য রাজি না, বাবা যেমন তোমাকে ফেলে চলে গিয়েছিলেন, সেইরকম তপনও যদি হঠাৎ আমাকে ছেড়ে চলে যায় ? ওকে আমি সে সুযোগ দেব কেন ? তপনের পক্ষে সেটা অসম্ভব কিছু নয়, ওর মধ্যে একটা উড়ু উড়ু ভাব আছে। ওর আগে একবার বিয়ে হয়েছিল, ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে অনেকদিন।

—অ্যাঁ ? আগে একটা বিয়ে হয়েছিল ? আমাকে কখনো বলেনি তো !

—সে দোষ তুমি ওকে দিতে পারো না, মা ! তুমি কি ওকে জিজ্ঞেস করেছো ? কেউ কি নিজে থেকেই বলে যে, আমি আগে একটা বিয়ে করেছিলুম, এখন আমার সে বউ নেই।

প্রভার মনে পড়লো, অনেকবার এই প্রশ্নটা মনে এসেছে, তবু মুখ ফুটে

জিজ্ঞেস করা হয়নি। তপনের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়েছিল সে অবিবাহিত। এই বয়সেই সে একটা বিয়ে চুকিয়ে ফেলেছে!

প্রভা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললো, ওর উড়ু উড়ু ভাব আছে জেনেও তুই ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছিস ?

শিখা বললো, মা, আমি তো রোজ আয়নায় নিজেকে দেখি। নিজের সম্পর্কে আমার কোনো ভুল ধারণা নেই। যাদের সবাই আদর্শ স্বামী বলে, সেরকম কেউ আমাকে বিয়ে করবে না আমি জানি।

—আহা, রং ময়লা হলে বুঝি তার বিয়ে হয় না। তুই-ই তো এতদিন না না করেছিস। এবার তোর জন্য পাত্র খুঁজবো, তপনের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখিস না।

—তুমি কী করে পাত্র খুঁজবে মা ? কাগজে বিজ্ঞাপন দেবে, মাঝে মাঝেই একটি করে বরপক্ষ আসবে, আমাকে দেখতে, চপ-কাটলেট-মিষ্টি খাবে, তারপর আমাকে অপছন্দ করে চলে যাবে। তুমি কি মনে করো, সেই অপমান সহ্য করতে আমি রাজি হবো ? তাহলে আমাকে লেখাপড়া শেখালে কেন ? যদি বা ঐসবে রাজি হই, তা হলেও শেষ পর্যন্ত কোনো বুড়োহাবড়া, কানা-খোঁড়া বা দোজবরে বা আধপাগলা বর জুটবে আমার। বিয়ে করে আমাকে দাসী-বাঁদী করে রাখতে চাইবে। কোনো সুস্থ, স্বাভাবিক, সচ্ছল পরিবারের লোক আমার মতন একটা মেয়েকে বিয়ে করতে চাইবে কেন ? আমার চেয়ে অনেক ভালো চেহারার মেয়ে সে পেয়ে যাবে।

—তুই অমন করে বলিস না তো খুকী। আমার সহ্য হয় না।

—যেটা সত্যি, সেটা তো মেনে নিতেই হবে মা ! আমার ভাগ্য ভালো যে তপনের মতন একটা বন্ধু হয়েছে ! ও মানুষটা খুব খারাপ নয়। মাঝে মাঝে আমার কাছ থেকে দু' দশ টাকা নেয়। তাতেই খুশি।

—তোর কাছ থেকে টাকা নেয় ?

—ভয় পাচ্ছো কেন, বেশি নেয় না। কখনো বেশি চাইলেও দেব না। জোর করার শক্তি ওর নেই। আমি তো ভেবে রেখেছিলুম, সারা জীবন আমাকে একাই কাটাতে হবে। মনে মনে তার জন্য তৈরিও ছিলুম। হঠাৎ তপনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। ভিড়ের ট্রেনে একজন পুরুষ সঙ্গী থাকলে মেয়েদের কত যে সুবিধে হয় ! তপন বেশিদিন হয়তো টিকবে না। যদি এক-দু'বছরও থাকে আমার কাছে, সেটাই বা মন্দ কী ! দুর্গাপুরে ও আমার কাছে হাত-পাতা অবস্থায় থাকবে। আমি ওকে খাওয়াবো, পরাবো। যেমন স্বামীরা বউকে খাওয়া-পরা

দেয়, আমার বেলায় সেটা হবে উল্টো। তাতে যে আমার কতটা আনন্দ হবে, বুঝতে পারছো না ?

—তা বলে তুই বিয়ে না করে একজন পুরুষ মানুষের সঙ্গে থাকবি, লোকে কী বলবে, সেটা তুই ভেবে দেখছিস না ?

—লোক কোথায় মা ? আজকাল কে কাকে নিয়ে মাথা ঘামায় ? দুর্গাপুরে কে জানবে, ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে কি না ? সেইজন্যই তো দুর্গাপুরে যাওয়াটা আমার পক্ষে বেশি দরকারি। এখানে থাকলে বরং...অনেক চেনাশুনো...তারা নাক গলাতো।

—আমি এখনো মানতে পারছি না, খুকী ! এ কখনো হয় ? এ যে ব্যভিচার !

—খুব ভালো করে ভেবে দ্যাখো মা ! ব্যভিচার আবার কী ? ধরো, আমি তপনকে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করলুম, তখন সে আইনসঙ্গতভাবে আমার সঙ্গে এক ঘরে থাকতে পারবে, তাই তো ? দু'বছর বাদে সে যদি আমাকে ছেড়ে পালিয়ে যায়, আমি তাকে আটকাতে পারবো ? বাবাকে তুমি আটকাতে পেরেছিলে ? পুরুষরা ইচ্ছে করলেই পালাতে পারে। তা হলে ঐ রেজিস্ট্রি করে বিয়েটা শুধু শুধু একটা ফার্স না ? এটাও বুঝি ব্যভিচার না ?

—তুই দুর্গাপুর যাবিই ঠিক করেছিস ?

—হ্যাঁ মা। চাকরি করতে গেলে অফিসের কথা তো শুনতেই হবে। তপনকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো।

—তুই বামুনদিদিকে বলিস না, তপনের কথাটা বলিস না।

শিখা এবার হেসে ফেললো। কাছে এসে প্রভার গলা জড়িয়ে ধরে বললো, আমার মা-টা কত সুন্দর। পৃথিবীতে এত ভালো মা আর নেই। আমি কেন তোমার মতন রূপ পেলুম না। বাবা সন্ন্যাসী হয়ে গেল, তোমাকে ছেড়ে, আমি যদি পুরুষ মানুষ হতুম, তোমাকে কখনো ছেড়ে যেতুম না।

মেয়ের কাছ থেকে আদর পেয়ে চোখে জল এসে গেল প্রভার।

একটু পরে শিখা আবার বললো, মা, একটা কথা আমি আগে কখনো ভাবিনি, তপনের সঙ্গে আলাপ হবার পরই প্রায়ই মনে হচ্ছে। আচ্ছা মা, বাবা চলে যাবার পর তুমি কেন আবার বিয়ে করলে না ? তোমার বয়েস তখন মাত্র ত্রিশ-একত্রিশ, চেহারা ভালো ছিল।

ছিটকে সরে গিয়ে প্রভা বললো, যাঃ, কী বলছিস, ছি ছি, ওসব বলতে নেই।

শিখা জোর দিয়ে বললো, কেন বলতে নেই ? ভাই মরে গিয়েছিল, সেটা

তো তোমার দোষ নয়। একজন পুরুষ মানুষ ইচ্ছে মতন তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে, আর তুমি সারাজীবন সে জন্য কেন বঞ্চিত থাকবে? পুরুষদের সঙ্গে আর কিছু হোক বা না হোক, নিরালায় বসে কথা বলতেও ভালো লাগে। সেটা আমি এখন বুঝেছি। আর বিয়ে না হয় করোনি, তোমার একজন ঘনিষ্ঠ পুরুষ বন্ধুও তো থাকতে পারতো! সেরকমও তো কারুকে দেখিনি।

প্রভা বললো, ওসব কথা আমি কখনো ভাবিওনি। ভাবার সময়ও ছিল না রে!

—বাবা চলে যাবার পরেও কি তুমি তাকে ভালোবাসতে? স্বামী হিসেবে ভক্তিশ্রদ্ধা করতে?

—নাঃ, ওসব আর ছিল না।

—আমার সন্ন্যাসী বাবার সঙ্গে যদি দেখা হতো, তাকে আমি জিজ্ঞেস করতুম—

—কী জিজ্ঞেস করতিস?

—সে আমার সঙ্গে তার একটা বোঝাপড়া হতো। তুমি কেন নিজেকে বঞ্চিত করলে মা? এতগুলো বছর, শুধু সংসার আর খাটুনি আর সেলাই ফোঁড়াই, তোমার জীবনটা বৃথাই গেল!

—ওসব কথা বলিস না তো খুকী! মোটেই আমার জীবন বৃথা যায়নি।

—কেন তুমি নিজেকে বঞ্চিত করেছো, তা আমি জানি। আমার জন্য। অন্য পুরুষের সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক আছে দেখলে পাছে আমি কিছু মনে করি, আমি দুঃখ পাই, তাই তুমি অন্য সবাইকে দূরে সরিয়ে রেখেছো। অল্প বয়সে সেরকম কিছু দেখলে আমি দুঃখ পেতুমও হয়তো। তুমি আমার জন্য আত্মত্যাগ করেছো। মা, আর আমার জন্য তোমার কিছু করতে হবে না। এখন থেকে তুমিই হবে আমার মেয়ের মতন। আমি দুর্গাপুরেই যাই আর যেখানেই যাই, আসলে কিন্তু তোমার থেকে দূরে সবে যাচ্ছি না। তোমাকে আমি কখনো ছেড়ে যাবো না।

চার

আগে কাজের মধ্যে এক একটা দিন কেটে যেত খুব তাড়াতাড়ি, সোমবার শুরু হতে না হতেই এসে যেত শনিবার। এখন দিন আর কাটতেই চায় না।

শিখা চলে গেছে, প্রায় দেড় মাস হয়ে গেল। এর মধ্যে তার পাঁচখানা চিঠি এসেছে। প্রত্যেকটা চিঠিই যে কতবার করে পড়েছে প্রভা, তার ঠিক নেই। মুখস্থ হয়ে গেছে, তবু আশা মেটে না, আবার পড়তে ইচ্ছে হয়।

শিখা ভালো আছে, দুর্গাপুরে কোয়ার্টার গুছিয়ে নিয়েছে। সব চিঠিতেই লেখে, মা তুমি কবে আসবে ? আসবে না ?

তপনের কথা একবার উল্লেখ করেছে মাত্র। আর কিছু লেখে না। কিন্তু তপন ওখানেই আছে, প্রভা বুঝতে পারে। শিখা লিখেছে, 'তুমি আমাকে বাজার করতে শেখাওনি, ভাগ্যিস এখানে এসেও আমাকে বাজার করতে হয় না।' বোঝাই যাচ্ছে কে বাজার করে দেয়। আর এক জায়গায় লিখেছে, 'ছোটবেলা থেকেই মেঘলা দিনে বাজের গর্জন শুনলে আমার ভয় করে। বড় হয়েও সেই ভয়টা গেল না। গত শনিবার এখানে দারুণ দুর্যোগ, সারাদিন ঝড় আর বৃষ্টি, আমার কোয়ার্টারের খুব কাছেই একটা গাছতলায় বাজ পড়ে একটা ছেলে মারা গেছে। সেই সময় আমার ঘরের দরজা-জানলা ঝনঝন করে কেঁপে উঠেছিল। সেই সময় একলা থাকলে আমি বোধহয় ভয়েই মরে যেতুম।'

বিয়ে হলে মেয়ে দূরেই চলে যেত। চাকরির জন্যও দূরে যেতে হয়। কিন্তু দুটোতে তফাত আছে। মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে মা গিয়ে থাকতে পারে না। ছেলের বাপ-মা সঙ্গে থাকতে পারে, মায়ের বাপ-মা সঙ্গে থাকতে পারে না, আমাদের দেশে এটাই নিয়ম।

মেয়ে চাকরি করতে দুর্গাপুরে গেছে, সেখানে নিজস্ব কোয়ার্টার পেয়েছে, সেখানে মা তো যেতেই পারে। প্রভার মাঝে মাঝে খুব ইচ্ছে করে যেতে। দুর্গাপুরে সে কখনো যায়নি। শিখার কোয়ার্টারটা কী রকম একবার দেখে আসতে পারলে পরে মানসচক্ষে দেখা যেত শিখা কোন্ ঘরে ঘুমোয়, কখন রান্নাঘরে যায়, জানলা দিয়ে বাইরের কী কী দেখে।

আগে ভেবেছিল, এ বাড়ি ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এখন মনে হয়, দু'চারদিনের জন্য বামুনদিদির ওপর ভার দিয়ে গেলেও চলে। বামুনদিদি আপনজনের মতনই হয়ে গেছে, অবিশ্বাসের কিছু করবে না। চোর-ডাকাতরাই বা এ বাড়িতে এসে কী পাবে, সেরকম দামি জিনিস তো কিছুই নেই। সেলাইকলটাও অনেক পুরোনো হয়ে গেছে।

তবু, মনের দিক থেকে একটা বাধা আছে। সেটা কিছুতেই কাটাতে পারছে না প্রভা। বিয়ে করেনি শিখা, কিন্তু তার সঙ্গে একজন পুরুষ মানুষ থাকে। আগেকার দিনে এটা কল্পনাও করতে পারতো না। শিখা একটুও গোপন না করে কী রকম অবলীলাক্রমে মাকে জানিয়ে দিল। যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিল, এতে কোনো পাপ নেই। পাপ-পুণ্য নিয়ে কেই বা আজকাল মাথা ঘামায়। বিয়ে করার পর নারী আর পুরুষ এক সঙ্গে থাকলে পাপ হয় না, কিন্তু বিয়ের পর

স্ত্রীকে ছেড়ে কোনো স্বামী যদি চলে যায়, সেটাকে তো কেউ পাপ বলে না! স্বামীকে ছেড়ে যদি স্ত্রী চলে যায়, তাকে পাপীয়সী, কুলটা কত কী বলে!

যুক্তি দিয়ে বুঝলেও মন মানে না। শিখার ওখানে গেলে তপন চোখের সামনে ঘুরবে-ফিরবে, রাত্তিরে শিখার সঙ্গে এক ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেবে, এটা কি প্রভা সহ্য করতে পারবে?

লেখাপড়া জানা মেয়েকে শাসন করা যায় না। তার ওপর জোর ফলানো যায় না। প্রভা যদি তপনকে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ঘোর আপত্তি জানাতো, তা হলেও কি শিখা সেটা মানতো?

স্বামী নয়, আশ্রিত, এই ব্যাপারটা অবশ্য প্রভার খুব পছন্দ হয়েছে। তখন শিখার ওপর কোনো অধিকার ফলাতে পারবে না। তার চাকরি নেই, তাকে খাওয়াবে শিখা, জামা-কাপড় কিনে দেবে, বিড়ি-সিগারেট খাবার জন্য তপনকে শিখার কাছেই হাত পাততে হবে। শিখা যে-রকম তেজী মেয়ে, তপন কখনো বাড়াবাড়ি রকম অবাধ্যপনা করলে সে স্রেফ তপনকে বলে দেবে, তুমি আমার বাড়ি থেকে চলে যাও!

বেশ হয়েছে! পুরুষরা বুঝুক, অন্যের অধীনে থাকতে কেমন লাগে!

বামুনদিদি মাঝে মাঝে বলে, আহা খুকীটা একা একা অতদূর গেল, অর জইন্য খুব চিন্তা হয়। মাইয়া মানুষ কি বিদেশে একা থাকতে পারে?

শিখা যে দুর্গাপরে একা নেই, এ কথাটা বামুনদিদিকে বলা যায় না। শিখাকেও প্রভা বারবার অনুরোধ করেছিল, বামুনদিদিকে তপনের কথাটা বলিসনি!

বামুনদিদি কে? একটা অসহায় রিফুইজি বিধবা। এ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে তাকে রাস্তায় ভিক্ষে করতে হবে। এতই বয়েস যে কেউ তাকে ঝি বা রাঁধুনির চাকরিও দেবে না। তবু তাকেই ভয় পায় কেন প্রভা? লোকলজ্জা এমনই জিনিস। যতই ঝগড়া করুক, বামুনদিদি শিখাকে খুব ভালোবাসে, নিজের নাতনীর মতন। তবু শিখা-তপনের সম্পর্কটা প্রভা মেনে নিতে পারলেও বামুনদিদি কিছুতেই পারবে না। কষ্ট পাবে, শুধু শুধু বুড়িকে কষ্ট দিয়ে লাভ কী?

সেলাই করতে বসে প্রভা মাঝে মাঝেই অন্যমনস্ক হয়ে যায়। থেমে যায় পা। এই সংসারটা চালাবার জন্য টাকা-পয়সার প্রয়োজন আছে ঠিকই, তাহলেও শিখা নেই বলে সব কিছুই অর্থহীন মনে হয়। মেয়ের টাকায় অন্ন জোটানোর কথা সে একবারও চিন্তা করে না। এখনো প্রভার চোখ একটুও নষ্ট হয়নি, শরীরে জোর আছে, আরও অনেকদিন সে সেলাই চালিয়ে যেতে পারবে। তার সুনাম আছে, সবাই তাকে কাজ দিতে চায়।

বাড়ির সামনে একটা রিকশা থেমেছে, দরজার কড়া নাড়ছে কে যেন।

বামুনদিদিকে বলা আছে, সে কখনো দরজা খুলবে না। দিনকাল ভালো নয়। বড় রাস্তায় দুই রাজনৈতিক দলে প্রায়ই বোমাবাজি হয়। পুলিশ এসে তাড়া করলে সেই বোমাবাজরা দৌড়ে গলিতে ঢুকে যে-কোনো বাড়িতে ঢুকে পড়ে। দ্বিজেনবাবুর ছেলেদুটো ঐ সব কারবারে আছে। প্রভা তাদের বলে দিয়েছে, তোমরা দেখো, আমার বাড়িতে যেন কেউ ঢুকতে না চায়। আমি পুলিশের ঝঞ্ঝাট সামলাবো কী করে ? তারা জানিয়েছে, না, মাসিমা, আপনাকে কেউ ডিসটার্ব করবে না। আপনি কোনো পার্টিকেই ঢুকতে দেবেন না।

সততার একটা সম্মান আছে। পাড়ার প্রায় সবাই প্রভাকে সমীহ করে। শিখা তেমন সুন্দরী বা আকর্ষণীয়া নয় বলেই ছেলে-ছোকরারা কখনো উপদ্রব করেনি। তপন ছাড়া আর কোনো ঐ বয়েসী ছেলেই বাড়িতে ঢোকার অধিকার পায়নি এ পর্যন্ত।

তবু বলা তো যায় না। যদি হুট করে কেউ এসে পড়ে, বামুনদিদি সামলাতে পারবে না। প্রভাকেই দরজা খুলতে হবে। সেলাইয়ের অর্ডার দেবার জন্য রথীন আসে নিয়মিত। আজ তার আসবার দিন নয়।

প্রভা তরতর করে নিচে নেমে এসে দরজার এক পাল্লা খুলে দাঁড়ালো।

সাইকেল রিকশায় বসে এক বৃদ্ধ, মলিন পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা, সারা মুখে দাড়ি, একটা চোখ কানা, অন্য চোখটাও মিটমিট করছে। এরকম চেহারা দেখলেই কেমন যেন অবজ্ঞার ভাব হয়। একটি আঠারো-উনিশ বছরের ছেলে নেমে দাঁড়িয়েছে রিকশা থেকে, সে-ই কড়া নেড়েছে।

ছেলেটি প্রভাকে কিছু বলে বৃদ্ধটিকে জিজ্ঞেস করলো, কী, এই বাড়ি তো ? ঠিক আছে ?

বৃদ্ধটি ভাঙা গলায় বললো, হ্যাঁ, এই বাড়ি।

ছেলেটি বললো, তা হলে আমি পৌঁছে দিয়ে গেলুম। এবার চলি !

বৃদ্ধটিকে হাত ধরে রিকশা থেকে নামিয়ে সে নিজে তড়াক করে চেপে বসলো। চালককে বললো, ঘুরিয়ে নাও।

প্রভা পাথরের মূর্তির মতন স্থির হয়ে আছে। বামুনদিদি তার পাশে এসে বললো, কে আইলো ? অ্যাঁ ? এ কেডা ?

বৃদ্ধ এক পা এগিয়ে এসে কান্না কান্না ভাব করে বললো, প্রভা, আমাকে চিনতে পারো না ? কতদিন পর—

এক নজর দেখামাত্র প্রভা চিনতে পেরেছে। এ কখনো ভুল হয়। কিন্তু

এতটা তো বুড়ো হবার কথা নয়। প্রভার চেয়ে এগারো বছরের বড়। সেই বয়সের অনেক পুরুষ মানুষই মাথা উঁচিয়ে টকটকিয়ে হাঁটে। অকাল বার্ধক্যে এই লোকটা কুঁজিয়ে গেছে।

কঠিন মুখ করে প্রভা বললো, তুমি এখানে কী মনে করে?

বৃদ্ধ বললো, বলবো, সব বলবো। আমাকে একটু ভেতরে গিয়ে বসতে দাও।

প্রভা বললো. না, ভেতরে গিয়ে বসবার দরকার নেই। তোমার সব কথা আমি শুনতেও চাই না।

বামুনদিদি আবার জিজ্ঞেস করলো, কে? এই লোকটা কেডা?

প্রভা বললো, বামুনদিদি, তুমি ভেতরে যাও।

কিন্তু বামুনদিদি রহস্যের সন্ধান পেয়েছে, সে এখন যাবে কেন?

বৃদ্ধ বললো, ট্রেন এক জায়গায় অনেকক্ষণ থেমে ছিল, গরমে সেদ্ধ হয়ে গেছি। এক গেলাশ জল খাওয়াবে?

প্রভা বললো, না। মোড়ের মাথায় টিউবওয়েল আছে—

যে-কোনো ভারতীয় গৃহস্থের বাড়িতে কেউ এসে খাবার জল চাইলে প্রত্যাখ্যান করার প্রথা নেই। বামুনদিদি চোখ কপালে তুলে বললো, ওমা, সে কী কথা, একটা মানুষ খাওনের জল চাইলো, জল না দিয়া কি পারা যায়?

প্রভা বললো, ওটা ওর ভেতরে ঢোকার ফন্দি। জল খাওয়ার আর জায়গা পায়নি? আমার বাড়িতে ও সব চলবে না।

গৃহকর্ত্রীর কথা অগ্রাহ্য করে বামুনদিদি জল আনতে চলে গেল।

বৃদ্ধ বললো, সত্যি খুব তেষ্টা পেয়েছে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। আমার আলসার আছে তো, তাই বেশি তেষ্টা পায়। প্রভা, তুমি আমাকে চিনতে পারোনি, আমি বিশ্বেশ্বর।

প্রভা বললো, ও নামে যে কেউ একজন ছিল, তা আমি মনে রাখতে চাই না। এতদিন পরে এসে তোমার কোনো সুবিধে হবে না।

বিশ্বেশ্বর বললো, প্রভা, আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। গৌর মারা যাবার পর আমার আর কিছু মনে ছিল না। এতদিন পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি পাগলের মতন, লোকে দয়া করে দুটি খেতে দিয়েছে। এই তো কিছুদিন আগে এক সাধুর দেওয়া ওষুধ খেয়ে আমার স্মৃতি ফিরে এসেছে।

প্রভা চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, আর সিউড়িতে তোমার যে ঘড়ি-রেডিও'র একটা দোকান ছিল, সেটা কী হলো?

এবারে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো বিশ্বেশ্বর।

একটা স্টিলের গেলাশে জল নিয়ে এসে বামুনদিদি বললো, আহা রে, মানুষটা বড় দুঃখী!

প্রভা বললো, তোমার ঐ মায়াকান্না আমি শুনতে চাই না। জল খেয়ে বিদেয় হও।

বামুনদিদি বললো, ও প্রভা, মানুষকে অমন কথা বলতে নাই। কানা মানুষ, অমন চোখের জল ফেলতে আছে।

ঢক ঢক করে সব জলটুকু শেষ করে বিশ্বেশ্বর বললো, আমি আর কোথায় যাবো? ওরা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। দোকানটা নেই। চোখ গেছে, আর কাজ করতে পারি না। ওরা আমাকে দুটি খেতেও দেবে না। প্রায় দেড়দিন কিছু খাইনি, হাতে একটা পয়সাও নেই। খালি পেটে থাকলে আলসারের ব্যথা হয়।

বিশ্বেশ্বর কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লো মাটিতে।

প্রভা বললো, তুমি এখানে বসলে যে! বলেছি না, এখানে তোমার জায়গা হবে না! না গেলে পাড়ার ছেলেদের ডাকবো। তারা আমাকে মানে। তোমাকে মারতে মারতে দূর করে দেবে!

বিশ্বেশ্বর বললো, তাই দাও! আমি আর যাবো কোথায়? দেখলে না বিড়াল পার করার মতন আমাকে এখানে ফেলে দিয়ে গেল। নিজে নিজে আর ফিরেও যেতে পারবো না। গেলেও আমাকে মারবে। ছেলেমেয়ে দু'জনেই মারে। তুমিও তাড়িয়ে দিলে রাস্তায় গিয়ে না খেয়ে মরে পড়ে থাকবো।

বামুনদিদির চোখে জল এসে গেল।

ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে বললো, ইস, মানুষের কত কষ্ট। ও প্রভা, এমন কইরা কি কেউ দরজা থিকা অতিথিরে তাড়ায়। তাতে নিজেগো পাপ হয়। সংসারের অকল্যাণ হয়। আমার ভাগের থিকা দুগগা ভাত অরে দেবো? অন্তত একটা বেলা খাইয়া বাঁচুক।

অনুমতির অপেক্ষা না করে বামুনদিদি বিশ্বেশ্বরকে বললো, আসো, তুমি ভিতরে আসো!

বিশ্বেশ্বর ভালো করে হাঁটতে পারে না। একেবারে ত্রিভঙ্গমুরারি হয়ে গেছে সে। একসময় তার জোরালো ব্যক্তিত্ব ছিল, তাও নষ্ট হয়ে গেছে একেবারে। এ যেন বিশ্বেশ্বর নয়, তার প্রেতচ্ছায়া।

একজন পঙ্গু বৃদ্ধকে দেখে দয়া হয়েছে বামুনদিদির।

যদি বলা যায় এই লোকটা আমার ভূতপূর্ব স্বামী ছিল, তখন কী বলবে?

তখন শুধু একবেলার ভাত নয়, মাথায় করে রাখতে বলবে। স্বামী তো ভূতপূর্ব হয় না, যতদিন বেঁচে থাকে, ততদিনই স্বামী।

ভেতরে এসে এদিক ওদিক চেয়ে বিশ্বেশ্বর বললো, সব কিছু একই রকম আছে। শিখা মা কোথায় ?

প্রভা বললো, না, সব কিছু এক নেই। এটা ভাড়া বাড়ি নয়, এ বাড়ির মালিক এখন আমি। তোমার মাথায় গোলমাল হয়েছিল, সব ভুলে গিয়েছিলে, এই ধরনের ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলবে ভেবেছিলে। তোমার সব কীর্তিকাহিনী আমি জানি। তোমাকে আমি এখন ইচ্ছে করলে পুলিশ ধরিয়ে দিতে পারি।

বিশ্বেশ্বর বললো, আমার আর বেশিদিন আয়ু নেই, প্রভা। যে দোষ করেছি, তারও ক্ষমা নেই, জানি। আমি কোনো অধিকার চাইতেও আসিনি। শরীরে ক্ষমতা নেই, কোথাও যাবারও জায়গা নেই। ওরা মেরে মেরে আমার পিঠে কালশিটে ফেলে দিয়েছে। শেষ কয়েকটা দিন যদি একটু মাথা গোঁজার জায়গা দাও, আর দু'মুঠো ভাত, গলাগলা ভাত ছাড়া আর পেটে কিছু সহ্যও হয় না। একটু দয়া করো, একটু দয়া করো—

প্রভা বললো, বামুনদিদি, ভাঁড়ার ঘরটা একটু খালি করে দাও, থাকতে চায় ওখানে থাকুক। ও কোনোদিন ওপরে উঠবে না।

বিস্ফারিত চোখে বামুনদিদি বললো, ও প্রভা, ও কি তোমার সেই—

প্রভা বললো, না, আমার কাছে সে মরে গেছে। তুমিই তো বললে, একটা দুঃখী কানা মানুষকে তাড়িয়ে দিতে নেই। সেইজন্যই রইলো। ওকে দুটো খেতে দিও।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে প্রভা ভাবলো, শিখা বলেছিল, ওর বাবার সঙ্গে যদি কখনো আবার দেখা হয়, তা হলে ওর একটা বোঝাপড়া আছে। শিখা এবার এলে, সেটা বুঝে নিত।

শিখা আরও বলেছিল, পুরুষ মানুষকে আশ্রয় দিতে এক ধরনের অহংকার বোধ করা যায়। প্রভাই বা সেই অহংকার ভোগ করবে না কেন ?

খুব ভালোবাসা

নিরালায় দেখা করাই তো মুশকিল।

এমনিতেই বাড়ি ভর্তি অনেক লোকজন, তার ওপর দিল্লি থেকে এক মাসি এসেছেন, তাঁর তিনটি ছেলেমেয়ে সিঁড়ি দিয়ে সব সময় উঠছে নামছে। এই অচেনা দুরন্ত কিশোর-কিশোরীদের পাল্লায় পড়ে এ বাড়ির পোষা কুকুরটার একেবারে নাজেহাল অবস্থা। বাড়ির তিনতলা থেকে কেউ একজন ডাকে রতন, রতন ! একতলা থেকে লম্বা উত্তর আসে, যা-ই ! দিল্লির মেসোমশাই একবার হাঁচতে শুরু করলে বাইশবার হাঁচেন। বসবার ঘরে সবাই গল্প থামিয়ে গোনে, ষোলো, সতেরো, আঠারো।

এরই মধ্যে জয়িতার অসুখ। গত মঙ্গলবার ছিল জয়িতার আঠারো বছরের জন্মদিন, তার আগেই রবিবার সন্ধেবেলা তার জ্বর এলো। বিকেলবেলা থেকেই সে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল, কথা ফুরিয়ে গিয়েছিল তার মুখ থেকে, হাসিটা ফ্যাকাশে, নিজেই গিয়ে শুয়ে পড়েছিল বিছানায়। জ্বর মানে একেবারে ধুম জ্বর ! সোমবার দুপুরে টেম্পারেচার উঠলো একশো ছয় পয়েন্ট আট।

রক্ত পরীক্ষা করা হয়ে গেছে, ম্যালেরিয়া নয়, টাইফয়েড নয়। এ এক অদ্ভুত জ্বর, যা থারমোমিটারের টং-এ চড়ে বসে থাকে। জ্বরের ঘোরে প্রায় অজ্ঞানের মতন অবস্থা। ঠাণ্ডা জল দিয়ে অনেকক্ষণ মাথা ধুইয়ে দিলে জয়িতা চোখ মেলে তাকায়, এদিক ওদিক মাথা ঘুরিয়ে সে কাকে খোঁজে। কিছুই খেতে চায় না সে।

জয়িতার নিজের মামাই বেশ বড় ডাক্তার। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন হাসপাতাল বা নার্সিং হোমে নিয়ে যাবার দরকার নেই, বাড়িতেই থাকুক।

সাতদিন কেটে গেলেও যদি জ্বর না নামে দেখা যাবে। আজ ছ'দিন হলো।

শুভ্র প্রত্যেক দিনই আসে। এর মধ্যে দু'বার সে জয়িতাকে দেখতে গিয়েছিল, দু'বারই জয়িতার বিছানার পাশে তিন চারটে লোক ছিল। জয়িতার চোখ দুটি ছিল বোজা, শুধু ঠোঁট একটু কুঁচকে যাচ্ছিল। জয়িতা জানতেই পারেনি শুভ্র এসেছিল কি না। কপালের ওপর চুল এসে পড়েছিল জয়িতার, কেউ সরিয়ে দেয়নি।

এ বাড়িতে শুভ্রর যখন তখন আসতে কোনো বাধা নেই। সে যদি একা সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় জয়িতার ঘরে কখনো চলে আসে, কেউ কিছু মনে করবে না। তবু শুভ্রর লজ্জা করে। সে তো এ বাড়ির আদিত্যর বন্ধু হিসেবে আসে, সবাই তাই জানে।

জয়িতা অভিযোগ করেছে, তোমার এত কিসের লজ্জা বলো তো। আমার পড়ার ঘরে তুমি এসে একটু গল্প করলে তোমায় কি কেউ বকবে?

শুভ্র উত্তর দিতে পারে না।

—মেয়েরাও তোমার মতন লজ্জা পায় না। দ্যাখো তো, সৌম্যদা...।

সৌম্য জয়িতার আর এক দাদার বন্ধু। ওদের চেয়ে মাত্র তিন-চার বছরের বড়। বড় আমুদে যুবক। সে এ বাড়িতে এলেই একটা হৈ চৈ জাগিয়ে তোলে, যে-কোনো ঘরে চলে যায়, ঠাট্টা ইয়ার্কির সময় জয়িতা কিংবা নন্দিনীর মাথায় চাঁটি মারে, কিংবা বুকের কাছে টেনে আনে, সব কিছুই অতি সাবলীল।

সপ্তম দিন সন্ধেবেলা শুভ্র একটা দুঃসাহসের কাজ করে ফেললো। ব্যাডমিন্টন খেলে ফেরবার পর আদিত্যদের সঙ্গে একতলার ঘরে বসে আড্ডা দিচ্ছে, এমন সময় শুভ্র দেখলো, জয়িতার বাবা, ডাক্তার মামা, দিল্লির মেসো সবাই কথা বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাইরের গেটের দিকে এগোচ্ছেন। অমনি শুভ্রর মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল।

বাথরুম থেকে আসছি বলেই সে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। একতলাতেও বাথরুম আছে, দোতলাতেও আছে শুভ্র উঠে এলো তিনতলায়। ডাক্তার দেখে যাবার পরেই খানিকক্ষণ রোগীর ঘর খালি থাকে, শুভ্র লক্ষ্য করেছে অনেকবার।

জয়িতার ঘরের দরজাটা আলতো করে ভেজানো, একটুখানি ঠেলে ফাঁক করলো শুভ্র। তারপরই সে আড়ষ্ট হয়ে গেল। জয়িতার মা-মাসিমা কেউ নেই যদিও, কিন্তু মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন এক বয়স্কা মহিলা। জলপট্টি ভিজিয়ে দিচ্ছেন, এই মহিলাকে জয়িতারা বোস্টমপিসি বলে ডাকলেও আসলে এঁকে

গ্রাম থেকে নিয়ে আসা হয়েছে বাড়ির কাজের জন্য, ঝিয়ের চেয়ে একটু ওপরে এঁর স্থান। এই মহিলাকে দেখেও শুভ্রর লজ্জা!

কিন্তু মহিলাটিই একটা সুবিধে করে দিলেন, তিনি শুভ্রকে দেখে মাথায় ঘোমটা টেনে বেরিয়ে গেলেন পাশের দরজা দিয়ে।

শুভ্রর হাতে বেশি সময় নেই, সে দ্রুত চলে এলো খাটের পাশে।

এখনো চোখ বুজে আছে জয়িতা।

শুভ্র কি ডেকে ওর ঘুম ভাঙাবে? সেটা ভালো না খারাপ? শুভ্রর বেশি সময় নেই। একবার অন্তত কপালে হাত রেখে।

সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলে তাকালো জয়িতা। কোনো বিস্ময় নেই, অভিমান নেই, ঠিক যেন ঝরনা থেকে তোলা দু' চামচ জল।

অতি ব্যস্তভাবে শুভ্র বললো, আমি আগে দু'বার এসেছিলাম, সত্যি এসেছিলুম, বিশ্বাস করো।

জয়িতা পরিস্কার গলায় জিজ্ঞেস করলো, শুভ্রদা, আমি কি মরে যাচ্ছি?

—না, না, তোমার সে রকম কিছু তো হয়নি!

—আমি ডুবে যাচ্ছি, অনেক নিচে, অনেক, অনেক, মনে হয় আর আমি ফিরে আসতে পারবো না। এই রকম ভাবেই তো মানুষ মরে যায়!

—যা, কী আজেবাজে কথা বলছো! তোমার মামা একটু আগেই বলছিলেন, কালই তোমার জ্বর ছেড়ে যাবে।

—ওরা কেউ কিছু জানে না।

হঠাৎ উঠে বসার চেষ্টা করে, শুভ্রর একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে, শুভ্রর মুখের দিকে অতি তীব্রভাবে তাকিয়ে জয়িতা ফিসফিস করে বললো, আমায় সত্যিই তুমি ভালোবাসো? খুব খুব ভালোবাসবে বলো? খুব ভালোবাসবে? তা হলে আমি বেঁচে উঠবো!

শুভ্রর উত্তর দেওয়া হলো না। দরজা হাট করে খুলে ঢুকলেন দিল্লির মাসি। শুভ্র একেবারে কেঁপে উঠলো। শুভ্রকে একেবারে গ্রাহ্যই না করে এগিয়ে আসতে আসতে বললেন, তুই কিছুই খাচ্ছিস না খুকি, এ-রকম করলে চলবে কী করে বলতো? এই তো মেজদা বলে গেল—

মাথা নিচু করে বেরিয়ে এলো শুভ্র। তার মুখখানা রক্তশূন্য হয়ে গেছে। হঠাৎ সে বড় রকমের একটা ধাক্কা খেয়েছে।

খুব ভালোবাসা? কত মানুষ কত মানুষকে ভালোবাসে, তারা সবাই কি পরস্পরকে খুব ভালোবাসে? শুভ্র যতখানি ভালোবাসে ততটা?

রাত্তির দেড়টা আন্দাজ, সারা বাড়ি যখন নিস্তব্ধ তখন শুভ্র চুপিসারে বেরিয়ে পড়লো আবার। হাঁটতে হাঁটতে চলে এলে জয়িতাদের বাড়ির সামনে। এ বাড়িতেও কোনো ঘরে আলো জ্বলছে না। তিনতলায় জয়িতার ঘরের জানালা বন্ধ।

একটু দূরে, মোড়ের মাথায় মুখার্জিদের বাড়ির সামনে বেশ চওড়া রক। কয়েকজন ভিখিরি ঘুমোয় এখানে। তাদের পাশে একটু জায়গা করে নিয়ে বসলো শুভ্র। সে সঙ্গে একটা চাদর এনেছে, শীতে কষ্ট পাবে না। আজ সপ্তম দিন, কাল নিশ্চয়ই ছেড়ে যাবে জয়িতার জ্বর। সকালে সাঁতার কাটার নাম করে সে আদিত্যকে গিয়ে ডাকবে। তখনই নিশ্চয়ই সে আদিত্যর কাছে জেনে যাবে যে জয়িতার অসুখ কমে গেছে।

তারপর কোনো একদিন সে জয়িতার কাছে এসে বলবে, আমায় ক্ষমা করো! খুব-ভালোবাসা কাকে বলে আমি জানি না। আমি পারিনি। আমি দূরে চলে যাচ্ছি!

আর কোনোদিন জয়িতার সঙ্গে তার একলা দেখা হবে না!